কোরআন গবেষণার মূলনীতি

মাওলানা আমীন আহ[illegible]ী

কোরআন গবেষণার মূলনীতি

লেখক
মওলানা আমীন আহসান এসলাহী

অনুবাদক
মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ জহীরুল হক

রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড,
ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
আবদুর রব খান
রশীদ বুক হাউস
৬নং প্যারীদাস রোড,
ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯১৩-৪৯৩৩১১

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৩ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৮ ইং

মূল্য ঃ ১৪০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
মেরাজ প্রিন্টার্স
জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র কালাম। দুনিয়াতে অশান্তি ও উদ্বেগহীন জীবন যাপন এবং দুনিয়ার এ সীমাবদ্ধ জীবন পাড়ি দেওয়ার পর যে অনন্ত-জীবন শুরু হবে, সে জীবনে পরিপূর্ণ মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করার সুনিশ্চিত পথনির্দেশই আল-কুরআন। আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেই মানব জাতিকে এ পথনির্দেশ দান করেছেন।

কুরআনের শিক্ষা থেকে সঠিক পথনির্দেশ লাভ করতে হলে এ কিতাবের প্রতিটি কথা বুঝতে হবে, অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। ভাসা ভাসা উপলব্ধি এবং মামুলি কিছুটা চর্চা করে কুরআন থেকে সঠিক পথনির্দেশ উদ্ধার করার আশা বাতুলতা মাত্র। কেননা, কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য জীবন-সমস্যার সব বিষয়েই পরিপূর্ণ সমাধান প্রদান করে। আজকের দিনের মানুষের অনুভব উপলব্ধি যেমন হাজার বছর আগের মানুষের তুলনায় অনেকগুণ বেশী অগ্রসর, তেমনি আজ থেকে পরে যারা আসবে তাদের উপলব্ধিগত দৃষ্টিকোণ আরো অনেকগুণ তীক্ষ্ণ হবে, এটাই স্বাভাবিক। মেধা ও অনুধাবন ক্ষমতার এহেন তারতম্যের ক্ষেত্রেও কুরআন যেমন আজকের মানুষের সকল কৌতুহলী জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব পেশ করে, তেমনি হাজার হাজার বছর পরের আরো অনেকগুণ বেশী জটিল জিজ্ঞাসার জবাব পেশ করবে, এটা কুরআনের দাবী এবং মুমিনমাত্রেরই বিশ্বাস।

কুরআনুল-করীমের এ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্যে কুরআন অনুধাবনের সরল পন্থা এবং গবেষণার বিধিসংগত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনুধাবন করা জরুরী। সমুদ্র গর্ভে যে রহস্যরাজি লুকিয়ে রয়েছে তা অনুধাবন করতে আগ্রহী যদি হিমালয় শীর্ষে বসে গবেষণা কর্ম শুরু করে, তবে তার পক্ষে এ গবেষণার ফললাভ আশা করা যেমন হাস্যকর হবে, ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র কালাম কুরআনুল-করীমকে বুঝবার এবং এর পয়গাম পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার সাধনা যদি কুরআনের ধারক, বাহক বিশেষতঃ কুরআনকে প্রথম বুকে ধারণ করার জন্য যাঁদের নির্বাচিত করা হয়েছিল সাহাবায়ে কেরামের সেই নির্বাচিত জামাতের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ না করাও হবে লক্ষ্যহীন পথিকের মরু পরিক্রমারই নামান্তর মাত্র।

এ কারণেই আল্লাহ্ পাক নিজেই তাঁর কালামের এক অংশকে অন্য অংশের দ্বারা

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করেছেন। এক একটা বাণীকে গুরুত্ব অনুপাতে বারবার আলোচনা করেছেন, বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও দৃষ্টিকোণের সাথে এর সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

অতঃপর কুরআনের বাহক মহানবী (সঃ)- এর কওল ও আমলের মাধ্যমে কুরআনের প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন, সাহাবায়ে কিরামের এক জামাতকে মহানবীর সার্বক্ষণিক সাহচর্যের বিরল সৌভাগ্য দান করে কুরআনের প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন। তাঁদের অবলম্বিত সে পথ ও পন্থা অবলম্বন করে কুরআনের সহীহ্ অনুধাবন শক্তি অর্জন করা সম্ভব।

কুরআন গবেষণা ও অনুধাবনের অনুসরণীয় সে পথ সমকালীন মনীষীগণের মধ্যে যাঁরা দক্ষতার সাথে ব্যাখ্যা করেছেন, মওলানা আমীন আহ্সান এসলাহীর নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে। উপমহাদেশে কুরআন গবেষণার পথনির্দেশের ক্ষেত্রে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ) এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরই শিষ্য-শাগরেদ ও চিন্তাধারার অনুসারিগণ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। হযরত শাহ সাহেবের পর মওলানা এসলাহীর 'তাদাব্বুরে-কুরআন' বইটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। আধুনিক যুগ-মানসের অনেক জিজ্ঞাসা অনেক সংশয়-সন্দেহের জবাব মওলানা এস্‌লাহী প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন।

কুরআন গবেষণা আমাদের দেশে এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। এখনো পর্যন্ত একটা ভাল তফসীর গ্রন্থ বাংলায় রচিত হয়নি। কিছু তরজমা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেগুলো গবেষকের তৃষ্ণা মেটাবার মত নয়। 'তাদাব্বুরে কুরআন'-এর বাংলা অনুবাদ আমাদের আরবী-উর্দু না জানা গবেষক, পাঠক এবং চিন্তাবিদগণের কুরআন পাঠ গবেষণা এবং অনুধাবনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ জহীরুল হক একজন দক্ষ অনুবাদক। এ জটিল বইটির অনুবাদ ক্ষেত্রেও তিনি নিঃসন্দেহে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরয

পবিত্র কোরআন মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এমন এক মহাগ্রন্থ যা বিশ্বমানবতার জন্যে চিরন্তন আদর্শ, শাশ্বত পথ নির্দেশ আর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রূপে প্রতিষ্ঠিত। কোরআনুল করীমের বাহক মহানবী (সাঃ)-এর জীবন ও আদর্শ ছিল এই কিতাবের জীবন্ত উদাহরণ এবং ব্যবহারিক বাস্তবায়ন।

হযরত নবী করীম (সাঃ) ছিলেন নিখিল বিশ্বের নবী। সর্বযুগের সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। আজ ও আগামী দিনের মানব সভ্যতার জন্যে তিনি যে দিকনির্দেশ দিয়ে গেছেন, তার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ রূপেই পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন গবেষণা ও এর অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। অতএব, যুগে যুগে পবিত্র কোরআন ব্যাখ্যা ও এর সম্যক বিশ্লেষণে মুসলিম মনীষীরা আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পাক কোরআন অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিশ্লেষণের কাজটি কোন অনিয়মতান্ত্রিক বা বল্গাহীন বিষয় নয় যে যার যেভাবে ইচ্ছা সে কোরআন নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দেবে। বরং কালজয়ী এ মহাগ্রন্থ অধ্যয়নেরও রয়েছে সুন্দরতম কিছু মূলনীতি আর রূপরেখা।

পাঠকের হাতের বইটি আলোচিত বিষয়েরই একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এটি উপ মহাদেশের প্রখ্যাত তফসীরবিদ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী প্রণীত 'তাদাব্বুরে কোরআন' পুস্তকের বাংলা ভাষ্য। মাওলানা ইসলাহী ছিলেন সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট মুফাস্‌সেরে কোরআন মাওলানা শায়খ হামীদুদ্দীন ফারাহী (রহঃ)-এর সুযোগ্য শিষ্য। কোরআন গবেষণা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র মুনশিয়ানা এই ওস্তাদ-শাগরেদ জুটির মাঝে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পুস্তকটি চোখে পড়ার সময় থেকেই এর বাংলা ভাষ্য এতদঞ্চলের পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা আমার মনে জাগে এবং আল্লাহ পাকের খাস রহমতে ও বিশেষ তওফীকে এক সময় এ ইচ্ছা বাস্তবায়িতও হয়। 'কোরআন গবেষণার মূলনীতি' শীর্ষক এ বইটি প্রথম ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করে। অতি অল্প সময়ে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায় কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানের 'গদাই লশকরী চাল' এরপর আর পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। দীর্ঘ দিন পর দেশের অন্যতম প্রাচীন এবং

www.pathagar.com

মর্যাদাশালী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'রশীদ বুক হাউস' এর প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে তারা এ বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ তৈরির মুহূর্তে বইয়ের লেখক, প্রকাশক এবং বিশেষতঃ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের জন্যে দোয়া করি। তিনি এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। এ মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ 'রশীদ বুক'-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব মাওলানা মাহবুবুর রহমান খান সাহেবের কথা যিনি আমার এ বইটি পূনঃপ্রকাশের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ পাক তার আরাধ্য কাজগুলো সমাপ্ত করার তওফীক তার উত্তরাধিকারীদের দান করুন।

পরিশেষে আমি এ বইটির অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমাকে অনুপ্রেরণাদানকারী শুভার্থীদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। দোয়া করি আল্লাহ এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলের উভয় জগত কল্যাণময় করুন। আমীন!

৯-৯-১৯৯৬ সৈয়্যদ মোহাম্মদ জহীরুল হক

১১/২, কবি জসিমউদ্দীন রোড,

ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচী পত্র

	পৃষ্ঠা নং
কোরআন বুঝার জন্য কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত-	১
১। উদ্দেশ্যের পবিত্রতা	১
২। কোরআনে হাকীমকে একটি উচ্চতর বাণী হিসাবে মানতে হবে	২
৩। কোরআনের চাহিদানুযায়ী নিজের পরিবর্তন সাধনের দৃঢ় সংকল্প	৪
৪। মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করা	৬
কোরআনের গবেষণা	৯
৫। উদ্দেশ্য বা নিয়তের যথার্থতা	৯
৬। কোরআনের আয়ত দু'রকম	১২
৭। কোরআনের পাঠক দু'রকম	১২
৮। হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি	১৬
৯। তাকওয়া ও আমল	২৬
১০। কোরআন গবেষণার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান	৩৮
১১। কোরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ	৪৮
কোরআনের সহজবোধ্যতা	৫১
১২। তফসীরের বিভিন্ন যুগ ও তার বৈশিষ্ট্য	৬১
১৩। প্রতিক্রিয়া	৬১
১৪। কালামের জটিলতা ও সহজবোধ্যতার তিনটি দিক	৬২
১৫। কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য	৬৬
১৬। আয়াতের তেলাওয়াত ও পবিত্রতা	৭১
১৭। কিতাবের তা'লীম	৭৮
১৮। হেকমতের শিক্ষা	৮১
১৯। হেকমত শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ	৮৩
২০। একটি লক্ষণীয় বিষয়	৮৫
২১। কোরআন মজীদ চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র	৮৮

www.pathagar.com

২২। এর যথার্থতা ৯৬
২৩। সহজতার কয়েকটি দিক ১০৩
২৪। যাকে সংবোধন করা হয় তার সংবোধনের
ভিত্তিতে কোরআনের জটিলতা ১১৪
২৫। পূর্ববর্তী মনীষীদের তফসীর রীতি ১২৪
২৬। শানে নুযূল ১২৯
২৭। আলোচনার সার সংক্ষেপ ১৩৫
তফসীরের মূলনীতি ১৩৯
২৮। মুহাদ্দেসীন ও রেওয়ায়েতাশ্রয়ীদের তফসীর পদ্ধতি ১৩৯
২৯। দার্শনিকদের পদ্ধতি ১৪০
৩০। মুকাল্লেদ বা অনুসরণবাদীদের পদ্ধতি ১৪১
৩১। আধুনিকতাবাদীদের পদ্ধতি ১৪২
৩২। উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহের পর্যালোচনা ১৪২
৩৩। তফসীরের বিশুদ্ধ মূলনীতি ১৪৫
৩৪। তফসীরের চারটি চূড়ান্ত মূলনীতি ১৪৬
৩৫। কোরআনের বিন্যাস ১৪৯
৩৬। বিন্যাস অনুসন্ধানের মূলনীতি ১৫৯
৩৭। তফসীরের অনুমান ভিত্তিক উৎস ১৭০

www.pathagar.com

কোরআন বুঝার জন্য কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত

নামাযের জন্যে ওযু এবং পবিত্রতা অপরিহার্য। নামাযের বরকত মানুষ তখনই লাভ করতে পারে যখন সে ওযু ও পবিত্রতার শর্তসমূহ যথাযথ পূর্ণ করার পর নামায পড়ার ইচ্ছা করে। তেমনিভাবে কোরআন বুঝার জন্যেও কিছু প্রাথমিক শর্ত রয়েছে এবং মানুষ তখনই কোরআনের জ্ঞানলাভে সমর্থ হতে পারে, যখন সে শর্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোরআনকে বুঝার চেষ্টা করে। এখানে আমরা সেসব শর্ত সম্পর্কেই আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ঃ

সর্বাগ্রে নিয়ত বা উদ্দেশ্যের পবিত্রতা প্রয়োজন। উদ্দেশ্যের পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে একমাত্র হেদায়াত লাভের উদ্দেশেই কোরআন পাঠ করা। অন্য কোন উদ্দেশে নয়। হেদায়াতপ্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে শুধু যে কোরআনের যথার্থ বরকত লাভ থেকেই বঞ্চিত হতে হবে তাই নয়, বরং কোরআন থেকে অজ্ঞ অবস্থায় যতটা দূরত্ব রয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশী দূরে সরে পড়ার আশংকা রয়েছে। মানুষ কোরআনের ব্যাখ্যাতা কিংবা মুফাস্‌সের বলবে, অথবা যথাশীঘ্র কোরআনের একটা তফসীর লেখে খ্যাতি এবং মুনাফা লাভ করার উদ্দেশে যদি পাঠ করা হয়, তাহলে হয়ত তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েও যেতে পারে; কিন্তু কোরআনের যে জ্ঞান, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে কারও যদি কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে থাকে এবং সে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশে কোরআনের প্রতি ধাবিত হয়, তাহলে হয়ত কোরআন থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কিছু কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যুক্তি-প্রমাণও সংগ্রহ করে নিতে পারে, কিন্তু তার এহেন গর্হিত কাজের জন্যে কোরআনের জ্ঞান লাভের দ্বার তার জন্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

কোরআন মজীদকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি হেদায়াত-গ্রন্থ হিসেবে নাযিল করেছেন এবং প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে তিনি হেদায়াত লাভের প্রেরণাও দান করেছেন। যদি এই প্রেরণার ভিত্তিতে মানুষ কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে সে নিজের চেষ্টা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌফিক ও সামর্থ্য অনুসারে কোরআনের কল্যাণ লাভ করতে পারে। আর যদি এই প্রেরণা ব্যতীত অন্য কোন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোরআনকে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে 'যেমন কর্ম তেমন ফল'

www.pathagar.com

এই মূলনীতির ভিত্তিতে সেও তাই পাবে যা সে অনুসন্ধান করে। কোরআন মজীদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা এর সম্পর্কে বলেছেন— "আল্লাহ্ এর মাধ্যমে অনেককে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করেন এবং অনেককে হেদায়াত বা কল্যাণ দান করেন।" তাছাড়া এই মূলনীতি বর্ণনার পরেও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন— গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট তাদেরকেই করেন, যারা না-ফরমান। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সরল পথ পরিহার করে এবং হেদায়াত বা কল্যাণ থেকে অকল্যাণ আহরণের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তাদেরকে সে জিনিসই দান করেন, তারা যার জন্যে লালায়িত হয়। কা'বায় গিয়েও যদি কেউ দেবমূর্তির কথাই স্মরণ করে, তাহলে তার জন্যে তওহীদের মহিমা উন্মোচন কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি কেউ ফুলের মধ্যে থেকেও কাঁটা আহরণে আগ্রহী হয়, তাহলে কিছুতেই সে ফুলের সুবাস ও সৌরভ লাভের অধিকারী হতে পারে না। কেউ যদি নিজের বিকৃত মানসিকতার কারণে চিকিৎসাকেও রোগ বিবেচনা করে, তাহলে তার রোগ বাস্তবিকই চিকিৎসার অতীত। নিরাময়ের পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধিই তার জন্যে স্বাভাবিক। এদিকে লক্ষ্য করেই কোরআনে হাকীমের সূরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (بقرة ١٦)

অর্থাৎ, 'এরাই সেসব লোক, যারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদের এই সওদা তাদের জন্যে লাভজনক হয়নি এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারেনি।'- (সূরা বাকারা; ১৬)

কোরআনে হাকীমকে একটি উচ্চতর বাণী বলে মানতে হবে ঃ

দ্বিতীয় শর্ত হল, কোরআন হাকীমকে একটি উচ্চতর এবং উৎকৃষ্টতর বাণী বলে মেনে নিয়ে সেভাবে তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। মনে যদি কোরআন মজীদের সম্মান ও গুরুত্ব না থাকে, তাহলে কেউ তাকে বুঝবার জন্যে এবং তার রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে সে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করতে পারে না যা তার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে প্রয়োজন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেকের কাছে কথাটা একান্ত অদ্ভুত বলেই মনে হবে যে, একটি গ্রন্থ সম্পর্কে তাকে জানার আগেই শুভ ধারণা সৃষ্টি করে নিতে হবে যে, এটা অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ এবং একান্ত উচ্চ মানের একটি গ্রন্থ! কিন্তু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে এ ধরনের শুভ ধারণা সৃষ্টি হওয়া একান্ত যুক্তিসংগত ব্যাপার।

www.pathagar.com

কোরআনের একটি বিরাট ইতিহাস রয়েছে। তার কীর্তিও বিপুল। মন-মস্তিষ্কের পরিবর্তন সাধনে এ গ্রন্থ যে অলৌকিকতা প্রদর্শন করেছে, আজও পর্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থ তা প্রদর্শন করতে পারেনি। তাছাড়া আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক অধিবাসী একে শুধু একটি গ্রন্থ হিসেবেই মান্য করে না, বরং আসমানী এবং ঐশী গ্রন্থ হিসেবে সম্মানও করে। একে 'লওহে মাহফুজ' তথা আল্লাহ্‌র আরশ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ হিসেবে শ্রদ্ধা করে। একে একটি অনন্য বাণী বলে মান্য করে। যার কোন তুলনা না মানুষের পক্ষে উপস্থাপন করা সম্ভব, না জিনদের পক্ষে। এমন একটি বাণী, যার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে এহেন প্রমাণ এবং ধারণা বিদ্যমান, তা যথার্থই অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। আর মানুষ তাকে বুঝবার অধিকার তখনই অর্জন করতে পারে, যখন তার এই গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য তাদের মনে বদ্ধমূল হবে। পক্ষান্তরে এই গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য যদি মানুষের সামনে না থাকে, তাহলে মানুষের মন-মস্তিষ্কের পক্ষে তাকে এহেন আয়োজনের অধিকারী বলে বিবেচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়, যতটা তার কাম্য। কোন ভূমিখন্ড সম্পর্কে যদি জানা থাকে যে, সেখান থেকে সোনা আহরিত হচ্ছে এবং এক কালে সেখান থেকে বহু সোনা আহরিত হয়েছে, তাহলে এ আশাই করা হবে যে, খনন করা হলে সেখান থেকে সোনাই বের হবে। তখন সে স্থানটির এই গুরুত্বের ভিত্তিতেই তা থেকে ফায়দা লাভের আয়োজন করা হবে এবং সেখানে শ্রম নিয়োগ করা হবে। কিন্তু যদি কোন খনিকে এমন কল্পনা করে নেয়া যায় যে, এটি নিঃশেষিত হয়ে গেছে কিংবা খনন করা হলে বড় জোর কিছু অংগার অথবা চুনা পাথরই পাওয়া যেতে পারে, তাহলে এতে কেউ এতটুকু সময়ও নষ্ট করতে চাইবে না। অগত্যা যদি নষ্ট করেও তবে এতটুকুই করবে যতটা লাভবান হওয়ার আশা করবে।

আমি উল্লিখিত সতর্কতা উচ্চারণের প্রয়োজন এজন্যে মনে করছি যে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে এমন কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, যার বর্তমানে কোরআন থেকে যথাযথ উপকার লাভ করতে হলে যে পরিমাণ মনোযোগের প্রয়োজন, তাকে ততটা মনোযোগের যোগ্য বিবেচনা করা সম্ভব নয়। এসব ভ্রান্ত ধারণা কোরআনের স্বীকৃতিদানকারী এবং অস্বীকারকারী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে। অবশ্য অস্বীকারকারীরা অন্তত এতটুকু স্বীকার করে যে, কোন এক বিশেষ যুগে এ গ্রন্থের মাধ্যমে কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে। কিন্তু তাদের মতে সে যুগ আর এখন নেই। তাছাড়া বেদুঈনদের সহজ-সরল জীবনের সমস্যাবলীর জন্যে

www.pathagar.com

যদিও এটি উপকারী হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান জটিলতার যুগে জটিলতর সব সমস্যার সমাধানের পক্ষে এ গ্রন্থ যথেষ্ট নয়।

আর যারা এ গ্রন্থের প্রতি স্বীকৃতি দেন, তাদের মধ্যেও আবার অনেকে একে শুধুমাত্র হারাম-হালালের ব্যাখ্যাদানকারী একটি বিধান-পুস্তক বলে মনে করেন। এসব বিধানকে পৃথকভাবে সংকলিত করে নিলে তাদের দৃষ্টিতে এর যেটুকু গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকে, তাহল শুধু বরকত লাভের দিক। আবার এদের অনেকের মতে, এটা মৃত্যু-কষ্ট লাঘব এবং ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশে ব্যবহারযোগ্য একটি পবিত্র গ্রন্থ মাত্র। আর যেভাবে খৃষ্টানরা এ ধরনের গ্রন্থকে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তেমনিভাবে এ শ্রেণীর মুসলমানরাও কোরআনকে পকেটেই পুরে রাখে। এমনি ধরনের ভুল ধারণার বশবর্তী মুসলমানরা কোরআন থেকে সেই উপকারিতা কিছুতেই লাভ করতে পারে না, যার জন্যে সেটি অবতীর্ণ হয়েছে। এদেরকে সে ব্যক্তির সাথে তুলনা করা চলে, যার হাতে শক্তিশালী কামান তুলে দিয়ে তার দ্বারা শত্রুর দুর্গকে চুরমার করে দিতে বলা হল, কিন্তু সে এই শক্তিশালী কামানকে মাছি মারার একটি কল বিবেচনা করে বসল এবং এমনি ধরনের হীন উদ্দেশে তার ব্যবহার শুরু করে দিল।

কোরআনের চাহিদানুযায়ী নিজের পরিবর্তন সাধনের দৃঢ় সংকল্প ঃ

কোরআনে হাকীম থেকে যথাযথ উপকার লাভের জন্যে তৃতীয় শর্তটি হল এই যে, মনে কোরআনের চাহিদা অনুসারে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে নিজেকে পরিবর্তন করার সুদৃঢ় সংকল্প বিদ্যমান থাকতে হবে। কোন লোক যখন কোরআনকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে, তখন পদে পদেই সে অনুভব করে, কোরআনের চাহিদা এবং দাবী তার স্থূল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সে দেখতে পায়, তার পূর্বকল্পিত ধ্যান-ধারণাগুলোও কোরআনের সাথে পার্থক্যপূর্ণ আর তার আচার-আচরণও কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা বহির্ভূত। তখন সে নিজের বাহ্যিক দিকটিকেও কোরআন থেকে অনেক দূরে দেখতে পায় এবং তার অভ্যন্তরকেও কোরআনের পরিপন্থী বলে অনুভব করে। এহেন বিরোধ-বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হবার পর একজন দৃঢ় সংকল্প সত্যান্বেষী ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে যে, যাই ঘটুক না কেন, আমি নিজেকে কোরআনের চাহিদা মোতাবেক অবশ্যই গঠন করে নেব। সুতরাং সে চরম ত্যাগ স্বীকার করে যেকোন রকম বিপদাপদ সহ্য করে নিজেকে কোরআনের চাহিদা অনুযায়ী গঠন করতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে কোরআনের

www.pathagar.com

ছাঁচে গঠন করতে সমর্থও হয়। কিন্তু যারা দৃঢ় সংকল্প নয় তারা সে ব্যবধান দূর করার সাহসই করতে পারে না, যা তারা নিজের এবং কোরআনের মধ্যে প্রতিবন্ধক দেখতে পায়। তারা অনুভব করে, যদি আমি নিজের আকীদা -বিশ্বাসসমূহকে কোরআন অনুযায়ী তৈরী করতে চেষ্টা করি, তাহলে আমাকে মানসিক এবং স্নায়ুবিক দিক থেকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করতে হবে। সে দেখতে পায়, আমি যদি নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপকে কোরআনের ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করি, তাহলে আমার নিজস্ব পরিবেশ আমার জন্যে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত হয়ে পড়বে। তার মনে এমন ধারণারও সৃষ্টি হয় যে, আমি যদি নিজেকে এসব উদ্দেশ্য সাধনে পরিব্যস্ত করে ফেলি, যা কোরআন আমার কাছে দাবী করে, তাহলে আমি যে আনন্দ-ও মুনাফা লাভ করছি, তা লাভ করা তো দূরের কথা, জেল-ফাঁসির মত সুকঠিন সাজা ভোগ করাও বিচিত্র নয়। সে স্পষ্ট দেখতে পায়, যদি আমার জীবিকার উপকরণগুলোকে কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত হালাল-হারামের কষ্টি পাথরে যাচাই করি, তাহলে আমি এখন যে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে দিন কাটাচ্ছি, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে হয়ত রোজ-রোজকার জীবিকা সংগ্রহের জন্যেই চিন্তান্বিত হয়ে পড়তে হবে। এসব আশঙ্কার মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং এগুলোর মোকাবিলা করার জন্য সুকঠিন মনোবল সঞ্চয় করা যার তার কাজ নয়। শুধুমাত্র দুঃসাহসী ব্যক্তিরাই এহেন কঠিন ঘাঁটি পার হতে পারে। দুর্বল স্নায়ুর লোকেরা এখানে এসেই মনোবল হারিয়ে ফেলে; গতি পরিবর্তন করে নেয়। আর যারা নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার পক্ষপাতী নয়; তারা এই বলে নিজেদের অনুসৃত পথেই চলতে শুরু করে যে, কোরআনের নির্দেশিত পথ নিঃসন্দেহে একান্ত যথার্থ; কিন্তু এতে চলা অতি কঠিন। কাজেই আমরা সে পথেই চলব, আমাদের রিপু যে পথে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা নিজেদের দুর্বলতাকে সংকল্প এবং প্রতারণাকে বিশ্বাস হিসেবে উপস্থাপন করতে আগ্রহী, তারা নিজেদের এই আগ্রহ বিভিন্ন উপায়ে পূর্ণ করে থাকে। কেউ কেউ অপারগতা এবং বাধ্যতার ছলে নিজেদের জন্যে অবৈধকে বৈধ এবং হারামকে হালাল করে নেয়। কেউ কেউ নানারূপ ছলচাতুরী ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মিথ্যার ওপর সত্যের রং লাগিয়ে নেয়। আর কেউ কেউ সময়ের চাহিদা কিংবা আপাত সুবিধা খুঁজতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ কালামুল্লাহর এমন অপব্যাখ্যার চেষ্টাও করে যেমন ইহুদীরা করেছিল। আর অনেকে কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি একটা পথ বের করে নিতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ, কোরআনের যে অংশটুকু তাদের নিজেদের মনোমত বলে মনে হয়, তারই অনুসরণ করে আর যে অংশটুকু তাদের মনোমত নয় তা বর্জন করে।

www.pathagar.com

এই সমস্ত পথই শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত। এর যেকোন পথই মানুষ অবলম্বন করবে, সে পথ সরাসরি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। কৃতকার্যতা এবং কল্যাণের পথ একমাত্র এই যে, মানুষ নিজেকে কোরআনের ছাঁচে ঢেলে নেয়ার সাহস করে সে জন্যে যেকোন রকম ত্যাগের জন্যে উদ্বুদ্ধ হবে। কিছুকাল আল্লাহ্র তরফ থেকে এ পথের পরীক্ষা চলতে থাকে। কিন্তু যদি এতে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে চেষ্টা করে, তাহলে তার জন্যে সৌভাগ্য ও কৃতকার্যতার পথ খুলতে শুরু করে, একটি দরজা যদি বন্ধ হয়ে যায়, আল্লাহ্ তার জন্যে অন্য আরেকটি দরজা খুলে দেন। একটি পরিবেশ থেকে যদি সে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহলে অন্য একটি তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসে। কোন এলাকা যদি তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে, তাহলে অন্য এলাকা তার জন্যে কোল প্রেতে দেয়। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য করেই কোরআনে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (ط) وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ, আর যারা আমার পথে চেষ্টা করবে আমি অবশ্যই তাদের জন্যে পথ খুলে দেব। আর আল্লাহ্ কল্যাণব্রতীদের সাথে রয়েছেন।—(আল-আন্কাবূত, ৬৯)

মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করা ঃ

কোরআন থেকে যথার্থ উপকার লাভের জন্যে চতুর্থ শর্তটি হল মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করা। এ সম্পর্কে কোরআন নিজেই বারবার উল্লেখ করেছে — أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا অর্থাৎ কোরআন সম্পর্কে এরা কি চিন্তা করে না? নাকি এদের হৃদয়ে তালা পড়ে আছে? সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম— যাঁরা কোরআনের প্রাথমিক লক্ষ্য, তাঁরা কোরআনকে অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতেন এবং যাঁরা যত গভীরভাবে চিন্তা করতেন তাঁরা কোরআনের জ্ঞানে ততই সমৃদ্ধ ছিলেন। সাহাবাগণ কোরআন মজীদের পর্যালোচনার জন্যে আলোচনা চক্রও (Forum) স্থাপন করেছিলেন, যাতে উৎসাহী সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে কোরআন পর্যালোচনা করতেন। এ ধরনের কোরআন পর্যালোচনা চক্রের প্রতি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও উৎসাহ ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, খোলাফায়ে রাশেদীন, বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ) এসব কোরআনী আলোচনাচক্র ও কোরআন বিশারদদের প্রতি বিপুল আগ্রহ প্রদর্শন করতেন।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র সওয়াবের কাজ হিসেবে কোরআনের শব্দসমূহের আবৃত্তি করে নেয়া এবং কোরআনের অর্থের প্রতি খেয়াল না করা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি ছিল না। এ ধরনের রীতি তখনই প্রচলিত হয়েছে, যখন থেকে মানুষ কোরআনকে একটা জীবন বিধানের পরিবর্তে কেবলমাত্র বরকত লাভের মাধ্যম হিসেবে ধরে নিয়েছে। যখন জীবনের সাথে কোরআনের সম্পর্ক শুধু এতটুকু রয়ে গেছে যে, এর দ্বারা মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যু-কষ্ট লাঘব করা যেতে পারবে, আর মৃত্যুর পরে এর মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করা যাবে। যখন জীবনের উত্থান-পতনে পথপ্রদর্শক হওয়ার স্থলে এর কার্যকারিতা শুধুমাত্র এটুকু রয়ে গেছে যে, আমরা যেকোন ভ্রষ্ট পদক্ষেপের উদ্বোধন এর মাধ্যমে করব তাতে এর বরকতে সেই ভ্রষ্টতাও হেদায়াতে পরিণত হবে। যখন থেকে মানুষ কোরআনকে তাবিজ-কবচ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে এবং ভেবে নিয়েছে, যেকোন হীন উদ্দেশ্য সাধনের পথে যাত্রা করার মুহূর্তেও কোরআনের তাবিজ ধারণ করে সাফল্য লাভ করা যেতে পারে।

দুনিয়ায় এমন গ্রন্থ একান্তই বিরল যাকে কোরআনের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই তার যথার্থ উপকারিতা তখনই লাভ করা সম্ভব, যখন তা সম্পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা হবে। কিন্তু সাথে সাথে এটাও অনস্বীকার্য যে, কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সব সময়ই চোখ বন্ধ করে পাঠ করা যায়। একটা সাধারণ জিনিসও মানুষ যখন পাঠ করে, তখন সর্বাগ্রে নিজের মন-মস্তিষ্কে একাগ্রতা সৃষ্টি করে নেয়। কিন্তু কোরআনের ব্যাপারে মানুষের এক অদ্ভুত আচরণ পরিলক্ষিত হয় যে, যখনই তা পাঠ করার ইচ্ছা করে, তখন সর্বাগ্রে নিজ নিজ মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে পট্টি বেঁধে নেয়, দৈবাৎ যাতে তার কোন শব্দের অর্থ মন-মস্তিষ্ককে স্পর্শ করতে না পারে!

কোরআনের দ্বারা যথার্থভাবে উপকৃত হওয়ার জন্যে পঞ্চম শর্ত হল, তার কোন জটিলতার দরুন নিরাশ কিংবা ভগ্নোৎসাহ হওয়ার অথবা কোরআনের প্রতি সন্দিহান বা বিরূপ মন্তব্য করার পরিবর্তে নিজের জটিলতাসমূহ আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা নির্দেশ কামনা করা। মানুষ কোরআন পাঠ করতে গিয়ে অনেক সময় উপলব্ধি করে যে, সে এমন এক 'কঠিন বাক্যের' চাপের সম্মুখীন হয়েছে, যা তার পক্ষে বহন করাই সম্ভব নয়। তেমনিভাবে সে অনেক সময় মনে করে, তার সামনে এমন জটিলতা এসে হাযির হয়েছে, যার এমন কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভবই নয়, যাতে সে সন্তুষ্ট হতে পারবে। এ ধরনের জটিলতা এবং অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে

www.pathagar.com

সঠিক এবং পরীক্ষিত একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা আর কোরআনের উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা। কোরআন যদি মুখস্থ থাকে তাহলে রাত্রে নামাযের মধ্যে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ্ তাতে তার যাবতীয় জটিলতা দূর হয়ে যাবে এবং কোরআনী জ্ঞানের এমন দরজা তার জন্যে উন্মুক্ত হবে, যাতে কোরআনে হাকীমের যাবতীয় জটিলতাই সহজ হয়ে পড়বে। তাছাড়া এমন জটিলতর অবস্থা সৃষ্টি হলে নিম্নলিখিত দোয়া পড়তে থাকলেও উপকার পাওয়া যায়

اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك نا صيتى بيدك ماض فى
حكمك عدل فى رضاءك اسئلك بكل اسم هولك سميت به
نفسك وانزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك ان تجعل
القران ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وغمى

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্! আমি তোমার দাস। তোমার দাসের এবং তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাট তোমারই হাতের মুঠোয় আবদ্ধ, আমার প্রতি তোমার নির্দেশ জারি রয়েছে। আমার সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্তই যথার্থ। আমি তোমার কাছে তোমার সে সমস্ত নামের মাধ্যমে যা, তোমার রয়েছে, যাতে তুমি নিজেই নিজেকে অভিহিত করেছ অথবা যা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ কিংবা যা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে শিখিয়েছ – প্রার্থনা করছি, তুমি কোরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার অন্তরের নূর, আমার চিন্তা হরণকারী এবং আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রতিকার বানিয়ে দাও।

www.pathagar.com

কোরআনের গবেষণা

যেসব শিক্ষার্থী কোরআন নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন এবং তার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে চাইছেন, তারা জানতে চান, কোরআনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে কি কি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে? তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কতিপয় বিষয় নিবেদন করতে চেষ্টা করব। আশা করি, কোরআনের পর্যালোচনাকারীদের এতে যথেষ্ট উপকার সাধিত হবে।

উদ্দেশ্য বা নিয়তের যথার্থতা ঃ

কোরআনের পর্যালোচনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম বিষয়- যেমন পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে— তা হল নিয়ত বা ইচ্ছার যথার্থতা। নিয়তের যথার্থতা বলতে বর্তমান যুগে সাধারণত যা বুঝা যায়, এখানে আমি তার চেয়ে কিছুটা বিস্তৃত অর্থ উপস্থাপন করব। সুতরাং এখানেই তার একটা মোটামুটি বিশ্লেষণ দিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে যেকোন জ্ঞানের চর্চা কিংবা পর্যালোচনার একটা বিশেষ রীতি রয়েছে, যার সর্বজনসমাদৃত একটা রূপও আছে। তাকে আমরা 'রিসার্চ' নামে অভিহিত করি। যদিও এটি শুধু এ যুগের সাথেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়, সব যুগেই জ্ঞানী-গবেষকদের পন্থা এ-ই ছিল, কিন্তু আমাদের বর্তমান দুরবস্থা আমাদের সাহস এমনভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে যে, আমাদের মাঝে পূর্ববর্তী মনীষীদের প্রতি না আছে কোন শ্রদ্ধা, না আছে বর্তমানের পথে চলতে গিয়ে বন্ধুরতাকে অতিক্রম করার সৎসাহস। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্যে কোরআন মজীদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বর্তমান যুগের সাধারণ রিসার্চের ঊর্ধ্বেও কোন কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করা একান্তই অদ্ভুত দেখাবে। কিন্তু যেহেতু প্রকৃত সত্য তা-ই, কাজেই সেই অদ্ভুত বিষয়টিও বলে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। এ সময় যদিও এসব বিষয়ের সঠিক মূল্য দেয়ার মত লোকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, কিন্তু তথাপি যদি সামান্য লোকও এমন পাওয়া যায়, যারা এসব বিষয়ের মূল্য দেবেন এবং কোরআনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ এতে যথেষ্ট সুফল লাভ হবে।

কোরআন মজীদ যে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র, এ প্রশ্নে তর্কের মোটেই অবকাশ নেই। সামান্যতম ধর্মজ্ঞানও যাদের রয়েছে, তারা সবাই একমত যে,

www.pathagar.com

কোরআনের রহস্য চিন্তা-গবেষণা ছাড়া উদঘাটিত হতে পারে না। কিন্তু কোরআন মজীদের ব্যাপারে শুধুমাত্র চিন্তা-গবেষণাই যথেষ্ট নয়, বরং এই চিন্তা-গবেষণার জন্যেও কতিপয় বিশেষ শর্ত এবং নিয়ম-নীতির অনুশীলন প্রয়োজন। যদি এসব নিয়ম-নীতি বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে সাধারণত যাবতীয় চিন্তা-গবেষণাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, আর সে কারণেই হয়ত বর্তমান যুগে কোরআন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের অবস্থার কোন সংস্কার হচ্ছে না। বরং গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আশার সামান্যতম আলোটুকুও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, যা সাধারণ নৈরাশ্যের অন্ধকারে কখনো কখনো আমাদের সামনে ভেসে উঠত। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, আজকাল অধিকাংশ ফেতনা-ফাসাদই কোরআনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে। পক্ষান্তরে কোরআনের আবির্ভাব হয়েছিল যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের মীমাংসার জন্যে; ফেতনা সৃষ্টি করার কিংবা ফেতনাকে জিইয়ে রাখার জন্যে নয়। কিন্তু এটা এক অদ্ভুত বাস্তব যে, অতীতে অথবা বর্তমানে যত রকম ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তার প্রায় সবই এই কোরআনকে কেন্দ্র করেই।

খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব তাদের ধারণায় কোরআন মজীদের আশ্রয়েই ঘটেছে। বাতেনী সম্প্রদায়ের ধারণা মতে কোরআনই তাদের যাবতীয় যুক্তি-প্রমাণের উৎস মূল। বাবী এবং বাহায়ী সম্প্রদায়ও যা কিছু বলেছে, তাদের মতে কোরআন অনুযায়ীই বলেছে। কাদিয়ানীদের নবুয়তের ভিত্তিও তাদের দাবী অনুযায়ী কোরআনই। তাছাড়া চাক্ড়ালভী তো কোরআন ছাড়া কিছুই বলে না। এই হাজারো সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তো মাত্র কয়েকটির নাম উল্লেখ করলাম। ইসলামী ইতিহাসের সমস্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা এবং তাদের ভিত্তির ব্যাপারে জানতে গেলে দেখা যাবে, তাদের সবার হাতেই রয়েছে কোরআন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এর কারণ কি? কোরআন তো হেদায়াত এবং পথ প্রদর্শনের জন্যে আলোর মশাল; পথভ্রষ্টতার আঁধারের সাথে তার কি সম্পর্ক? অথচ উচিত তো ছিল, যে কেউ তা অনুসরণ করবে এবং পড়বে, সে পাবে সঠিক পথের সন্ধান, সরল যে পথ তাই ভেসে উঠবে, হেদায়াত ও ঈমানের আলোয় ভরে উঠবে তার হৃদয়-মন, সব দিকে একত্ব ও একাগ্রতার মহান পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবে তার সামনে, বিভেদ-বিভ্রান্তির যাবতীয় বক্রতা দূর হয়ে যাবে, আর তার শিক্ষা ও আমন্ত্রণের সমর্থনে সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ প্রতিধ্বনিতে তার মন-প্রাণ এমনিভাবে ভরে উঠবে, যা ছাড়া সে আর অন্য কোন কিছুই ভাবতে পারবে না,

www.pathagar.com

কিছুই সে উপলব্ধি করতে পারবে না। কিন্তু হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাকে একটি তলোয়ারের মত শত্রু-মিত্র উভয়েই সমানভাবে ব্যবহার করছে। ঈমানদার মুমিন এরই সাহায্যে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আর অপর দিকে প্রতারক, মুনাফিক এরই মাধ্যমে সত্য ও বাস্তবকে পরাজিত করতে চাইছে। কোরআন কেন সবার সামনে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হচ্ছে না? তার পরিষ্কার ও প্রকৃষ্ট শিক্ষা প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়কে কেন স্পর্শ করছে না? অথচ তার প্রকৃত সংজ্ঞা তো এ-ই যে, সে যেকোন রকম বক্রতা, গরলতা এবং দুর্বোধ্যতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। নিজ শিক্ষা এবং বিশ্লেষণে সে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত ও প্রকৃষ্ট। তার প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে পূর্ণ একত্ব এবং প্রকৃষ্ট সামঞ্জস্য। তবুও এর বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন পথে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় কেন? কেন সে সবাইকে টেনে এনে ঈমান ও বিশ্বাসের একটিমাত্র পতাকা তলে সমবেত করে না?

এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোরআন পাঠ ও পর্যালোচনার জন্যে বিশেষ কিছু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে, যার প্রতি যথার্থভাবে লক্ষ্য রাখা এবং সঠিকভাবে অনুশীলন করা অপরিহার্য। এছাড়া কোরআনের সঠিক পথ উন্মোচিত হতে পারে না। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হল নিয়ত বা ইচ্ছার যথার্থতা। এটা আল্লাহ্র কালাম এবং সৃষ্টির হেদায়াতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই সর্বপ্রথম নিয়ম হল এই যে, পাঠক যাবতীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে একমাত্র হেদায়াতপ্রাপ্তির আশায় একে পাঠ করবে এবং নিজের মন ও মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে এর উপর ন্যস্ত করে দেবে। নিজের মনের বল্গা তারই হাতে তুলে দেবে। যাবতীয় চিন্তা-ধারণা ও ভক্তি-বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে এ ব্যাপারে প্রস্তুত করে নেবে যে, কোরআনের মাঝে নিজের আশা-আকাঙক্ষার বৈধতার সনদ, নিজের ভক্তি-বিশ্বাসের উপকরণ এবং নিজের রিপুর আশ্রয় অনুসন্ধান করবে না। বক্র যুক্তি-তর্কের সন্ধান করবে না, বরং তার মাঝে সন্ধান করবে শান্তি এবং মনস্তুষ্টি। তার আলো যেদিকে পথ প্রদর্শন করবে সে দিকেই চলবে। এমন কোন প্রচেষ্টা চালাবে না, যা কোরআনকে নিজের বৈষয়িক কামনার পেছনে লাগাবে। কারণ, হেদায়াতপ্রাপ্তি যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়, বরং বক্র তর্ক আর প্রশ্নই যার উদ্দেশ্য এবং তার রিপুসমূহ তার মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করেছে, কোরআনকে যে সেসবের সমর্থনে মিলিয়ে নিতে চায়, তার জন্যে কোরআনে শুধুমাত্র নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বয়ং কোরআনই নিজের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে ঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ

www.pathagar.com

مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ -

অর্থাৎ, তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যাতে কিছু আয়াত রয়েছে বিধান সংক্রান্ত আর কিছু রয়েছে দ্ব্যর্থবোধক। কাজেই যাদের মনে বক্রতা রয়েছে, তারা কোরআনের সেসব দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের পেছনে লেগে যায়; ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে এবং তার মূল রহস্য জানবার জন্যে, অথচ আল্লাহ্ ছাড়া তার মূল রহস্য কারও জানা নেই। আর যাঁরা জ্ঞানে পরিপক্ব তাঁরা বলেন, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। সবই আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। একমাত্র বুদ্ধিমানদের ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝে না।

কোরআনের আয়াত দু'রকমের ঃ

মোটামুটিভাবে উল্লিখিত আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনে দু'রকমের আয়াত রয়েছে। প্রথমত আহকাম বা বিধান সম্বলিত আর দ্বিতীয়ত দ্ব্যর্থবোধক; মুহকামাত এবং মুতাশাবেহাত। মুহকামাত নিজ অর্থে এবং উদ্দেশে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। সেগুলোতে কোন দিক দিয়েই কোন রকম দ্বিবিধতার সন্দেহ নেই, সেগুলোর সম্পর্ক আমাদের প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং বৈষয়িক জীবনের সাথে। কাজেই আমরা সেগুলোর সমস্ত দিককেই নিজেদের আওতায় নিতে পারি এবং যুক্তি-প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিয়ে সেগুলোর ব্যাপারে সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

মুতাশাবেহাতের অবস্থা এর থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। নিয়মানুসারে যেহেতু সেগুলো যুক্তি-প্রমাণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কাজেই সেগুলোর ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করতে বিবেককে কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না, কিন্তু সেগুলোর যোগসূত্র যেহেতু এই অনুভূতির জগত থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, কাজেই সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে সংকুলান হয় না।

কোরআনের পাঠক দু'রকমের ঃ কোরআনের আয়াত যেমন দু'রকমের, তেমনিভাবে কোরআনের পাঠকও দু'রকমের। প্রথমত সেসব লোক, যারা নিজের নিয়ত এবং উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ ও হেদায়াতলাভ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কোরআন সঙ্গে সঙ্গে এসব লোকের হাত ধরে নিজের পরিচর্যায় টেনে নেয়। তারা কোরআনের আয়াতে

www.pathagar.com

মুহকামাতসমূহের মাঝে নিজের আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি এবং বিশ্বাস ও বৈষয়িক জীবনের পক্ষে পরিপূর্ণ দিশা লাভ করতে পারে। দীর্ঘ পথভ্রষ্টতার পর তাদের মনে হয়, যেন তারা মন-মস্তিষ্কের পরম প্রশান্তির বেহেশতে আরোহণ করেছে। তাদের মনের সমস্ত জ্বালা নিবারিত হয়ে যায়। ধন্দ-সন্দেহের কাঁটা একে একে খসে যেতে থাকে। মুতাশাবেহাতের কোন ভয়-ভীতি আর তাদের মনকে ভীত করতে পারে না। কারণ, সেগুলোও নিয়ম-নীতির দিক দিয়ে যুক্তি-বুদ্ধির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আর মোটামুটিভাবে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনতে কিংবা বিশ্বাস স্থাপন করতে বিবেককে কোন রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। শুধু এটুকু যে, সেগুলোর খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে কোন বিস্তারিত ধারণা বিবেকের আওতায় আসে না। কিন্তু এটা এমন কোন বিষয় নয়, যা অস্বীকৃতি কিংবা অনীহার কারণ হতে পারে। আমাদের কাছে যদি ৯৯ টাকা থাকে তাহলে তা বেড়ে একশত হয়ে গেলে উত্তম, কিন্তু তা না হলে কি আমরা সে ৯৯ টাকা পকেট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব? কাজেই এসব আয়াতের বেলায় তারা আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং বলে,

اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

অর্থাৎ আমরা এগুলোর ওপর ঈমান এনেছি— এগুলো সবই আমাদের পরওয়ারদেগার কর্তৃক অবতীর্ণ। আর তাদের এ উক্তি তাদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত নয়, বরং তাদের বুদ্ধি-বিবেকের পরিপক্কতারই ফল। বস্তুতঃ কোরআন তাদেরকে اَلرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ (জ্ঞান পক্ব)-এর মহান উপাধিতে ভূষিত করেছে।
কারণ, আয়াতে মুতাশাবেহাত বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ সম্পর্কে তাদের এই নিরঙ্কুশ স্বীকারোক্তি প্রকৃতপক্ষে তাদের বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা, বিবেচনা শক্তির চরম উৎকর্ষ এবং জ্ঞানের পরিপক্কতারই সর্ববৃহৎ প্রমাণ বহন করে। এর অর্থ এই যে, তারা সন্দেহ-সংশয়ের বিষয়টিকে অমূলক বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ সম্পর্কে তাদের কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে প্রকৃষ্ট ধারণার অপেক্ষা। আর এ ব্যাপারেও তারা আশান্বিত যে, শীঘ্রই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের মনস্তুষ্টি বিধান করবেন। আর কখনও যদি এসব সন্দেহ, অস্থিরতা এবং উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর তাতে মানসিক প্রশান্তিতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তখন সাথে সাথে তাদের কণ্ঠে এই প্রার্থনা আবৃত্ত হতে থাকে যা এ আয়াতের পরেই অবতীর্ণ হয়েছে —

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর

www.pathagar.com

আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করো না। তোমার কাছ থেকে আমাদের রহমত দান কর। তুমিই মহান দাতা।

দ্বিতীয় দল হল তাদের, যারা নিজেদের নিয়তের সুষ্ঠুতা ছাড়াই নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদার সমর্থন যোগাবার জন্যে কোরআন পাঠ করে এবং কোরআনের ওপর নিজেদের যাবতীয় ইচ্ছাকে ন্যস্ত করার পরিবর্তে কোরআনকে নিজেদের ইচ্ছার বশীভূত করে নিয়ে তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য থাকে সুপথপ্রাপ্তির পরিবর্তে নিজেদের স্থিরীকৃত কোন বিশেষ মতবাদের পক্ষে সমর্থন লাভ করা। অর্থাৎ, যাদের সাথে তাদের মতবিরোধ তাদের জব্দ করার জন্যে তাতে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং উল্টা-সিধা বিতর্কের পথ খুঁজে বের করাই থাকে তাদের লক্ষ্য। কাজেই এটাই স্বাভাবিক যে, এরা যখন কোরআন পাঠ করবে, তখন 'মুহকামাত'-এর পরোয়া না করাই এদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, তাতে তাদের মতলব সাধিত হবার নয়। শান্তি কিংবা আমল বা অনুসরণের পথপ্রাপ্তি তাদের উদ্দেশ্য নয়, যার ফলে মানসিক প্রশান্তি লাভ সম্ভব। বরং আসলে তাদের উদ্দেশ্য থাকে ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুসন্ধান। কাজেই গোটা কোরআনে শুধুমাত্র সে বিষয়গুলোই তাদের মনঃপূত যা তাদের মনস্কামনা এবং কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা নিজেদের প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করার জন্যে বিশেষ উপযোগী। যাদের গবেষণা-অনুসন্ধানের এহেন প্রকৃতি, কোরআনের মুহকামাতের প্রতি তাদের কোনরূপ আগ্রহ থাকতে পারে না। তারা শুধুমাত্র মুতাশাবেহাতের দিকেই এগিয়ে যাবে এবং যেসব ব্যাপার মোটামুটি মেনে নেয়াই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল, তারা সেগুলোর খুঁটিনাটির প্রতি অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে যাবে। আর একান্ত ইহুদীদের মত যাদের মনে এ ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল যে, দোযখের আগুনের মাঝে আবার গাছ কেমন করে থাকতে পারে। (আর এ প্রশ্নের কারণেই তারা নিজেদের জন্যে আল্লাহ্‌র হেদায়াতের দ্বার চিরতরে বন্ধ করে নিয়েছিল।) এরাও নানা রকম সন্দেহ সৃষ্টি করবে আর এভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করে রাখবে।

এ ধরনের লোকদের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এরা নিজেদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধির একক ধারক-বাহক বলে মনে করে। কিন্তু কোরআনে বর্ণিত আয়াতে তাদেরকে একান্ত নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুতঃ এদের চেয়ে বেশী নির্বোধ হবেই বা কে, যাদের সবচেয়ে বড় বাসনা এই যে, সমগ্র কোরআনে এমন কোন বিষয় প্রাপ্ত হবে, যা তাদের মনোবাসনার সাথে সুসমঞ্জস হবে অথবা যার ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রশ্ন করতে পারবে?

www.pathagar.com

যেকোন লোক যদি বিজ্ঞানের নয়শত নিরানব্বইটি নীতিকে এজন্যে প্রত্যাখ্যান করে যে, তার হাজারতম নীতিটি তার খুঁটিনাটি বিষয়কে 'সম্পূর্ণভাবে' পরিবেষ্টিত করতে পারেনি, তাহলে তার চেয়ে নির্বোধ আর কে হতে পারে? এখানে 'সম্পূর্ণভাবে' কথাটার উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই এ জন্যে যে, মুতাশাবেহাত বা বিতর্কিত আয়াত জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত কোন বিষয় নয়, বরং সেগুলো জ্ঞান-বুদ্ধির সীমানারই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমরা বুঝতে পারি না। কারণ, আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার যাবতীয় অভিজ্ঞতাই সেসবের উপস্থাপনে অসমর্থ।

প্রকৃতপক্ষে এটা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে উপস্থিত বঞ্চিতদেরই কথা। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ আয়াত সর্বযুগের পরিপক্ক জ্ঞানী এবং ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেছে। ইতিহাসের সব যুগেই কোরআনের পাঠকেরা এই দুটি দলে বিভক্ত ছিল। একটি পরিপক্ক জ্ঞান ও যথার্থ চিন্তাশীল; দ্বিতীয়টি ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন। এক দলের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোরআনের মুহ্কামাত সম্পর্কিত অংশ। কারণ, হেদায়াত প্রাপ্তিই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ দলটি কোরআনের দ্বারা বিপুল উপকার ও সৎ-সরল পথের সন্ধান পেয়েছে। দ্বিতীয় দলটি হল দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ও অপব্যাখ্যাকারীদের। কোরআনকে এরা হেদায়াতপ্রাপ্তির জন্যে নয়, বরং ফাসাদ সৃষ্টির জন্যেই পাঠ-পর্যালোচনা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য অসৎ এবং ইচ্ছা ছিল কুটিল। ফলে স্বভাবতই এরা কোরআনের সে অংশটুকুই খুঁজে বের করেছে, যা মুতাশাবেহাত সম্পর্কিত এবং যাতে মানব বুদ্ধিকে একান্তভাবে সংযত রাখতে না পারলে এবং আল্লাহ্র একান্ত মেহেরবানী সাথে না থাকলে প্রতি পদে পদেই হোঁচট খাবার সম্ভাবনা থাকে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোরআন অবতীর্ণ করেছেন ঈমান ও আমলের শিক্ষা এবং আত্মা ও মন-মানসের পরিশুদ্ধির জন্যে; মস্তিষ্কের উদ্ভ্রান্তি কিংবা বাঁকা বিতর্কের জন্যে নয়। সুতরাং তার আশীষ বা উপকারিতা সে-ই লাভ করতে পারে, যে পবিত্র মন এবং মুক্ত কান নিয়ে এর নিকটবর্তী হবে; বিবাদ সৃষ্টিকারী মস্তিষ্ক এবং জটিলতা সৃষ্টিকারী বুদ্ধি নিয়ে নয়। সূরা কাফ-এ এরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ فِى ذَالِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.

অর্থাৎ, এর মাঝে সে ব্যক্তির জন্যে স্মারক বাণী রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সজাগ হৃদয় অথবা এমন শ্রবণশক্তি, যা শ্রবণানুরাগী।

www.pathagar.com

আর সূরা 'সাফ্ফাতে' হৃদয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তা হবে 'সালীম'— (সালীম অর্থ সুস্থ)। বলা হয়েছে إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (কিন্তু যে লোক আল্লাহ্‌র নিকট সুস্থ বিবেক নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।) সূরা 'কাফ'-এ এরশাদ হয়েছে وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (যে লোক আগ্রহান্বিত হৃদয় নিয়ে এসেছে)। এ দুটি শব্দের (سَلِيمٍ এবং مُنِيبٍ) দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র কালাম যারা শুনতে আসবে, তারা সুস্থ বিবেক এবং আগ্রহান্বিত হৃদয় নিয়ে আসবে। দাম্ভিক এবং উগ্র হৃদয় নিয়ে নয়। কারণ, এহেন হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মোহর আঁটা থাকে। ফলে এরা আল্লাহ্‌র বাণীর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

কোরআন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণার প্রথম পর্যায়েই যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, তা হল এই যে, এদিকে শুধুমাত্র সে পদক্ষেপই শুভ ও কল্যাণকর হবে, যা ঈমান এবং সৎকাজের সামর্থ্য লাভের জন্যে হবে। এই একটি মাত্র বাসনা ছাড়া কারো মাঝে অন্য যেকোন বাসনার যৎসামান্য সংমিশ্রণ থাকলে তার জন্যে কোরআনের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। বস্তুত মানব প্রচেষ্টার কোন চাবিকাঠিই সে রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করতে পারে না। কথা শুনে সাথে সাথে তার অনুসরণ এবং কার্যকরী করার জন্যে প্রচেষ্টা চালালেই কোরআন অতি উত্তম। আর ধাপে ধাপে ঈমান ও আমলের পথে আমরা যতটা দৃঢ়তা অবলম্বন করতে থাকব, ততটাই তার বরকত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অন্যথায় তা হবে না। আমরা কোরআনের বাণী জানতে চাই সত্য, কিন্তু সক্রিয় সাহস কিংবা কার্যকরী মনোবল অর্জন করতে পারি না। অথবা নিজেদের মনোবাসনাকে তার মোকাবিলায় বর্জন করতে পারি না কিংবা শুধুমাত্র এজন্যে তা পড়তে চাই যাতে আমাদের মাঝে অনুসন্ধান এবং গবেষণার যে আগ্রহ বিদ্যমান অথবা আমাদের যেসব নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে, তার পক্ষে কোরআন থেকে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি। তা হলে, কোরআন আমাদের জন্যে বঞ্চিতি ছাড়া আর কিছুই সরবরাহ করবে না।

হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

ওপরে আমরা যে দুটি দলের কথা উল্লেখ করেছি, তা একান্তভাবেই ছিল নীতিগত বিভক্তি। কোরআন মজীদ নিজে আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে বলে

www.pathagar.com

দিয়েছে কোন্ ধরনের লোক কোরআন থেকে হেদায়াত হাসিল করতে পারবে, আর কারা তা থেকে কোন রকম ফায়দালাভে বঞ্চিত থাকবে।

হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে একটি নীতিগত সত্য এই যে, এটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। যাদেরকে আল্লাহ্ সামর্থ্য দান করেন, তারাই এই কিতাব থেকে যথাযথ ফায়দা হাসিল করতে পারে। আর যাদেরকে আল্লাহ্ এই সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, তারা এই কিতাবের ফায়দা লাভ থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। কোরআন এই নীতির বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলেছে ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

অর্থাৎ, এই কিতাব, যেটি আমি তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি, তোমাদেরকে (অজ্ঞানতার) অন্ধকার থেকে মুক্ত করে (জ্ঞানের) আলোর দিকে নিয়ে যেতে। তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে মহাপ্রশংসিত আল্লাহ্র পথের দিকে। অর্থাৎ, কোরআনের উদ্দেশ্য হল মানুষকে গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ঈমান ও হেদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে আসা। আর এ কাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বর্ণিত হয়েছে— با ذن ربهم অর্থাৎ, এতে নবীর কোন হাত নেই যে, তিনি যাকে চাইবেন তাকেই ঈমান ও হেদায়াত দান করতে পারবেন। বরং এটা আল্লাহর হাতে— তিনি যাকে ইচ্ছা ঈমান ও হেদায়াত দান করে ধন্য করেন, আর যাকে ইচ্ছা ভ্রষ্টতার খাদে নিক্ষেপ করেন। তার এই ইচ্ছাটাও আবার একটা বিশেষ নীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। কি সে নীতি? এর উত্তর কোরআন বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছে। বিশেষত সূরা বাকারার জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক পরিচ্ছেদে তুলনামূলকভাবে বেশী বিশ্লেষিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা বিষয়টির ব্যাখ্যাকল্পে তারই উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এরশাদ হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ـ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদের সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। পক্ষান্তরে যারা কুফ্রের আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সহায় হল তাগুত, যা তাদেরকে আলো থেকে বের করে

২—

www.pathagar.com

অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। বস্তুত ওরাই হল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই থাকবে ওরা অনন্তকাল।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ এবং তাঁর কিতাবের পথ-নির্দেশ শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্যেই নির্দিষ্ট; কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত। কাফেরদের সহায় হল তাগুত। সে তাদেরকে আলোর পথে চলতে বাধার সৃষ্টি করে। কখনও কোন আলোর ছটা তাদের মস্তিষ্কে বিকিরিত হলেও সাথে সাথে সেই তাগুত ওদেরকে ঠেলে নিয়ে অন্ধকারের যবনিকায় লুকিয়ে রাখে, যাতে করে আলোর রহস্য সম্পর্কে তারা অবহিত হতে না পারে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাদের উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, যাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন কিংবা যাদেরকে অন্ধকারেই ছেড়ে দেয়া হয়। সে জন্যে তিন শ্রেণীর লোক নির্ধারণ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۔ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۔ قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ
اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۔
قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ
إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ
نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۔

অর্থাৎ, তুমি কি সে লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করনি, যে লোক ইব্‌রাহীমের সাথে তার পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তাকে সাম্রাজ্য দিয়ে রেখেছিলেন? যখন ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেন, আমার পালনকর্তা তো তিনিই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তখন

www.pathagar.com

সে বললঃ আমিই তো বাঁচাই এবং মারি। ইব্রাহীম বললেন ঃ (আচ্ছা তা হলে) আল্লাহ্ তো সূর্যকে পূর্ব দিক দিয়ে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত কর দেখি। এ প্রশ্নে সে অবিশ্বাসী কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যাচারী যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না। কিংবা তোমরা কি সে লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে লোক এক বিধ্বস্ত জনপদের উপর দিয়ে যাচ্ছিল (আর) বলছিল, এ জনপদের মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কেমন করে তা পুনরুজ্জীবিত করবেন? তখন আল্লাহ্ তাকে একশত বছরকাল মৃত অবস্থায় রাখলেন (এবং) তারপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, (এ অবস্থায়) তুমি কত দিন ছিলে? সে বলল— একদিন কিংবা একদিনেরও কিছু কম সময়। তিনি বললেন, বরং তুমি (এ অবস্থায়) একশত বছর ছিলে। এখন তোমার খাদ্য বস্তুগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কোন কিছুই বিনষ্ট হয়নি। পক্ষান্তরে তোমার (বাহন) সে গাধাটির দিকে লক্ষ্য কর। আর আমি এমন করেছি এ জন্যে যাতে করে তোমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় এবং তোমাকে মানুষের জন্যে, উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। অতঃপর (তোমার সে গাধার) হাড়গুলোর প্রতি লক্ষ্য কর— দেখ, কেমন করে আমি সেগুলোকে জুড়ে খাড়া করি এবং কেমন করে তাতে মাংসের আস্তরণ পরাই। অতএব, যখন তার সামনে প্রকৃত সত্য বিকশিত হয়ে গেল, তখন সে বলল, আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছুর উপরে শক্তিমান।

তাছাড়া স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দাও। (আল্লাহ) বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? ইবরাহীম বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবুও আমার মনের স্থিরতার জন্যে (এ আবেদন)। তখন আল্লাহ্ বললেন, তা হলে চারটি পাখীকে জবাই করে (সেগুলোর গোশ্‌ত ভাল করে) নিজ হাতে মিলিয়ে নাও। অতঃপর এক এক অংশ গোশ্‌ত বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে দাও আর তাদের চেহারা চিনে রেখো। তারপর তাদেরকে ডাক, (দেখবে), সেগুলো তোমার কাছে ছুটে আসবে। আর বিশ্বাস করো, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

এসব আয়াত যেসব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে, সেসব বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এখানে আমরা শুধু এ সত্যটিই জানতে চাই, যা এসব আয়াতে নিহিত রয়েছে এবং যে বিষয়ের বর্ণনাভঙ্গি পথ প্রদর্শন করে। এসব

www.pathagar.com

আয়াত পূর্ববর্তী আয়াত اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا- এর পরেই বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলছেন যে, তারা কারা, যারা আঁধার থেকে আলোর দিকে আসতে আগ্রহী? আর তারাই বা কারা, যারা আলো থেকে আঁধারে লুকাতে চায়। কাজেই বর্ণনাভঙ্গি এবং বাক্যধারা—

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاۤجَّ اِبْرٰهِيْمَ

(তুমি কি সে লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করনি, যে লোক ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে?) অনুযায়ী দুটি বাক্যই পূর্ববর্ণিত আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত বলে বুঝা যায়। তারপর আমরা যখন এসব আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করি, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল, এসব আয়াতে তাই বিশদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কি ধরনের লোকেরা আল্লাহ প্রদত্ত আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যায় আর কি ধরনের লোক হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে। তাহলে আসুন, আয়াতগুলোকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে তিন ধরনের লোকের প্রকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথমত, সেসব লোক, যারা ধন-সম্পদ আর রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার সামনে আল্লাহর হেদায়াতের আলো উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু সে দাম্ভিক প্রমত্ততার দরুন কোন বিষয়েই চিন্তা করতে চায়নি। ইবরাহীম (আঃ)-এর কথার সাথে সাথেই তাঁর সাথে কুট তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার বিতর্কের যথার্থ জওয়াবও দেন এবং সে জওয়াবে সে সম্পূর্ণ হতভম্বও হয়ে পড়ে, কিন্তু তথাপি সে ঈমান ও হেদায়াতের পথ খুঁজে পায় না। কারণ, আল্লাহর যে আলো তা একান্তভাবেই অনুসন্ধানকারীর জন্যে। যারা এ ব্যাপারে কূট তর্কে লিপ্ত হয়, যদিও সে আলোতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তথাপি তারা ঈমানের পথ হাতড়ে পায় না। কারণ, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ-(আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হল তারা, যারা জ্ঞান, ঈমান, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধানী। আর এসব বিষয় লাভ করার জন্যে তারা সত্যান্বেষীদের পথই অনুসরণ করে। তারা জ্ঞানের মিথ্যা দাবীদারদের মত এবং তর্কবাজদের মত গ্রামে-গঞ্জে, মসজিদে-মাদ্রাসায় এবং দরগা-আখড়ায় বিতর্ক সভার আয়োজন

www.pathagar.com

করে বেড়ায় না। না মনে সাধারণ সন্দেহ উপস্থিত হলে সেগুলোকে কয়েক পাতায় ছেপে সারা দেশময় নিজের জ্ঞানের ঢোল পিটিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করে। বরং চিন্তাশীল মস্তিষ্ক এবং বিবেচনাশীল মানসের ন্যায় তারা নির্জনতা আর নীরবতার অনুরাগী হয়ে পড়ে। তারা গ্রাম-গঞ্জের ভিড় থেকে বহুদূরে চলে যেতে চায়। নগরীর কোলাহলকে তারা ভয় পায়। তারা মনে করে, শিক্ষানুশীলনের কোন জায়গা খুঁজে পেলে নিজের সেসব প্রশ্নের সমাধানকল্পে সেখানেই বসে পড়বে, যে জন্যে সে সর্বক্ষণ ব্যাকুল। সুতরাং নীরব-নির্জনতার সন্ধান করতে গিয়ে এক সময় হয়ত বা যেকোন বিধ্বস্ত নগরীর উপর দিয়ে চলে যেতে থাকে আর তার বিধ্বস্ত দেয়াল-প্রাচীর, তার ভাঙ্গাচোরা দ্বার-খিলান, তার অবনত মস্তক মেহরাব, তার বিক্ষিপ্ত ইট-গাঁথুনি আর তার ভয়াবহ নীরবতা তার জন্যে শিক্ষা এবং অন্তর্জ্ঞানের এক বিপুল দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। তার মনের অন্বেষা সাথে সাথেই সেখানে কাঙিক্ষত বিষয়বস্তু খুঁজে পায়। যে প্রশ্নের সমাধান চিন্তায় তার মন-মস্কিষ্ক বহু ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়েও সমাধান খুঁজে পায়নি, স্থান ও পরিবেশের প্রভাবে তার মনের প্রশ্ন আবার দাগ কাটে, দোদুল্যমান অনিশ্চয়তার জ্বালা আর অস্থিরতার কাঁটা আবার সজীব হয়ে উঠে আর তখন অস্বীকৃতি ও হটকারিতার দম্ভের সাথে নয়, বরং একান্ত অন্বেষা এবং আপাদমস্তক আবেগ ও আকাঙক্ষার মূর্তি হয়ে চিৎকার করে উঠে ঃ أَنّٰى يُحْيِى هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا । তা কি করে হবে যে, আল্লাহ্ একে পুনরায় জীবিত করে দেবেন!

যদিও প্রশ্নটা একই রকম, যা মক্কার দাম্ভিকেরা এবং তায়েফের উগ্রপন্থী কৃতঘ্নরা করেছিল এবং যার প্রত্যুত্তরে কোরআন তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছিল, কিন্তু এখানে প্রশ্নকারীর অভ্যন্তরীণ চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে তাদের প্রশ্নের হোতা ছিল তাদের দম্ভ, আর এখানে নম্রতা আর অসহায়তা। সেখানে বিবাদ-বিতর্কের মত্ততা, আর এখানে রয়েছে প্রশ্নের জ্বালা এবং অস্থিরতার কাঁটা। সেখানে ছিল প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দেয়ার বিকট উগ্রতা, আর এখানে আছে ব্যথা এবং ক্ষতের উপশম স্পৃহা। অর্থাৎ, সেটা ছিল মিথ্যারোপ আর এটা হল প্রশ্ন। সেটা ছিল অস্বীকৃতি আর এটা হল সন্দেহ। আর এ দুয়ের পার্থক্য আকাশ পাতালের।

সুতরাং এর সাথে সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যবহার করা হয়। এর সন্দেহ অপনোদনের জন্য বিষয়ের যাবতীয় যবনিকা সরিয়ে দেয়া হয় এবং এমন এক

www.pathagar.com

পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যাতে তার দেহ-মন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আলোয় ভরপুর হয়ে চিৎকার করে উঠে— নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

তারপর তৃতীয় ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অবতীর্ণ হন। তিনি বলেন ঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে একটিবার তা দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করবে? প্রশ্ন হল, তা হলে কি এ বিষয়ে তোমার ঈমান ও বিশ্বাস নেই? তিনি বলেন, ঈমান কেন থাকবে না! ঈমান-বিশ্বাস অবশ্যই আছে। তোমার জ্ঞান আর তোমার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তুমি সব কিছুই করতে পার। কিন্তু ইয়া পরওয়ারদেগার! আমি যে ঈমান এবং বিশ্বাসের চেয়েও বেশী কিছু চাই। আমার অন্বেষা যে আরও অনন্ত জ্ঞানের। আমি অন্তর্দৃষ্টির আলোর সাগরে ডুবে যেতে চাই। আমি চাই আমার বুক বিশ্বাস ও শান্তির সূর্যের অনাদি-অনন্ত উদয়াচলে পরিণত হোক। আমি জ্ঞানের আলোকে যা কিছু অনুভব করি তাকে চোখেও যেন দেখতে পাই। তার পরিচয়ে যেন সম্পূর্ণভাবে ডুবে যেতে পারি। তার রঙ্গে যেন সম্পূর্ণ রঙ্গে উঠি। বলে উঠেন— لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ (আমার অন্তরের পরিপূর্ণ সান্ত্বনার জন্যে)।

এ অবস্থাটা উল্লিখিত দুটি অবস্থা থেকেই স্বতন্ত্র। এখানে না আছে দাম্ভিকতা ও অস্বীকৃতি, না সন্দেহ-সংশয়। বরং এটা হল অধিকতর প্রত্যয়ের একান্ত অন্বেষা। সুতরাং এক্ষেত্রে আল্লাহর আচরণও তেমনি। তিনি হযরত ইব্রাহীমের অন্তরাত্মাকে শান্তি ও বিশ্বাসের নূরে ভরপুর করে দেন আর তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে যাবতীয় যবনিকা সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করে দেন।

আলোচ্য তিন ব্যক্তি তিন দলের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর আলো এই তিন দলের প্রতি তিন রকম আচরণ করে। এক দল দাম্ভিকদের। আল্লাহর নূর তাদের দৃষ্টিকে শুধু ধাঁধিয়েই দেয়, ঈমান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করে না। দ্বিতীয় দল হল সন্দিহান ও অস্থির চিত্তদের। আল্লাহর আলো তাদেরকে স্থিরতা ও শান্তি দান করে। আর তৃতীয় দল হল অধিকতর প্রত্যয়ান্বেষীদের। আল্লাহ তাদের হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেন।

এটা আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়মের বর্ণনা। কল্যাণ ও অকল্যাণ, হেদায়াত ও ভ্রষ্টতার সেই নিয়ম-রীতি, যা সব সময় ছিল এবং সব সময়েই থাকবে। আর হুবহু এই অবস্থাই কোরআন মজীদে মনোনিবেশকারীর সামনেও উপস্থিত হয়।

www.pathagar.com

কেউ যদি কোরআনের ব্যাপারে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চায়, আর স্থির করে নেয় যে, তার দলিল-প্রমাণ দ্বারা অন্যের সাথে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হবে এবং তার উপদেশাবলীর সাথে বিরোধ করবে, তবে আল্লাহ্ সে লোকের জন্যে কোরআনের হেদায়াতের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দেন। পক্ষান্তরে যে লোক সন্দেহের জ্বালায় অস্থির হয়ে কামনা করছে, কোরআন যেন তার সন্দেহ দূর করে দিয়ে তার পথ প্রদর্শন করে এবং ধীরে ধীরে তাকে বিশ্বাস ও অন্তর্জ্ঞানের লক্ষ্যে পৌছে দেয়। তার প্রতি তেমনি আচরণ করা হয় যা তার জন্য উপযোগী। তিনি তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

কোরআন মজীদ এবং ওহীর বাহক হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক অবস্থাই এ সত্যের ব্যাখ্যার জন্যে যথেষ্ট। নবুয়তপ্রাপ্তির সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কি ছিল? পথভ্রষ্ট উদভ্রান্ত এক পৃথিবী, যার চারদিকে ছেয়ে ছিল আঁধার আর আঁধার— তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন একটু আলোর জন্যে। এমন এক আলো, যাতে গোটা দুনিয়ার সামনে মুক্তি এবং হেদায়াতের রুদ্ধ সব পথ উন্মুক্ত হবে। যা হৃদয়-মনের সমস্ত দৃষ্টিকে আলোকিত করে দেবে। যা সন্দেহের সমস্ত অন্ধকারকে মুছে দেবে এবং এ বিশ্বের সে জটিল রহস্যের সমাধান করে দেবে যার উপর সহস্র যবনিকা পড়ে আছে। অভ্যন্তরীণ জ্বালা আর মানসিক তাকে আপাদমস্তক ব্যথায় পরিণত করে দিয়েছিল। তিনি আপাদমস্তক অন্বেষা, অনুসন্ধান আর আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনার প্রতিমূর্তি হয়ে লোকালয়ের প্রতি বিষণ্ন-বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। এক মরুপ্রান্তরে এক পাহাড় গহ্বরে ধ্যানমগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সামনের যবনিকা অপসারণের জন্যে। অপেক্ষা করছিলেন সত্যোদ্ঘাটনের জন্যে। অন্বেষা আর অনুসন্ধান-প্রচেষ্টার এই নিষ্ঠা, আগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষার এই একাগ্রতা, চিন্তা-গবেষণার এই নিরবচ্ছিন্নতা এবং গুহাবাসের পরেই এসেছিল 'ইকরা'-এর পয়গাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ধ্যানমগ্ন বান্দাকে তুলে নিলেন আর তার উপর নিজ অনুগ্রহের প্রকাশ এভাবে করলেন। বললেন—

وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى (আমি তোমাকে সত্যান্বেষণে নিষ্ঠাবান পেয়েছি। কাজেই তোমাকে দান করেছি হেদায়াত)।

সুতরাং কোরআন শিক্ষার্থীদের শুরু ও শেষ উভয়টাই নির্ভর করে জ্ঞানান্বেষা এবং নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশের উপর। অনির্ভরতা, দম্ভ, বিবাদ ও বিতর্কের

www.pathagar.com

মাধ্যমে এ পথের একটি সোপানও অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কোরআনের দিকে মানুষকে শুধু সত্যের অন্বেষণ করার উদ্দেশে এগিয়ে যেতে হবে এবং সত্যের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত কোরআনের গবেষণায় নিয়োজিত থাকতে হবে। চালিয়ে যেতে হবে চিন্তা-ভাবনার জেহাদ। সন্দেহ যতই কঠিন হোক, জটিলতা যতই প্রবল হোক, এক মুহূর্তের জন্যেও নিরাশ হবে না। যে লোক নিষ্কলুষ ইচ্ছা নিয়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করছে এবং সত্য, ন্যায় ও হেদায়াতের পথে সংগ্রাম করে চলছে, তার পক্ষে সফলতা অনিবার্য। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(যারা আমার পথে চেষ্টা চালিয়ে যাবে আমি তাদের জন্যে আমার পথ অবশ্যই মুক্ত করে দেব।) তার শান্তি-সান্ত্বনার জন্যে মহান পরওয়ারদেগার কঠিনকে সহজ বরং অসম্ভবকে সম্ভব করে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে সে হেদায়াতের উপাদান লাভ করবে, যার কল্পনাও সে করেনি।

- يَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষ যদি কোরআনের উপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করে, তাতে অনড় থাকে, তাহলে সে সেই মহা নেয়ামতও প্রাপ্ত হয়, যাকে আমরা 'জ্ঞানের বিকাশ' বলে অভিহিত করেছি এবং যার জন্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) বিপুল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। সুতরাং কোরআনের বিকাশ ও পূর্ণতার পর আল্লাহ তাআলা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন— اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (আমি কি তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেইনি?)

এ প্রসঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তথ্য সূরা মুজাদালায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্ তাআলা দুটি দলের উল্লেখ করেছেন। এক দলের অবস্থা হল এই যে, যখন ধর্মীয় কোন ব্যাপারে তাদের সামনে কোন জটিলতা, কোন সন্দেহ অথবা কোন বাধা উপস্থিত হয়, তখন তারা আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে এবং রসূলের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করে। 'মুজাদালাহ' শব্দটি আরবী। এর অর্থ হল ঝগড়া করা। তবে জেদ ধরা এবং একগুঁয়েমি অর্থেও শব্দটির ব্যবহার হয়, যা মূলত প্রেম, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যে দল আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে আপত্তি কিংবা সমালোচনা করে না অথবা কোরআন-হাদীস নিয়ে উপহাস করে না, বরং নিজেদের সন্দেহ বা দ্বিধা-সংশয় একান্ত প্রেম ও ভক্তি সহকারে উত্থাপন করে এবং তার সমাধান কামনা করে। দ্বিতীয় দলের

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য হল বিরোধিতা করা। অর্থাৎ, তাদের প্রকৃত বাসনাই হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করা। তাঁদের যেকোন কথার বিরূপ সমালোচনা করা এবং নানা রকম সন্দেহ উত্থাপন করা।

প্রথমোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হল একজন মহিলা। সে কোন একটি বিশেষ ধর্মীয় ব্যাপারে কঠিন সংশয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিজ সংশয়ের জন্যে ধর্মের প্রতি দোষারোপ বা বিরূপ সমালোচনার পরিবর্তে নিজের জটিলতাকে একান্ত বিনয় সহকারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দরবারে উপস্থাপন করে। আল্লাহ তার সবিনয় নিবেদন শোনেন এবং তার জটিলতার সমাধান করে দেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ সে মহিলার কথা শুনেছেন, যে নিজের স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে 'ঝগড়া' করছিল, আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করছিল এবং আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। আর আল্লাহ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।

দ্বিতীয় দলটি হল মুনাফিকদের, যারা সব সময়ই শুধু এই সুযোগের সন্ধানে নিয়োজিত থাকে যে, এমন কোন বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা যাতে কূট প্রশ্ন কিংবা সমালোচনা করা যাবে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَّلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে ঝগড়া করে, তাদেরকে অপদস্থ করে দেয়া হয়েছে। যেমন করে তাদের আগেও এ ধরনের লোকদেরকে অপদস্থ করা হয়েছে। আর আমি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব।

সূরা মুজাদালায় এই দুটি দলের আলোচনা দুটি বিপরীতধর্মী দল হিসেবে করা হয়েছে এবং মানুষকে শিক্ষা দান করাই এর উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যে আচরণ করা হবে, তা হবে একান্তই সবিনয় নিবেদন ও প্রার্থনার আকারে। তর্ক কিংবা যুক্তির বলে নয়। সুতরাং আল্লাহর দ্বীন কিংবা তাঁর কিতাবের

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করতে গিয়েও যদি কোন জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে তার সমাধানের একমাত্র পথ হল, যাবতীয় সমস্যা এবং জটিলতা আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করা। তাঁর কাছেই সমাধান এবং সান্ত্বনার আশা করা। পক্ষান্তরে সহসাই এই জটিলতা বা কূট প্রশ্নের অথবা সমালোচনার উপকরণ তৈরী করে নতুন মতবাদ দাঁড় করাতে চেষ্টা করবে না। কিংবা একে কাটছাঁট করে নিজের চাহিদা অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করবে না। যারা এমন করে তাদের জন্যে কোরআনী জ্ঞান লাভের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে অথবা সমালোচনা করতে করতে তা থেকে এতই দূরে সরে পড়বে যে, পরে আর সে দিকে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। অথবা কোরআনের ছাঁটকাটের ব্যাপারে এমনই সিদ্ধহস্ত হয়ে দাঁড়াবে যে, ক্রমান্বয়ে কোরআনের প্রতিটি কথাকেই নিজের ইচ্ছানুরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে শুরু করবে। ফলে তাদের অবস্থাও তেমনি হয়ে দাঁড়াবে যেমন হয়েছিল ইহুদীদের। তারা আল্লাহর সমস্ত গ্রন্থরাজিকে নিজেদেরই কামনা-বাসনার সংকলনে পরিণত করে ছেড়েছিল।

তাকওয়া ও আমল ঃ

কোরআনে হাকীমের জ্ঞান ও গবেষণার জন্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে, তাকওয়া বা পরহেযগারী। সূরা বাকারার প্রথম আয়াতেই এরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ـ

অর্থাৎ, এটা একটা আসমানী কিতাব বা গ্রন্থ, এ বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ নেই। পরহেযগারদের জন্যে হেদায়াতস্বরূপ নাযিল হয়েছে।

সূরা লোকমানে এরশাদ হচ্ছে ঃ

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ـ

অর্থাৎ, এটি প্রাজ্ঞ এই গ্রন্থের আয়াত যা হেদায়াত ও রহমত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে সততাসম্পন্নদের জন্যে।

এ ধরনের আরও বহু আয়াত কোরআনে রয়েছে এবং একজন জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর মনে সব সময়ই একথা উদয় হয় যে, কোরআনকে সৎ ও পরহেযগারদের হেদায়াতের জন্যে কেন নির্ধারিত করা হল? যে কেউ কোরআন

www.pathagar.com

পড়বে, কোরআনের মাধ্যমে তারই হেদায়াত হওয়া উচিত– সে মুত্তাকী -পরহেযগার হোক আর নাই হোক, ভাগ্যবান হোক অথবা ভাগ্যহীন হোক, সৎ হোক কিংবা অসৎ। কিন্তু কোরআন এ ব্যাপারে দৃঢ়মত যে, তার দরজা শুধুমাত্র তাদের জন্যেই খোলা হবে যারা পরহেযগার ও সততার গুণাবলীতে ভূষিত। কিন্তু এমন কেন হবে? এ বিষয়টি আমাদের মুফাস্‌সিরগণের মনেও উদয় হয়েছে এবং তাঁরা এর একটা সমাধানও খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়টির একটা বিশেষ দিক রয়েছে, যার প্রতি কেউ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেননি। পক্ষান্তরে যথার্থ সত্য ততক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে না, যতক্ষণ না এ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝা যাবে।

কোরআন মজীদের ব্যাপারে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, এটি মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের সর্বশেষ সোপান। আল্লাহ মানুষকে ধাপে ধাপে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। হেদায়াতের পহেলা ধাপ হল স্বভাব ও প্রকৃতির-হেদায়াত। যার উল্লেখ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا এবং وَ الَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى প্রভৃতি আয়াতে করা হয়েছে। এ হল চোখ, কান, মন-মস্তিষ্কের পথ প্রদর্শন এবং অনুভূতি, উপলব্ধি ও জ্ঞান-বুদ্ধির হেদায়াত। এই হল প্রকৃতির সেই সাধারণ কাম্য যাতে সমস্ত আদম সন্তান সমভাবে অংশীদার। বরং এর এক অংশের কল্যাণ এতই ব্যাপক যে, জীবজন্তু পর্যন্ত তা থেকে বঞ্চিত নয়। আর এটা সে হেদায়াতেরই ফলশ্রুতি যে, মুরগীর বাচ্চারা দানা কুড়িয়ে খায় এবং হাঁসের বাচ্চারা ডিম থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই পানিতে সাঁতার কাটতে শুরু করে দেয়। বিড়াল ছানারা চোখ ফোটার আগেই জানতে পারে, তাদের খাবারের উৎসমূল কিংবা প্রতিপালনের উপকরণ কোথায় রয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুই সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু তারা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের একটা মর্যাদা লাভ করেছে। অর্থাৎ, জ্ঞান-বুদ্ধি, উপলব্ধি-অনুভূতি ও বিচার-বিবেচনার বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। সুতরাং তার প্রকৃতিগত হেদায়াত শুধু এখানেই সীমিত থাকেনি যে, শুধুমাত্র অনাহারেই সন্তুষ্ট থাকে বরং সেগুলোর মাধ্যমে সে নিজের কাজে একটা সুষ্ঠুতা ও ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে নেয়। অংশ থেকে সমষ্টি তৈরী করে, ভাল-মন্দতে পার্থক্য করে। ইচ্ছা ও অধিকারের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত বিচার ক্ষমতার মাধ্যমে অকল্যাণকে পরিহার করে কল্যাণ গ্রহণ করে।

এ পর্যায়ের পরেই হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়, যা আম্বিয়া ও রসূল (সঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে। এ পর্যায়ে মানুষ যা কিছু

www.pathagar.com

লাভ করেছে, তার সবই সেই প্রারম্ভিক মূলনীতির উপর নির্ভরশীল, যদ্দ্বারা তারা হেদায়াতের প্রাথমিক পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে সফল হয়েছে। যেভাবে আমরা কয়েকটি মাত্র বীজ দ্বারা গোটা শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র রচনা করি কিংবা কয়েকটি মাত্র বীজ রোপণ করে সবুজ বাগান প্রস্তুত করে ফেলি, তেমনিভাবে প্রকৃতির চাষকৃত কয়েকটি দানাকেও আল্লাহর করুণা বারির প্রতিপালন, প্রকৃতির পরিচর্যা এবং নবী ও রসূলগণের প্রচেষ্টা একটি সুশোভিত কাননে পরিণত করে দিয়েছে এবং তার নামকরণ করেছে শরীয়ত।

কিন্তু প্রকৃতির সেই সাধারণ রীতি অনুযায়ী— যা তার যাবতীয় কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য, এ কাজও ক্রমান্বয়ে পরিণতি লাভ করেছে। সহসাই পরিণতি লাভ করেনি। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক নবী আগমন করেছেন। তাঁরা প্রকৃতির ভূমিকে চাষের উপযোগী করে গঠন করেছেন। তারপর অন্য আরেক দল এসেছেন, যাঁরা সে জমিতে চারা রোপণ করেছেন। তারপর আরেক দলের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা সেই চারার উপর ভিত গড়ে তুলেছেন। অতঃপর আরও এসেছেন, যাঁরা সেই ভিত্তির উপর দেয়াল স্থাপন করেছেন। তারপর আল্লাহ তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন, যাঁরা সেই দেয়ালের উপর ছাদ ঢালাই করেছেন। আর এভাবে গোটা ইমারতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এক কোণায় সর্বশেষ ইটের জায়গাটি শূন্য থেকে যায় আর শেষ পর্যন্ত সে সময়ও আসে, যাতে সে ইটটিও যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। এবং ঘোষণা করা হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ, আজকের দিনে আমি তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যে আমার সমস্ত নেয়ামত পরিপূর্ণ করেছি। আর ইসলামকে ধর্ম হিসেবে তোমাদের জন্যে পছন্দ করেছি।

এই ইমারত বা সৌধের নামই হল 'ইসলাম'। আর আমাদের হাতে এর পরিপূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট বা নীল নক্‌শাই হল কোরআন। এই কোরআন যখন প্রথমাবস্থায় পৃথিবীতে আসে, তখন নিম্নোক্ত তিনটি সম্প্রদায়কে সরাসরি সম্বোধন করে।

১। আরব—যাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক বা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এদের মধ্যেই কেউ কেউ দ্বীনে ইবরাহীমীর স্বভাবসিদ্ধ সরলতায়ও বিশ্বাসী ছিল।

www.pathagar.com

২। ইহুদী—যারা নিজেদের ক্রমাগত অমঙ্গলকামিতা এবং ঔদ্ধত্যের দরুন সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। শুধু ক্ষুদ্র একটি দল তাদের মাঝে সত্যে বিশ্বাসী ছিল।

৩। খৃস্টান—পূর্বপুরুষদের বিপথগামিতা এদেরকেও গোমরাহ করে দিয়েছিল। সামান্য কিছু লোকই শুধু সঠিকভাবে ঈসা (আঃ)-এর ধর্মের উপর বদ্ধমূল ছিল।

এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন সর্বপ্রথম আরবদেরকে সম্বোধন করেছে। আরবদের সাধারণ নৈতিক জীবনে কতিপয় প্রাকৃতিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের অবশেষ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এরা ছিল মূর্তি পূজার এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে লালিত। যাতে তাদের মন ও মস্তিষ্কের কাঠামো এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে, কোরআন মজীদের যে শিক্ষা আপাদমস্তক স্বাভাবিক সরলতার যাবতীয় গুণ-মাধুর্যে সুশোভিত ছিল, তাও তাতে যথেষ্ট আয়াসে ঢুকতে পারেনি। সুতরাং তাদের একটা বিরাট অংশ দীর্ঘ দিন কোরআনের শিক্ষা থেকে শুধু অজ্ঞই থাকেনি, বরং তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। অবশ্য যারা আগে থেকেই দ্বীনে ইব্রাহীমীর স্বাভাবিক সরলতার উপর স্থির বিশ্বাসী এবং মূর্তি উপাসনায় নিরুৎসাহী ছিল, তাদের পক্ষে কোরআনকে গ্রহণ করতে কোন কষ্টই হয়নি। কোরআনের আমন্ত্রণ শুনে তাদের কাছে মনে হয়েছে যেন তারা নিজেদেরই অবচেতন মনে দীর্ঘ দিনের লালিত বাণীর প্রতিধ্বনি শুনছে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তারা এগিয়ে গিয়ে তাকে বরণ করে নিয়েছে। তাদের জন্যে না কোন মু'জেযা বা অলৌকিকতা প্রদর্শনের প্রয়োজন পড়েছে, না বারবার কোরআনের বাণী তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়েছে। এরা ছিল তৃষ্ণার্ত। সেজন্যে যখনই তাদের সামনে পানি তুলে ধরা হয়েছে, সাথে সাথে সেদিকে ধাবিত হয়েছে। তাদের দৃষ্টি ছিল হেদায়াতের সন্ধানে মুক্ত প্রসারিত। আর যাদের দৃষ্টি খোলা থাকে, তাদের কাছে আলোর চাইতে বেশী প্রিয় কোন কিছুই থাকে না। সুতরাং আয়না যেমন আলোতে চমকে উঠে, তেমনি করে তারাও আলোর ছোঁয়ায় জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। কোরআন মজীদ সূরা 'নূরে' এই সত্যকে এভাবে বিবৃত করেছে যে, প্রকৃতি এবং ওহী— উভয়টি একই শ্রেণীভুক্ত বিষয়। এই উভয়টিই মানুষ একই উৎসমূল থেকে প্রাপ্ত হয়। সঠিক প্রকৃতির উদাহরণ স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন তেলের মত। তা যেকোন রকম সংমিশ্রণ বা ভেজাল থেকে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

মুক্ত। আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তা জ্বলে ওঠার জন্যে তৈরি থাকে। কাজেই ওহী ও ইলহামের স্ফুলিঙ্গ যেই মাত্র তাকে স্পর্শ করে, সংগে সংগে জ্বলে উঠে।

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ

অর্থাৎ, তার তেল জ্বলে উঠলই বলে, আগুন তাকে স্পর্শ নাই বা করুক। আলোর পরে আলো রয়েছে। আল্লাহ্ নিজের আলোর প্রতি যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন।

ওপরে আমরা যে আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করেছি, তাতে 'মুহ্সিনীন' এবং 'মুত্তাকীন' শব্দের দ্বারা এমন সব লোককেই বুঝানো হয়েছে। ইহ্সান বা পরোপকার-এর অর্থ একটা হল সাধারণভাবে যা বোঝা যায়। এছাড়া আরও একটা অর্থ আছে। তাহল— নিজের কথা ও কাজকে সম্পূর্ণ সততা, নিঃস্বার্থতা, পূর্ণ সাহস ও দৃঢ়তা এবং নিপুণতার সাথে সমাধা করা। আভিধানিকরা শব্দটির এই নিগূঢ়তার প্রতিও ইংগিত করেছেন। তাছাড়া হাদীসেও 'ইহ্সান' সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে এবং কোরআন মজীদেও উল্লিখিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যারা প্রকৃতি ও ওহীর আলোকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। যারা প্রতিকূলতার মুখে একে নিভে যেতে দেয়নি। এমন সব লোকের প্রশংসা করে কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, এদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। আল্লাহ্ তাদের আমলকে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেন না। কোরআন মজীদ তাদের জন্যে হেদায়াত এবং রহমতস্বরূপ। এরা একে বুঝে, এর পর্যালোচনা করে এবং এর শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়।

তারপর থাকে দ্বিতীয় দল। তারা নিজেদের প্রকৃতি প্রদত্ত স্বাভাবিক যোগ্যতাসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ফলে তাদের জন্যে কোরআনের শিক্ষাসমূহ ছিল একান্ত নতুন। তারা কোনক্রমেই একে বুঝতে পারছিল না। এসব শিক্ষা যে মৌলিক নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল, সেসব নীতিমালা তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে মুছে গিয়েছিল। আর সে স্থানটি পূরণ করেছিল কতিপয় অস্বাভাবিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার। তাদের স্বভাব কাঠামো এমনই বাঁকা হয়ে গিয়েছিল যে, কোন সোজা বিষয় তাতে প্রবেশই করতে পারছিল না। সুতরাং হুযুরে আকরাম (সঃ) যখন তাদের সামনে কোরআন মজীদ উপস্থাপন করলেন, তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল পুরে দিল; তা শুনতে

www.pathagar.com

কিংবা বুঝতে অস্বীকার করল। বস্তুত তাদের এই অস্বীকৃতি ছিল বিগত দিনের বহু অস্বীকৃতিরই পরিণতি। তারা হেদায়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে একে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়ে গেল। ফলে পরবর্তী পর্যায়গুলোরও সঙ্গ দিতে পারেনি। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। কোন একজন শিক্ষার্থী ধাপে ধাপেই শিক্ষার পথে এগিয়ে যায়। কোন একটি বিষয়ের প্রাথমিক নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে যে সবিশেষ জ্ঞান লাভ না করবে কিংবা যথার্থ অনুশীলন না করবে, সে কখনও সে বিষয়টির উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। কাজেই তাদের বেলায়ও একই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। তারা হেদায়াত এবং সুপথপ্রাপ্তির প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই যখন বঞ্চিত রয়ে যায়, তখন হেদায়াতের পরম বাণী অবতীর্ণ হলে তা বুঝা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরআন মজীদের সূরা আ'রাফে বিষয়টির বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ, এই হল সেসব জনপদ, যার ঘটনাবলী আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে তাদের কাছে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে নবী-রসূলগণ অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। কারণ, তারা ইতিপূর্বেও অবিশ্বাস করে এসেছে। এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদের হৃদয়ে মোহর এঁটে দেন।

বস্তুত তাদের এই নতুন অস্বীকৃতি বিগত অস্বীকৃতিসমূহেরই পরিণতি। বিগত নবীগণ তাদেরকে যে শিক্ষা দান করেছেন, তারা সেসবের প্রতিও অনীহা প্রদর্শন করেছে। তারই ফলে বর্তমানের এই শিক্ষাও তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। এ বিষয়টিকেই কোরআন মজীদ নিজের ভাষায় ختم قلب তথা 'হৃদয়ে মোহর আঁটা' বলে আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ, যেসব লোক আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত গ্রহণ করতে পর্যায়ক্রমিকভাবে অনীহা প্রকাশ করে, শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির যাবতীয় যোগ্যতা হারিয়ে বসে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌র শরীয়ত নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্যে। কাজেই তাতে 'ইলম' ও 'আমল' কিংবা 'জানা' ও 'করা' দুটি বিষয় রয়েছে। এতে 'জানা' ঠিক সে বিষয়টিরই নাম যাকে 'কাজে পরিণত

www.pathagar.com

করা' বলা হয়। যদি কেউ কোন একটি বিষয় জানে অথচ তার ওপর আমল করতে পারে না, তখন তার কোন জানাই গ্রহণযোগ্য হয় না। এমন জানা অথবা জ্ঞান নিরর্থক হয়ে পড়ে। সে জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। সে জ্ঞান সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এই জ্ঞানের দ্বারা পরবর্তী কোন জ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না। আমরা শুধুমাত্র আমাদের ভুল ধারণা এবং বিশ্লেষণের অক্ষমতার দরুন মূর্খতাকেও জ্ঞান বলে অভিহিত করেছি।

ইহুদীদের ব্যাপারেও এমনি অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। অধিকাংশ ইহুদী নিজেদের নবীর শিক্ষাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। কোরআনকেও অস্বীকার করল। অথচ তারাই সমকালীন যুগে কোরআনের সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিল। কোরআন মজীদ হচ্ছে হেদায়াতের সর্বশেষ ধাপ— আর এরা সে ধাপ থেকে মাত্র এক ধাপ নীচে ছিল। কোরআন সর্বাগ্রে স্বীকার করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একাত্ম হয়ে সমগ্র বিশ্বে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্যদান করা ছিল তাদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু তারাই সর্বাগ্রে তা অস্বীকার করেছে। আর এই অস্বীকৃতির সর্ববৃহৎ কারণ ছিল এই যে, কোরআন মজীদের পূর্বে যেসব হেদায়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা আগেই তা অস্বীকার করেছিল। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নিয়মানুসারে কোরআনকে স্বীকার করার জন্যে পূর্ববর্তী হেদায়াতসমূহ স্বীকার করে নেয়া ছিল অপরিহার্য।

পদ্ধতিগতভাবে এ কথা ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা অতপর তাঁকে কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন। যখন তিনি এসব পরীক্ষায় যথাযর্থভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ্ বললেনঃ

إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا -

অর্থাৎ, "আমি তোমাকে মানুষের জন্যে নেতা নির্ধারণ করতে যাচ্ছি।"

তিনি প্রশ্ন করলেনঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ অর্থাৎ, আর আমার বংশধর থেকেও কি?

উত্তর এলোঃ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, আমার এ ওয়াদা যালেমদের ব্যাপারে নয়। আমার এ ওয়াদা শুধুমাত্র তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত যারা সতত আমার হেদায়াতের অনুগামী থাকবে, যেকোন অবস্থায় তা কবুল করবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকবে। বস্তুত এরাই আল্লাহ্‌র হেদায়াতের দ্বারা যথাশীঘ্র বিভূষিত হবে এবং জাতির নেতৃত্বলাভে সমর্থ হবে।

www.pathagar.com

হযরত মূসার সামনে এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তিনি আল্লাহ্র কাছে নিজের জাতির জন্যে দোয়া করেছিলেনঃ

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ـ

অর্থাৎ, আমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লেখে দাও; আমরা তোমার প্রতি ধাবিত হয়েছি।.

উত্তরে এরশাদ হচ্ছেঃ

عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমার আযাব তো আমার ইচ্ছানুযায়ী (যারা তার অধিকারী তাদের ওপরই) অবতীর্ণ করি, আর আমার রহমত সবকিছুতে সাধারণভাবে বর্ষিত হয়। সুতরাং আমি তা লেখে দেব তাদেরই জন্যে যারা সততা বা পরহেযগারীতে অনড় থাকবে।

"পরহেযগারীতে অনড় থাকবে" অর্থ হল এই যে, আজ যে প্রতিশ্রুতির বিনিময় হচ্ছে যে, তাতে তারা অটল-অনড় থাকবে; তা লংঘন করবে না, তার সঠিকতায় কোন রকম আঘাত হানবে না। এসব লোকই ভবিষ্যতে আল্লাহ্র রহমতের অধিকারী হবে। অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্ তাআলার সর্বশেষ শরীয়ত; যা এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ রহমত হিসেবে আসবে, তখন তারা তা গ্রহণ করে নেবে; তাকে অস্বীকার করবে না। যারা এই ওয়াদায় অনড় থাকবে না, তারা আগামীতে যেসব রহমত নাযিল হবে, তা থেকেও বঞ্চিত থাকবে। কারণ, তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়বে এবং তাদের কৃতঘ্নতার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেবেন। অতএব, যখন কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয় এবং যখন যে সূরাটি নাযিল হয়, যাতে পরিপূর্ণভাবে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছিল, অর্থাৎ সূরা বাকারা, তখন তার সর্বপ্রথম আয়াতেই বলা হয়;- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (এ গ্রন্থ মুত্তাকী বা পরহেযগারদের জন্যেই শুধু হেদায়াত হিসেবে নাযিল হয়েছে।) অর্থাৎ, একে শুধুমাত্র তারাই গ্রহণ করবে যারা পরহেযগার, যারা নিজেদের ওয়াদা পূরণ করেছে, যারা আল্লাহ্র নেয়ামতের যথাযোগ্য মূল্য দিয়েছে, যারা নিজেদের নবীর শিক্ষাকে স্মরণ রেখেছে। পক্ষান্তরে যারা এসব বিষয় অস্বীকার করেছে, তারা প্রকারান্তরে এই কোরআনকেও

www.pathagar.com

অস্বীকার করেছে। কারণ তাদের কৃতঘ্নতার ফলে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। বলা হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা আর ভীতি প্রদর্শন না করা উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ও তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।–(সূরা বাকারা)

যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা বা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে, যারা আল্লাহ্ কর্তৃক স্থাপিত সম্পর্কের ওপর কাঁচি চালিয়েছে, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র ন্যায়নীতির শত্রু, তারা কস্মিনকালেও কোরআনের হেদায়াত গ্রহণ করবে না। বরং তারা এর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্তির পরিবর্তে নিজেদের পথভ্রষ্টতা এবং দুষ্কৃতিতে আরও বেশী এগিয়ে যাবে। আর তাতে করে তাদের দুর্ভাগ্যের ওপরে বিশেষ মোহরটিও এঁটেই থাকবে। সুতরাং এরশাদ হয়েছে ঃ

يُضِلُّ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ط وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ - الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ -

অর্থাৎ, এর দ্বারা আল্লাহ্ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে হেদায়াত দান করেন। পক্ষান্তরে এর দ্বারা সেসব লোককে ছাড়া অন্য কাউকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করেন না, যারা কৃতঘ্ন বা নাফরমান, যারা আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং যে বিষয়কে আল্লাহ্ একত্রিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে কলহ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। বস্তুত তারাই হল অকৃতকার্য।–(সূরা বাকারা)

তাছাড়া এমনি হওয়াও উচিত। আল্লাহ্র হেদায়াত একটি নেয়ামত। এ নেয়ামত তাদেরই প্রাপ্য যারা তার যথার্থ মূল্য দেবে এবং তা থেকে উপকৃত

www.pathagar.com

হতে সচেষ্ট হবে। যে লোক নেয়ামতের অমর্যাদা করে, সে কস্মিনকালেও নেয়ামত পাওয়ার যোগ্য নয়। সুপথপ্রাপ্তি এবং পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে সব সময় এই নীতিই অটল, অনড়। যারা নেয়ামতসমূহকে হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে তাদের জন্যে নেয়ামত বর্ধিত হয়েছে। প্রকারান্তরে যারা এর অমর্যাদা করেছে তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্ তাঁর এ নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করে দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে সে মোতাবেক আচরণ করা হয়েছে।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর—তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে অবহিত করে দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তা হলে তোমাদের জন্যে নেয়ামতকে বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা কৃতঘ্নতা প্রদর্শন কর, তা হলে আমার আযাব অত্যন্ত কঠোর। -(সূরা ইবরাহীম)

কাজেই বনী ইসরাঈলরা যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের প্রতি মর্যাদা দান করেনি, সেহেতু তারা কোরআনের নেয়ামতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকারীও সাব্যস্ত হতে পারেনি। তাছাড়া যেমন বলা হয়, যেব্যক্তি এক পয়সার ব্যাপারে চোর সাব্যস্ত হয়, তাকে লক্ষ টাকার দায়িত্ব দেয়া যায় না, তাই তারাও কোরআনের মহা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যখন তাতে সত্যবাদী এবং আমানতদার প্রমাণিত হয়নি, তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর নিজের সম্পূর্ণ গ্রন্থের দায়িত্ব কিভাবে অর্পণ করতেন?

কাজেই ইহুদীদের একটা বিরাট অংশ, যারা 'তাওরাত' ও যবুরের শিক্ষা পরিহার করে বৈষয়িক কামনা-বাসনা এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছিল, তারা কোরআনের মহান কল্যাণ থেকেও সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। শুধু একটিমাত্র দল তাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ রয়ে গিয়েছিল- এরাই ছিল কোরআনের আগমন প্রতীক্ষায়। এ বাণীর প্রতিধ্বনি তাদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সুতরাং কোরআন যেখানেই ইহুদীদের সাধারণ দুর্ভাগ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে, সেখানেই এই ক্ষুদ্র দলটির ন্যায়নিষ্ঠারও প্রশংসা করেছে।

www.pathagar.com

একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে নাসারা তথা খৃষ্টানদেরও। এ সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ— যারা পূর্ববর্তীদের অনুসরণে পথভ্রষ্ট হয়ে ধর্মের যথার্থ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তারাও কোরআনকে বুঝতে পারেনি। তাদের কাছে কোরআনের শিক্ষাগুলো তাদের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী বলে মনে হয়েছে। ফলে তারা তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য যাদের মধ্যে সঠিক শিক্ষার আলো তখনও বিদ্যমান ছিল এবং হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর ইঙ্গিতের নির্দেশনায় সেগুলোর জন্যে অপেক্ষা করছিল, তারা কোরআন প্রাপ্তির সাথে সাথে পরিপূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কোরআন তাদের সে উদ্দীপনার ছবি এভাবে এঁকেছে ঃ

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ - يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ - وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ - وَنَطْمَعُ أَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ -

অর্থাৎ, আর যখন তারা সে বিষয়টি সম্পর্কে শুনতে পেল যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন), তখন তোমরা তাদের চোখগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে থাকবে যে, অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে। কারণ, তারা সত্যকে চিনে নিতে পেরেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আর আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং সে সত্যের প্রতি ঈমান নাইবা আনব কেন? যা আমাদের কাছে এমতাবস্থায় এসে পৌছেছে, যখন আমরা আশান্বিত যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে নেক বান্দাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।— (সূরা মায়েদা)

এ ধরনের সদবিশ্বাসী খৃষ্টানরা কালবিলম্ব না করেই ইসলামের আওতাভুক্ত হয়েছে। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও আমলকে বিকৃত করেনি, বরং একান্ত সতর্ক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শিক্ষার্থীর মত যা কিছু তাদেরকে পড়ানো হয়েছিল, সেগুলো মুখস্থ করে রেখেছিল এবং পরবর্তী পাঠ গ্রহণের জন্যে ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অতএব আল্লাহ্ এদেরকেই 'মুহ্সিনীন' খেতাবে ভূষিত করে অনন্য করেছেনঃ

www.pathagar.com

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থাৎ, অতএব তাদের এ কথার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্ তাদেরকে এমন (জান্নাত) দান করেছেন, যার তলদেশে সতত প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে— তাতে তারা সব সময় অবস্থান করবে। আর মুহ্সিনীনদের জন্যে এই হল প্রতিদান।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে আল্লাহ্ যে বলেছেন, এটা পরহেযগারদের এবং মুহ্সিনীনদের জন্যে পথপ্রদর্শক, তার অর্থ তার চেয়ে আরও কিছুটা ব্যাপক, যা আমরা সাধারণভাবে মনে করে থাকি। এর অর্থ হচ্ছে যে, কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তাআলার এক মহা নেয়ামত। এর জ্ঞান ও গবেষণা তাদেরই ভাগ্যে জোটে, যারা এই নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। আর তাঁর শুকরিয়া হল এই যে, যে উদ্দেশে এটা তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তারা সে উদ্দেশেই এর অনুশীলন করবে। আর এটা দেয়ার উদ্দেশ হল বিশ্বাস ও কর্মক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে এর বাস্তবায়ন। তারা যতই এই নেয়ামতের মর্যাদা দান করতে থাকবে, ততই তার বরকতও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

সে কারণেই সম্পূর্ণ কোরআন মজীদ এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি, বরং অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে হুযুরের উম্মতের মূল্যবোধ এবং কৃতজ্ঞতার পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। যেভাবে একজন শিক্ষার্থী কোন একটি বিষয় ধাপে ধাপে অর্জন করে, তেমনিভাবে উম্মতও পর্যায়ক্রমিকভাবে পৃথক পৃথক পাঠ অনুযায়ী একে শিখবে এবং এর শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করবে। অতএব, কোরআন নাযিলের যে পদ্ধতিটি ছিল, সেটিই মুসলমানরা তার শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। এর প্রতিটি আয়াতের ওপর চিন্তা-ভাবনা করেছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেছে এবং যখন বিশ্বাস ও কার্যক্ষেত্র পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছে, তখন পরবর্তী পর্যায়ের দিকে এগিয়ে গেছে। আল্লামা সুয়ূতী (রঃ)-এর 'এত্কান' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ঃ

وقد قال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها

حتى يعلمون مافيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة۔

অর্থাৎ, আবু আবদুর রহমান সালামী বলেছেন, আমার কাছে সেসব লোক বর্ণনা করেছেন যাঁরা কোরআন মজীদকে তেমনি পড়তেন এবং পড়াতেন- যেমন ওসমান ইবনে আফ্ফান এবং আবদুল্লাহ ইবনে মস্উদ প্রমুখ- যে, তাঁদের নিয়ম ছিল, নবী করীম (সঃ)-এর কাছে দশটি আয়াত পড়ে নিলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আয়াতগুলোর সম্পূর্ণ জ্ঞান ও আমল নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করে না নিতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতের দিকে এগোতেন না। তাঁরা বলেছেন, আমরা কোরআনের শিক্ষা ও অনুশীলন একই সঙ্গে অর্জন করেছি। আর সে কারণেই তাঁরা একেকটি সূরা হেফয করতে (তার যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণসহ) বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

اقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمانى سنين۔

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সূরা বাকারার পর্যালোচনা করতে গিয়ে দীর্ঘ আট বছর কাটিয়েছিলেন।

এতে বুঝা যায়, কোরআন সম্পর্কে সাহাবিগণের পর্যালোচনা আমাদের পর্যালোচনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তাঁরা কোরআনকে শুধুমাত্র শিক্ষামূলকভাবে জেনে নেয়ারই আগ্রহী ছিলেন না, বরং তাঁদের আগ্রহ ছিল তার শিক্ষা বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করার প্রতিই বেশী। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতকে তাঁরা নিজেদের জ্ঞান ও আমলের অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত করতে না পারতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে এগিয়ে যেতেন না। আর এই হল সেই কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব, যা নেয়ামতের বৃদ্ধি ও বরকতের কারণ হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁদের জ্ঞান-দৃষ্টিকে নিজের জ্যোতিতে উজ্জ্বল করে দিয়েছেন এবং একমাত্র এই গ্রন্থের ইলম ও আমলের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সুউচ্চ মর্যাদায় তাঁদেরকে অধিষ্ঠিত করেছেন।

কোরআন গবেষণার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানঃ

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হল সেগুলো ছিল নিয়তের পবিত্রতা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যথার্থতা সম্পর্কিত। নামাযের জন্যে যেমন ওযু এবং নিয়তের পবিত্রতা ও

www.pathagar.com

একাগ্রতা একান্ত অপরিহার্য শর্ত, তেমনিভাবে কোরআন মজীদের গবেষণা ও জ্ঞানলাভের জন্যেও শিক্ষার্থীর মানসিক পবিত্রতা এবং ইচ্ছা ও আগ্রহে পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠার সাথে সেদিকে এগিয়ে যাওয়া অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। এ ছাড়া কোরআনের রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হতে পারে না। এসব শর্ত সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন মজীদও উল্লেখ করেছে। তদুপরি বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতাও তার সত্যতার সমর্থন করছে।

অতঃপর আসে কোরআন মজীদের জ্ঞান ও গবেষণার নিয়ম-পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান-উপকরণের প্রশ্ন। প্রথমত, কোরআনকে কিভাবে পাঠ করতে হবে? কতটুকু পরিমাণ পড়তে হবে? পড়ার সময়ে কোন্ কোন্ ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে? ছন্দকে কেমন করে ধরতে হবে? কেমন করে অর্থের সমাধান করতে হবে? জটিলতার ক্ষেত্রে কিভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে? বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে কেমন করে সংহত করা যাবে এবং সংকুচিত চিন্তাকে কেমন করে বিস্তৃত করতে হবে? অর্থাৎ, এক কথায় কোরআনের জটিলতাসমূহের সমাধানে কেমন করে কোরআনের দ্বারাই উপকৃত হতে হবে? এবং দ্বিতীয়ত, কোরআনের বাইরে কি কি বিষয় এমন আছে, যা কোরআন বুঝায়, গবেষণায় এবং তার জ্ঞানলাভের বেলায় উপকারে আসতে পারে।

এসব প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে ইনশা আল্লাহ্ এসব প্রশ্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হবে। তবে এখানে শুধুমাত্র প্রথম প্রশ্নের একটা অংশ এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেয়া বাঞ্ছনীয়।

কোরআন মজীদের জ্ঞানলাভ এবং তার ওপর গবেষণার জন্যে স্বয়ং কোরআনই প্রকৃত উপকরণ। কাজেই কোরআনের একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে তার যাবতীয় জটিলতার সমাধানকল্পে প্রথমত, কোরআনের নির্দেশনাই অন্বেষণ করা উচিত। এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদের আদর্শও ছিল তাই। বলা হয়েছে ঃ

القران يفسر بعضه بعضا -

অর্থাৎ, খোদ কোরআনের এক অংশই অপর অংশের ব্যাখ্যা করে দেয়। তা ছাড়া কোরআন নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছে كتابا متشابها অর্থাৎ, এর প্রতিটি অংশ অপর অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তদুপরি কোন কোন জায়গায় এ বিষয়েরও ব্যাখ্যা দান করে যে, কোরআন যেভাবে আল্লাহ্র তরফ

www.pathagar.com

থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনিভাবে তার সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের দায়িত্বও তাঁরই ওপর ন্যস্ত। পদ্ধতিগতভাবে যদিও সব যুগেই বিষয়টির প্রতি বিশ্লেষকদের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বিষয়টির সঠিক প্রকৃতি সবিস্তারে মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয়নি। ফলে সাধারণত তফসীরকারগণের কাছে এ পথটি অত্যন্ত বন্ধুর ও জটিল বলে মনে হয়েছে এবং তাতে তারা এমন সব প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, যা কোরআনের জ্ঞান থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়। অথচ কোরআনী জ্ঞানের রহস্য স্বয়ং কোরআনের ভেতরেই রয়ে গেছে। সে নিজেই তার যাবতীয় সংক্ষিপ্ততার বিশ্লেষণ দান করে, সে নিজেই নিজের অর্থ ও ব্যাখ্যা নির্ণয় করে, নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই সবিস্তার বিবরণ দান করে এবং নিজের সূক্ষ্ম, জটিল বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে তাকে অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। বরং কোরআনী অলঙ্কারের এ এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য (এবং নিঃসন্দেহে একমাত্র এই গ্রন্থটিরই এটা একক বৈশিষ্ট্য) যে, সে নিজের মধ্যকার অধিকাংশ জটিল শব্দ এবং সূক্ষ্ম বর্ণনারীতির সমাধানকল্পেও নিজের মধ্যে উপমা-উৎপ্রেক্ষার বিপুল সম্ভার সংরক্ষণ করে রেখেছে। দুঃখের বিষয়, এখানে সেসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না, অন্যথায় আমরা দেখাতে পারতাম, কেমন করে কোরআন মজীদ সাধারণ কথোপকথনের মধ্য থেকে একটা শব্দ চয়ন করে নিয়ে তাকেই সাধারণ ব্যবহারের বহু ঊর্ধ্বে বহু উচ্চতর অর্থে ব্যবহার করেছে এবং নিজের ব্যবহারবিধি কিংবা শব্দের প্রয়োগ পদ্ধতির বৈচিত্র্যের দ্বারা সে শব্দটির জন্যে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, আরবী ভাষা কিংবা ব্যাকরণিক দক্ষতা ছাড়াও কোরআনের একজন সাধারণ শিক্ষার্থী সে শব্দের আদ্যপান্ত এমনভাবে বুঝে ফেলে যে, কোন কিছুই তার বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে না।

একক কোন শব্দ ছাড়াও বর্ণনাভঙ্গি এবং ব্যাকরণিক গঠন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও কোরআনের অবস্থা একই প্রকার। ব্যাকরণবিদরা কোরআনের যেসব বাক্য গঠন সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করেও সেগুলোর কোন সমাধান খুঁজে পাননি, স্বয়ং কোরআন মজীদে সেগুলোর উদাহরণ অনুসন্ধান করলে একাধিক উপমা-উদাহরণ স্বচ্ছন্দেই পাওয়া যাবে এবং অ-গ্রপশ্চাৎ লক্ষ্য করলে এমন প্রমাণ নজিরসহই পাওয়া যাবে যে, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের সন্তুষ্টিকে কোন বিষয়ই আহত করতে পারে না।

www.pathagar.com

থাকল কোরআনের শিক্ষা, তার ঐতিহাসিক ইংগিতসমূহ এবং তার অন্তর্নিহিত পরিভাষাগত ইশারা প্রভৃতি। এসব এমনই বিষয়, যার সম্পর্কে সর্বমহলই القران يفسر بعضه بعضا। অর্থাৎ, কোরআনের এক অংশ অপর অংশের বিশ্লেষণ-এর নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল করেছে, তা শুধু এতটুকু যে, তারা পরিপূর্ণ নিপুণতার সাথে কাজ করেনি। পূর্বপুরুষরা যেটুকু করে রেখে গেছেন পরবর্তীরা তাতেই সন্তুষ্ট রয়েছে। পক্ষান্তরে এতে বিপুল গবেষণার অবকাশ থেকে গেছে। কোরআনের সাক্ষ্যসমূহ এত বিভিন্ন আকারে এবং অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে, তা প্রত্যেকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং যারা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে আগ্রহী, তাদের পক্ষে কোরআনকেই দৃঢ়ভাবে অনুশীলন করা উচিত। তার প্রতিটি দিককে অপর দিকের সাহায্যে সমাধান করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

আমাদের মতে কোরআনের অধ্যয়ন বা পর্যালোচনা করতে গিয়ে কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দানের পদ্ধতি সঠিক নয়। এতে বিভিন্ন রকমের ভয় রয়েছে। আমরা প্রথমে তফসীরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব। আমাদের কাছে যে তফসীর রয়েছে, তা শুধুমাত্র দুই প্রকারের। হয় সেটা কোন বিশেষ মতবাদের বাহক, নয়ত পূর্ববর্তীদের নির্বিচার রেওয়ায়েতের সমষ্টি। পক্ষান্তরে একজন সত্যিকার শিক্ষার্থীর পক্ষে এই উভয় বিষয়ই বাধার সৃষ্টি করতে পারে। কোরআনের কোন শিক্ষার্থী যখন এসবের ধাঁধায় ফেঁসে যায়, তখন তার চেষ্টা ও অনুসন্ধানের গতি স্বাভাবিক গা হারিয়ে ফেলে এবং তা হয়ে দাঁড়ায় অস্বাভাবিক ও মৌলিকতা বিবর্জিত। ফলে এ পথে জড়িয়ে যাওয়ার পরে সে কোরআনের শব্দের মাধ্যমে প্রদর্শিত ব্যাখ্যার পথ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তার অনুসন্ধিৎসা ধীরে ধীরে অন্যান্যের মতবাদ ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কাজেই কোরআন অধ্যয়ন ও গবেষণার সঠিক পথ হচ্ছে, যে কেউ এসব বিষয়ের কোনটিই স্পর্শ করবে না, শুধুমাত্র কোরআনকে একমাত্র লক্ষ্যবিন্দু স্থির করে নেবে; বরং প্রত্যেকটি শব্দ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য স্থির করবে, মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে বারবার সে সম্পর্কে চিন্তা করবে, যে বিষয়টি বোধগম্য হবে তার উদাহরণ-উপমার সন্ধান করবে, অগ্র পশ্চাৎ এবং বিষয়ের পটভূমির সাথে তার সামঞ্জস্য নির্ণয় করবে, বিন্যাস অনুসারে তার স্থান-কাল লক্ষ্য করবে। তারপর এতে নিজের মনে সন্দেহ আরোপ

করবে। তারপর যখন দেখবে যে, বিষয়টি বুঝে এসেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই কিংবা তার কোন দিক দিয়েই কোন ত্রুটি রয়নি, তখন তফসীরসমূহে তার ব্যাখ্যা দেখবে এবং সব সময় বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যেসব দুর্বল রেওয়ায়েতে তফসীর গ্রন্থগুলো ভরে রয়েছে, কখনও সেগুলো গ্রহণ করবে না। ইন্‌শাআল্লাহ্ বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যাবে এবং সে নিজের মনে এমনই আনন্দ অনুভব করবে, যাতে মনের সন্তুষ্টি, বিশ্বাস ও বলিষ্ঠতা, কোরআনের প্রতি মহব্বত ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

কিন্তু মনে করুন, উল্লিখিত যাবতীয় চেষ্টা-যত্নের পর আপনি কোন বিশেষ আয়াত সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, অথচ তফসীরের কিতাবসমূহ পর্যালোচনা করার পর দেখা গেল, বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে কিংবা পূর্ববর্তী মুফাসসেরগণের উক্তি আপনার গৃহীত সিদ্ধান্ত কিংবা অর্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যাচ্ছে; তাতে আপনার এতটুকু সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আপনি কি করবেন? তখন কি বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত কিংবা পূর্ববর্তীদের বক্তব্যসমূহ পরিহার করে আপনার গৃহীত সিদ্ধান্তেই অটল-অবিচল থেকে যাবেন? না, তা নয়— সত্যনিষ্ঠ কোন শিক্ষার্থীর রীতি তা নয়। বরং আপনি সেসব হাদীস ও ব্যাখ্যার আলোকে নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা-বিবেচনা করবেন। এক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি যদি সত্যি সত্যি কোন রকম ভুল করে থাকেন, তা হলে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠবে। কিন্তু ধরা যাক, আপনি এ স্তরটিও অতিক্রম করে নিলেন, কিন্তু আপনার মনে নিজের বিশ্লেষণটিই শুদ্ধ ও নির্ভুল মনে হল— তখন কি করা যাবে? এক্ষেত্রে নিজেই হাদীসের ওপর নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করবেন। তার প্রতিটি দিক সম্পর্কে যাচাই করে দেখবেন, যেকোন কষ্টি পাথরে তার পরীক্ষা করবেন- ইনশাআল্লাহ তাতে যথেষ্ট ফায়দা হবে। তাতে হয়ত আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবে, কিংবা হাদীসের যথার্থ সত্য দিকটি পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠবে। অবশ্য একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এ স্তরটি অত্যন্ত কঠিন। এজন্যে প্রচুর ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন। কোন রকম তাড়াহুড়া কিংবা ধৈর্যহীনতা এ পর্যায়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এমন ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা কর্তব্য। তদুপরি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা উচিত। অতঃপর মন যখন পরিপূর্ণভাবে একটা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে— কোন রকম সংকোচ থাকবে না, তখন সে বিষয়টি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর এ বিষয়ে সামান্যতম পরোয়াও করা উচিত নয় যে, কোন বিষয় এর বিরোধীও রয়ে গেছে!

www.pathagar.com

চিন্তা-গবেষণার এই রীতির একটা বিশেষ উপকারিতা হল এই যে, এতে মানুষ যা কিছু লাভ করে, তা একান্তভাবে তার নিজস্ব চেষ্টার ফসল হিসেবেই লাভ করে। আর এটা মানুষের একটা মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যে, সে নিজের অর্জিত সম্পদকে অধিকতর প্রিয় বিবেচনা করে। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে থাকে তার নিজের মমত্ববোধ। ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণের পক্ষে সে কোন কিছুরই ভ্রুক্ষেপ করে না। যেন প্রকৃত ঈমানী অবস্থা, যা কোরআনের যথার্থ লক্ষ্য চিন্তা-গবেষণার এই রীতির মাঝেই লাভ করা যায়। তদুপরি এতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। তখন সে হোঁচট খেয়ে খেয়ে, নানা রকম জটিলতার মোকাবিলা করে চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ সৈনিকে পরিণত হয় এবং অনুসন্ধান অভিযানে কখনও ভগ্নোৎসাহ কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে না। সে যখন সামনে চলার পথ সম্পর্কে একান্ত অভিজ্ঞ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার একটি পথ করে দেয়া হলে সে নিজেই অন্য পথটি মুক্ত করে নেয়। একটি দরজা না খুললে অপর দরজায় করাঘাত করে। এভাবে ধাপে ধাপে সে প্রতিটি মনযিল অতিক্রম করে সে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, যা নবুয়তের রহস্য ও মারেফাতের আসল প্রকাশস্থল। এখানে পৌঁছে তার জ্ঞান অন্যান্যের জ্ঞানের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক মহিমায় মন্ডিত হয়। অন্যেরা যে বস্তুকে পূজ্য সাব্যস্ত করে তার পূজা অর্চনা করে, সে তাকে মক্ষি-ডানার গুরুত্বও দেবে না। অন্যেরা যে বস্তুকে একান্ত নিকৃষ্ট জ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করে, সে তাকে প্রাণকেন্দ্র বিবেচনা করে আঁকড়ে ধরবে। কারণ, অন্যান্যের কাছে কোন অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু তার কাছে রয়েছে অসংখ্য-অগণিত অভিজ্ঞতার দিশা। সে এই সাগরের সব আশ্চর্য বিষয় সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। অন্যেরা এ পথের নিয়ম-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ।

কোরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে কোরআনের অবতরণকাল, প্রাচীন আরব এবং তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাও নিতান্ত জরুরী বিষয়। কোরআনের অসংখ্য আয়াত আরবের আদি ইতিহাস, তৎকালীন জাতি ও সম্প্রদায়ের অবস্থা এবং যুগ-পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। পক্ষান্তরে এসব ইঙ্গিত এত সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য যে, এর সঠিক ধারণা করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সেসব জাতির ইতিহাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করা যাবে। একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, কোরআনের শিক্ষা বুঝার পক্ষে এসব সংক্ষিপ্ততা ও দুর্বোধ্যতা বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু এসব উক্তি সম্পর্কিত সঠিক ও নির্ভুল ধারণার মাধ্যমে কালামের প্রভাবে এমনই গুরুত্বপূর্ণ পরিবৃদ্ধি ঘটে যে,

www.pathagar.com

তা উপেক্ষা কর যায় না। বরং হয়ত কোরআনের যেসব সূরা শুনে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কালে একজন আরববাসী ব্যাকুল হয়ে পড়ত, তা আমাদের বেলায় শুধু এজন্যেই নিষ্প্রভ প্রমাণিত হয়ে পড়ে যে, আমরা সেগুলোর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থেকে বঞ্চিত।

তারপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একে বর্তমান দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে হবে। কোরআনের অবতরণকালে যেসমস্ত ঘটনা ও অবস্থা সকলেরই জানা ছিল, বর্তমান দুনিয়ার জন্যে তা সম্পূর্ণ অজানা হয়ে গেছে। আর শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি আজ কোন বিষয়ের গ্রহণ-বর্জনের মান এত উর্ধ্বে তুলে দিয়েছে যে, যে পর্যন্ত তৎকালীন পৃথিবীকে তার সমগ্র বৈশিষ্ট্য সহকারে মানুষের সামনে তুলে ধরা না যাবে, সে পর্যন্ত মানুষ তার কোন মূল্যই দেবে না।

এ ছাড়া তৎকালীন ইতিহাসের অসংখ্য বিষয় অবগত হওয়া এজন্যেও কর্তব্য যে, সেগুলো জানা ছাড়া কোরআনের শিক্ষাসমূহের প্রকৃত ও যথার্থ মূল্যায়ন করা যেতে পারে না। যেমন, সে যুগের নাগরিক অবস্থা, তখনকার রাজনৈতিক মানসিকতা, সে সময়কার ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং চারিত্রিক মান প্রভৃতি। তদুপরি কোরআনের অবতরণকালে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের নমুনা, তাদের আচার, অভ্যাস ও রীতিনীতির অবস্থা, তাদের উপাস্য দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্য এবং সমাজজীবন ও রাজনীতিতে সেগুলোর প্রভাব ইত্যাদি।

কোরআন মজীদের ওপর যারা গবেষণা করেন, তাদের চিন্তাধারা যদি সঠিক হয়, তা হলে তাদের মনে সেসব বিষয়ে বিভিন্ন রকম সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কোন একটি তফসীর গ্রন্থও এমন নেই যা এসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে। আরবের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান তা একান্তই বিকৃত। কাজেই কোরআনের গবেষণা ক্ষেত্রে তা থেকে আমাদের কোন সাহায্য লাভ তো দূরের কথা, বরং উল্টা নানা রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সেজন্যে এ ব্যাপারেও সঠিক মত হল এই যে, কোরআনকেই নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করতে হবে এবং ইতিহাসে উল্লিখিত বিষয়ের ওপর কোরআনের আলোকে চিন্তা করে তা শুধু ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে যতটা কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ব্যাপারে ইমাম হামীদুদ্দীন ফারাহী (রহঃ)-এর চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে সূরা "ফীলের'

www.pathagar.com

তফসীরটি পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। তাতে বুঝা যাবে, তাঁর প্রকৃত বিশ্বাস কোরআনের ইঙ্গিত এবং আরবী সাহিত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আর সংশ্লিষ্ট ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি সব সময়ই এই দুটি কষ্টি পাথরে যাচাই করেই গ্রহণ করেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে, এ সম্পর্কে যাচাই করার জন্যে এ দুটি ছাড়া তৃতীয় কোন বিষয়ের দ্বারা কোন রকম সাহায্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

কোরআনের ভাষা এবং তার বর্ণনাভঙ্গির জটিলতা নিরসনের জন্যে তিনটি বিষয় সহায়ক হতে পারে–

(১) অভিধান গ্রন্থ এবং আরবী ভাষার বর্ণনারীতি।

(২) আরবী ব্যাকরণ বা নহু শাস্ত্র।

(৩) আরবী বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্র।

আরবী অভিধান গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সহায়ক হতে পারে 'লিসানুল আরব' অভিধানটি। এটাই সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত আরবী অভিধান। আভিধানিকদের যাবতীয় বিতর্কই এতে একত্রে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোরআন মজীদের শব্দ সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম হল, তার ব্যাখ্যাতা ও বিশ্লেষকবৃন্দের মতামত উদ্ধৃত করে দেয়া, কিন্তু তা একান্তই ভুল পথ। তা থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় অভিধান পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

কেউ কেউ আরবী অভিধানের মধ্যে 'মুফ্‌রাদাতে ইমাম রাগেব'-কে প্রাধান্য দেন। কোরআনিক অভিধান হিসেবে অবশ্য এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু জটিলতার সমাধান ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব খুবই অল্প। শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এর নিয়ম-পদ্ধতিগুলো যদিও নির্ভুল, কিন্তু এতে না আছে সব শব্দের ব্যাখ্যা, না আরবী ভাষাতত্ত্ব থেকে এতে যথার্থ প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা হয়েছে। কাজেই এটি উন্নততর গবেষণার ক্ষেত্রে তেমন উপকারী নয়।

প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে যেসব বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয়, তা হল একটি শব্দের সঠিক সীমা-পরিসীমা, এটি নির্ভেজাল আরবী শব্দ নাকি অন্য কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থসমূহের কোনটির জন্য এর প্রয়োগ মুখ্য আর কোনটির জন্য রূপক, এসব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভ। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় কোন অভিধানের মাধ্যমে জানতে পারা যথেষ্ট কঠিন। এদিক দিয়ে কোন

www.pathagar.com

অভিধানই যথেষ্ট কার্যকর নয়। 'সিহাহে জাওহারী' নামক অভিধানটির কোথাও এসবের সামান্য ঝলক দেখা গেলেও তা খুবই অল্প।

এ পর্যায়েও সর্বাধিক মূল্যবান বিষয় হল আরবী ভাষাতত্ত্ব। এতেই শব্দের আসল প্রকৃতি প্রকাশ পেতে পারে। তদুপরি বাচনভঙ্গির ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণভাবেই এর সাথে সম্পৃক্ত। বাচনা ভঙ্গির ব্যাপারে আরবী অভিধান ধরতে গেলে এতটুকুও সহায়তা করতে পারে না। কিন্তু আরবী ভাষাতত্ত্বে প্রকৃত ও রূপক দু'ধরনের অর্থেরই আলোচনা বিধৃত হয়। দীর্ঘ সময় অনুশীলনের মাধ্যমে (সঠিক আগ্রহ থাকলে) মানুষ প্রকৃত ও রূপকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং এই পার্থক্যকরণ অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে অনেক সময় মানুষ শব্দের একান্ত অপ্রচলিত অর্থ তুলে নিয়ে প্রচলিত অর্থ বর্জন করে বসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আসল-নকলের পার্থক্য করতে না পারার দরুন কেউ কেউ تمنى শব্দের অর্থ নিয়েছে পাঠ বা তেলাওয়াত করা কিংবা نحر শব্দের অর্থ বুকের ওপর হাত বাঁধা। এমন উদাহরণ তফসীর গ্রন্থে প্রচুর দেখা যায়।

ইমাম মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী সেজন্যেই সম্পূর্ণভাবে আরবী ভাষাতত্ত্বের ওপর নির্ভর করতেন। তিনি যে শব্দ কিংবা কথন-রীতি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তেন, সে শব্দটি শুধুমাত্র কোরআন মজীদ এবং আরবী ভাষাতত্ত্বেই অনুসন্ধান করেছেন। কোন কোন শব্দ এবং কথন-রীতির সন্ধানে তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-আসালীব' এবং 'মুফরাদাত'-এ এ সম্পর্কিত সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। غثاء احوى (গুসাআন্ আহ্ওয়া) শব্দটিতে 'গুসাআন্' সম্পর্কে মাওলানা স্বয়ং বলেছেন যে, আমি সঠিক তত্ত্বের গবেষণায় বছরাধিক সময় অতিবাহিত করেছি। এ শব্দটি সম্পর্কে সমস্ত তফসীরকার এবং আভিধানিকের সাথে তাঁর মতবিরোধ ছিল। কাজেই এ শব্দটির যথার্থ ব্যাখ্যা ও তত্ত্বানুসন্ধানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি আরবী ভাষাতত্ত্বের বিপুল ভাণ্ডারের পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, যেদিন আমার গবেষণা শেষ হয়েছে, সেদিন আমার যে আনন্দ লাভ হয়েছিল, তা (হয়ত) রাজা-মহারাজাদের দেশ বিজয়েও হয় না।

ব্যাকরণ গ্রন্থরাজির ব্যাপার কিন্তু অভিধান অপেক্ষাও নৈরাশ্যজনক। ব্যাকরণবিদ্‌রা কোরআনের ব্যাকরণিক জটিলতাগুলোকে সাধরণতঃ প্রচলিত নীতিমালার বাইরে বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। অথচ কোরআন

www.pathagar.com

আরবী ভাষার সর্বাধিক প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আবির্ভূত হয়েছে। তফসীর-কারদের মধ্যে আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) ব্যতীত অন্য কেউই কোরআনের ব্যাকরণিক জটিলতা সম্পর্কে তেমন একটা আলোচনা করেননি। পক্ষান্তরে এ কাজটি যেহেতু একা এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না, ফলে কোরআন মজীদের ব্যাকরণিক জটিলতার সমাধানের জন্যে আমাদের সামনে কোন মূল্যবান দিশা নেই। তাছাড়া যেহেতু নিজেদের মাঝেও অধিকতর বিশ্লেষণ-গবেষণার সৎসাহস নেই, কাজেই ব্যাকরণবিদরা যেসব মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলোর ওপর নির্ভর করতে এবং কোন না কোনভাবে কোরআনকে সেসব মূলনীতির আলোকেই প্রমাণ করতে বাধ্য হই। অথচ এর কারণে কোরআনের ব্যাখ্যায় অসংখ্য সমাধানের অযোগ্য জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই কোরআন শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যাকরণিক জটিলতার ক্ষেত্রে আরবী ভাষাতত্ত্বের ওপর নির্ভর করা কর্তব্য। যাতে করে একদিকে সঠিক ব্যাখ্যার পথ উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং অপর দিকে গোটা পৃথিবীর সামনে এ সত্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআনের বাকরীতিই উত্তম ও সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। ইমাম হামীদুদ্দীন ফারাহী রচিত এ পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর গবেষণা পদ্ধতির বেশ কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও— যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাঁর সে প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যাবে, সেগুলোর সাহায্যে এক্ষেত্রে অনেক জটিল সমস্যা সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

অতপর অলঙ্কার শাস্ত্রের দুর্জ্ঞেয়তার অবস্থা ততোধিক নৈরাশ্যজনক। আরবী অলঙ্কারবিদদের যাবতীয় বিষয়ের উৎসমূল হল প্রাচীন কবিদের কাব্যসম্ভার। পক্ষান্তরে কাব্যিক পরিসরের সংকীর্ণতা সম্পর্কে প্রায় সকলেই মোটামুটি অবগত। সেগুলো বাক্যালঙ্কারের একান্তই প্রাথমিক পর্যায় এবং তা বাহ্যিক বিষয়েরই উৎস হতে পারে। সে জন্যেই সেগুলোর বিবরণ সম্পূর্ণভাবেই ছন্দের উত্থান-পতনের সূক্ষ্মতা, শব্দ চয়নের দোষ-গুণ এবং প্রকাশভঙ্গির জৌলুস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে। অথচ সুষ্ঠু ও যথার্থ মর্ম উদঘাটনের কি কি দিক রয়েছে, অর্থগত সামঞ্জস্য বিধানের কত যে ভঙ্গি উদাহরণ কিংবা গল্প-কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের কত যে রূপ, বাক্য যে কতভাবে বর্ণিত হতে পারে, কতভাবে যে আপন কেন্দ্রবিন্দুর গভীরতার দিকে মোড় নিতে পারে; আনন্দ- উচ্ছ্বাস প্রকাশের কত যে রীতি, বক্তা কিভাবে তার বক্তব্যের দৃঢ়তা ব্যক্ত করে, ভদ্রজনোচিত অনীহার কত যে কায়দা, একজন সদয় শিক্ষক কি কি পদ্ধতিতে আক্ষেপ

www.pathagar.com

করতে পারেন, ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে সহৃদয়তার আমেজ কিভাবে ব্যক্ত করতে হয় এবং সম্বোধনের বৈচিত্র্য যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এসব বিষয় সম্পর্কে ধরতে গেলে আমাদের গোটা অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পূর্ণ শূন্য। এসব বিষয় হয় আরব কথাশিল্পীদের অভিভাষণে, না হয় কোরআন মজীদেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আরবী কথাশিল্পীদের সেসব শিল্পকর্ম মানুষের হাতে পৌঁছেনি, আর কোরআনকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে হযরত বাকেল্লানী (রঃ)-এর প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে কাব্যকর্মকেই উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি প্রথমত আরব কথা-শিল্পীদের বক্তব্যের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্যই করেননি, আর করে থাকলেও শুধুমাত্র তাদের কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেই চলে গেছেন। ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এবং ইবনে-কাইয়্যেম (রঃ)-এর রচনাবলীতে অবশ্য বহু অমূল্য সম্ভার পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রচুর অনুসন্ধান এবং যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন। ইমাম ফারাহী রচিত 'জামহিরাতুল বালাগাত্' নামক গ্রন্থটি এ পর্যায়ের সর্বশেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি এ শাস্ত্রের নীতিমালা উদ্ভাবন করেছেন, যা কোরআনিক অলঙ্কারের যাচাইয়ের জন্যে যথার্থ মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

কোরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ ঃ

কোরআনের জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে পূর্ববর্তী গ্রন্থরাজির (আসমানী) প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যদিও শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং ধর্ম সম্পর্কিত তত্ত্বাবলী মানার ব্যাপারে আমরা পূর্ববর্তী গ্রন্থরাজির মুখাপেক্ষী নই– সূর্যালোকে পথ দেখাবার জন্যে তারকারাজির সাহায্য যদিও নিষ্প্রয়োজন, তাই মুসলমানরা কোরআন আগমনের পর বিকৃত গ্রন্থসমূহের প্রতি আগ্রহী হয়নি। তথাপি কোন কোন জরুরী বিষয় এমনও আছে, যার জন্যে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা যথেষ্ট উপকারী হয়ে থাকে।

একথা যদিও সবারই জানা যে, কোরআন আসমানী গ্রন্থসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের পয়গম্বর (সাঃ) নবী পরম্পরার বিশেষ ব্যক্তিত্ব, তথাপি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনায় বিভিন্ন রকম ফায়দা হতে পারে। এতে আমাদের সামনে কোরআনের প্রকৃত মাহাত্ম্য অধিকতর স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হবে, কোরআনের বহুবিধ ইঙ্গিত-ইশারা আবরণ মুক্ত হয়ে উঠবে এবং আহ্‌লে কিতাবদিগকে স্বীকার

www.pathagar.com

করাবার জন্যে বহু যুক্তি-প্রমাণ সংগৃহীত হবে। আর শেষ বিষয়টি এ যুগের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিপন্ন হয়ে উঠবে। কারণ, কোরআনের কোন কোন উদ্ধৃতি সম্পর্কে আহ্‌লে কিতাবদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের যথার্থ ও অকাট্য জওয়াব দেয়া তখনই সম্ভব, যখন 'তাওরাত', 'ইন্‌জীল' এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞসুলভ দৃষ্টি থাকবে।

কোরআন মজীদে বর্ণিত সেসব ইশারা-ইঙ্গিতের ব্যাপারটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যা আহলে কিতাবদের সাথে সম্পৃক্ত। কোরআনের ওপর প্রাথমিক পর্যায়ে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে হয় ছিলেন আহ্‌লে কিতাব, যারা নিজেদের ঘরের কথা সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন, না হয় ছিলেন মুসলমান, যারা আহ্‌লে কিতাবদের সাথে সৎসম্পর্কের দরুন তাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস এবং তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। সে কারণেই কোরআন মজীদ আহ্‌লে কিতাবদের বিশ্বাস, তাদের মন-মানসিকতা, তাদের বিকৃতি এবং তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি প্রভৃতি সম্পর্কে এমন সংক্ষেপ ইঙ্গিত দান করেছে, যার সঠিক ধারণা করতে পারা একান্তই কঠিন ব্যাপার। তবে তা তখনই সম্ভব যখন আহ্‌লে কিতাবদের ধর্মীয় পুস্তক এবং তাদের ধর্ম সংক্রান্ত সাহিত্যভাণ্ডার সম্পর্কে পুরোপুরি দখল থাকবে।

অতপর কোরআন মজীদ কোন কোন জায়গায় তাদের গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যাতে বুঝা যায় যে, কোরআন নিজেও চায়, যেন গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনাও করা হয়। যেমন, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ -

অর্থাৎ, আমি যবুর গ্রন্থে উল্লেখান্তে লেখে দিয়েছি যে, পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার সেসব বান্দা যারা সৎকর্মশীল।

অন্য আরেক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই একথা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে লিপিদ্ধ হয়েছে- ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি কোরআনের ইঙ্গিত হচ্ছেঃ

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ -

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আর আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাবে বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীতে দুটি দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে।

বস্তুত পরিপূর্ণ সমালোচনা ও গবেষণামূলকভাবে যদি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা করা যায়, তা হলে কোরআন শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে।

কিন্তু সেসব গ্রন্থের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা কোরআনকেই কষ্টি পাথর সাব্যস্ত করেছেন। যেসব ব্যাপারে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও কোরআনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেবে সেখানে আমরা কোরআনকেই গ্রহণ করব এবং অন্যান্য গ্রন্থকে বর্জন করব। ইমাম হামীদুদ্দীন ফারাহী সেসব গ্রন্থের দ্বারা যেভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং যেভাবে সেগুলোর ভ্রান্তি আর কোরআনের সত্যতা প্রমাণ করেছেন, তা যদিও তাঁর প্রায় সমস্ত রচনায়ই বিধৃত, কিন্তু 'জবীহ' নামক পুস্তিকায় তার বলিষ্ঠতা প্রণিধানযোগ্য। পূর্ববর্তী ওলামাদের মধ্যে আহলে কিতাবদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার অভিজ্ঞতা সরাসরি ছিল বলে বুঝা যায়।

কোরআন শিক্ষার্থীর জন্যে উপকারী কতিপয় বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল। কিন্তু উল্লিখিত এসব বাহ্যিক উপকরণই মুখ্য নয়। অবশ্য যদি এসব বিষয়ের সাথে পূর্বাপর বর্ণিত অন্যান্য বিষয়সমূহের প্রতিও পুরোপুরি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তা হলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার্থীর পথ যথেষ্ট-সুগম হবে এবং এ পথে অধিকতর সফলতা লাভে সমর্থ হবে। এসব পর্যায় অতিক্রম করার পরেও কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে এমন (বদ্ধমূল) ধারণা করে নেয়া সমীচীন নয় যে, এতেই সে কোরআনের সম্যক জ্ঞান অর্জন করে ফেলতে পারবে। বরং এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ তাআলার তৌফিকদানের ওপর নির্ভরশীল। তিনিই পথ প্রশস্ত করে দেন এবং তিনিই যাবতীয় জটিলতার সমাধানের পথে আলোর দিশা দান করেন। সুতরাং কোরআন শিক্ষার্থীর মন-মানস সর্বদা সেদিকেই নমিত রাখা উচিত। যা কিছু লাভ করা যায় সে জন্য কৃতজ্ঞ আর যা লাভ হয়নি তার জন্য আশান্বিত থাকবে। কোন বিষয়েই গর্বিত অথবা নিরাশ হয়ে পড়বে না। তাছাড়া কোরআনকে কখনও ব্যবসা কিংবা যশঃলাভের উপকরণে পরিণত করবে না। বর্তমানকালে যারা এসব পথ অতিক্রম না করেই গবেষণা ও উদ্ভাবনার স্তরে পৌঁছে গেছে, তাদের পক্ষে সত্যিকারভাবে না কোরআনের কোন সঠিক খেদমত করা সম্ভব, না সম্ভব মুলমানদের কোন উপকার সাধন। আল্লাহ্ এহেন লোকদের অনিষ্ট থেকে কোরআনকেও মুক্ত রাখুন এবং মুসলমানদেরকেও বাঁচান; এই প্রার্থনা।

www.pathagar.com

কোরআনের সহজবোধ্যতা

কোরআনের গুণাগুণ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনেরই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। ১. এটা মানুষের জন্যে হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক। ২. একে আল্লাহ্ তাআলা নিতান্ত সহজ করে পরিবেশন করেছেন। ৩. এতে কোন রকম জটিলতা ও ঘোরপ্যাঁচ নেই। ৪. এটি প্রতিটি বিষয়ে সবিস্তার আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ।

কোরআনের উল্লিখিত গুণাগুণের ভিত্তিতে সহজেই বলা যায়,

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের মাঝে যা কিছু বলেছেন তা সবই পরিষ্কারভাবে ও সবিস্তারে বলেছেন, তাতে কোন রকম জটিলতা নেই।

২. কোরআন মানব সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর জন্য সুপথ প্রদর্শক। তাতে কোন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অথবা তা'বীল নিষ্প্রয়োজন।

৩. তার বর্ণনাভঙ্গি এমন সুস্পষ্ট ও খোলামেলা যে, যার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে তাকে বুঝতে গিয়ে কিংবা তার ভাব উপলব্ধি করতে গিয়ে অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হতে হয় না; পাঠক নিজেই উপলব্ধি করতে পারে।

৪. শুধু আরবী ভাষাজ্ঞানই কোরআন বুঝার জন্য যথেষ্ট।

৫. কোরআনের পক্ষে না নবীর বিশ্লেষণমূলক বর্ণনার প্রয়োজন নাইবা প্রয়োজন কোন শানে নুযূল বর্ণনার। আরবী ভাষাজ্ঞান ছাড়া কোরআনের অর্থ বুঝার জন্য বাহ্যিক বিষয়ের সাহায্য নেয়া মূলতঃ তাকে অর্থগতভাবে বিকৃতির গহ্বরে ঠেলে দেয়া কিংবা তার অকাট্যতাকে বিনষ্ট করে কাল্পনিক ও সন্দিগ্ধ করে দেয়ারই নামান্তর।

সংক্ষেপে এ সমস্ত দাবীর মর্ম হল এই যে, কোরআন মজীদের শিক্ষা, তার ভাষা, তার বর্ণনাভঙ্গি ও তার প্রতিটি দিক সম্পূর্ণ প্রকৃষ্ট। সে জন্যেই যাদের উদ্দেশে তার অবতরণ, তাদের পক্ষে একে বুঝার জন্য একমাত্র আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন বাহ্যিক সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না।

উল্লিখিত দাবীসমূহের প্রমাণ হিসেবে সাধারণতঃ যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তা হল–

১. কোরআন মজীদ গোটা মানব জাতির সমস্ত শ্রেণীর জন্যে হেদায়াতের বাণী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। তার দাবী হচ্ছে, যে লোক এতে বিশ্বাস স্থাপন

www.pathagar.com

করবে সে মুক্তি পাবে। আর যে এর প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই তার শিক্ষা এবং আমন্ত্রণের মান সাধারণ মানুষের জ্ঞানের মান অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন, যাতে সাধারণ বিবেচনা শক্তির অধিকারী প্রত্যেকটি লোক তাকে বুঝতে পারে এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে স্রষ্টার সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হতে পারে। যে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হবে সাধারণ মানুষের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের শিক্ষা, তাতে এমন কোন শাব্দিক জটিলতা অথবা সংক্ষিপ্ততা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, যা বিশেষ কারও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীত তারা বুঝতে পারবে না কিংবা অর্থের দিক দিয়েও এমন সূক্ষ্মতা থাকা উচিত নয়, যা মানুষের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষমতার দ্বারা তার রহস্য উন্মোচন করা দুষ্কর।

২. কোরআনের দ্বারা যেসব বিষয় সপ্রমাণিত, তাকে একান্ত অকাট্য বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমন সব জিনিসের সাহায্যমুক্ত হতে হবে যার বেশীর ভাগই কল্পনাপ্রসূত। তা না হলে কোরআনের অকাট্যতা বিনষ্ট হয়ে পড়বে।

৩. কোরআন মজীদ তার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তার পাঠ খুবই সহজ, তার বর্ণনাভঙ্গি একান্ত প্রকৃষ্ট এবং তার প্রমাণ পদ্ধতি অত্যন্ত পরিষ্কার। কাজেই তা বুঝার জন্য কোন অনারবের পক্ষে আরবী ভাষা জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন করে না। যেমন, সূরা কামারে বর্ণিত হয়েছে –

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ

অর্থাৎ, আমি কোরআনকে আলোচনার পক্ষে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই কেউ আছে কি স্মরণ করে দিতে? সূরা যুমারে বলা হয়েছে–

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আরবী ভাষায় অবতীর্ণ বক্রতাহীন কোরআন, যাতে তারা ভয় করে।

এসব প্রমাণের মাঝে বহু বিভ্রান্তিকর বিষয় নিহিত রয়েছে, যা পরবর্তীতে আলোচনা করব। কিন্তু এ সত্য আমাদের প্রথম ধাপেই স্বীকার করে নেয়া উচিত যে, এখন যা কিছু বলা হচ্ছে সেগুলো কোন সাময়িক ভুল কিংবা তাৎক্ষণিক ভ্রান্তির ফল নয়, বরং কোরআনের তফসীর বা বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি সুদীর্ঘ কাল যাবত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত, জনপ্রিয় এবং সমাদৃত হয়ে আসছে, এই ছিল

www.pathagar.com

তারই ফলশ্রুতি যে, একটা যুগ আসবে আর তখন তার ওপর মানুষের মনে নানা রকম সন্দেহ উপস্থিত হবে। আর তাতে করে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছাচারের এমনই এক ফেতনা সৃষ্টি হবে, যা পরবর্তী সমস্ত ফেতনার সীমা অতিক্রম করবে।

তফসীরের বিভিন্ন যুগ ও তার বৈশিষ্ট্য ঃ

এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আমাদের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগটিই হচ্ছে তফসীরে কোরআনের সবচেয়ে মহান যুগ। কারণ, কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও দানের যাবতীয় শর্তাবলী এবং পরিবেশের সুষ্ঠুতা সে যুগেই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। অতপর নবুয়তের আমল শেষ হওয়ার পর ইসলামী শিক্ষার অবনতি, অনারব শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ, আরবী ভাষার বিকৃতির দরুন বিভিন্ন বেদআত বা আধুনিকায়নের ফেতনা-ফাসাদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং যেহেতু ধর্মের প্রকৃত ভিত্তি ছিল কোরআন, কাজেই স্বাভাবিকভাবে সংস্কারপন্থী, বেদআতী বা আধুনিকতাকামীদের বাণ এরই ওপর পড়েছে। এই ফেতনা প্রতিহত করার উদ্দেশে সুন্নতানুসারী ও সত্যান্বেষীরা এই মতবাদ গ্রহণ করেছেন যে, কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রকে সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে যথাসম্ভব শুধুমাত্র হুযুরে আকরাম (সঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবেঈন (রঃ)-গণের বাণী এবং মতের ওপর বিশ্বাস করা হবে, যাতে করে সংস্কারবাদী বা বেদ্আতপন্থীরা আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যার কোন সুযোগ পেতে না পারে।

প্রকৃতপক্ষে একটি ফেতনা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে এটা ছিল একটা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা এবং রোগের একটা সময়োচিত চিকিৎসা। যেসব দল নিজেদের বেদ্আতী মতবাদের সমর্থনে কোরআনকে ব্যবহার করত, তাদের জন্যে সে পথ বন্ধ করে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

এই নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত সর্ববৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হল আল্লামা ইবনে জারীর কৃত তফসীর। এতে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা পূর্ববর্তীদের উদ্ধৃতি হিসেবে বর্ণিত। তাঁর রীতি হচ্ছে, প্রত্যেকটি আয়াতের নীচে পূর্ববর্তীদের সব মতামত কোন রকম আলোচনা-সমালোচনা না করে একত্রিত করে দেয়া। আর তাঁর মতে যে মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য তা সব শেষে উল্লেখ করা। তিনি যথাসম্ভব সে মতকেই অগ্রাধিকার দান করেন, যাতে অন্যান্য মতামতও অন্তর্ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ব্যাকরণে দ্বারাও প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

www.pathagar.com

কিন্তু না তাতে রেওয়ায়েত সম্পর্কে কোন পর্যালোচনা করা হয়েছে, না কোরআন, কোরআনের ইতিহাস কিংবা বিচক্ষণতা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়েছে। সে জন্যে এতে যেসব অতিমূল্যবান রত্ন রয়েছে, সেগুলো অসমর্থিত ও দুর্বল রেওয়ায়েতের স্তূপের নীচে তলিয়ে গেছে। সুতরাং যে পর্যন্ত স্বয়ং কোরআনের আলো আমাদের পথ প্রদর্শন না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর সন্ধান করা দুষ্কর। এসব কারণেই এই মহাগ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হতে হলে যথার্থ সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে এর পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

মাননীয় গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে শুধুমাত্র মতামতসমূহকে একত্রিত করে দিয়েছেন। আলোচনা-সমালোচনার দায়িত্ব জ্ঞানী পাঠকদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। যদি এ দায়িত্বও তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিতেন, তাহলে হয়ত মতামত ও হাদীসের এহেন বিপুল সম্ভার আমাদের হস্তগত হতে পারত না। ইতিমধ্যেই কোথাও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে একথা পড়ে বিস্মিত হয়েছি যে, তাঁর সঞ্চয়ী লেখনী যে বিপুল সম্ভার সংগ্রহ করেছে, যদি তাঁর জীবনের রচনাকালকে সামনে রেখে তার হিসাব করা হয়, তাহলে তার গড় দাঁড়াবে দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা। এমন একটি গতিশীল লেখনী যদি রচনা ও সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আলোচন-পর্যালোচনার জটিলতায় জড়িয়ে পড়ত, তাহলে নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তীদের মতামতের একটি বিপুল অংশ থেকে আমরা বঞ্চিতই রয়ে যেতাম।

তারপরে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় তফসীর হচ্ছে "তফসীরে ইবনে কাসীর"। কিন্তু আসলে এটা 'তফসীরে ইবনে জারীর'-এরই সার-সংক্ষেপ। নতুন ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, হাদীস বিশারদদের রীতি অনুযায়ী এতে বর্ণিত মতামতের ওপর সমালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া কোরআন মজীদের অন্যান্য রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে এতেও কোন প্রকার বাদানুবাদ করা হয়নি। আর শুধুমাত্র এতটুকু পরিবর্ধন তেমন বিশেষ কোন ফায়দার ব্যাপার নয়।

তফসীরের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হল ইমাম রাযী (রঃ) কৃত তফসীর। এই তফসীরটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হয়েছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এ হিসেবে তা একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। কিন্তু এসব দার্শনিক বক্তব্য এর ওপর এমনই ব্যাপ্তি লাভ করেছে এবং ইমাম সাহেব আ'শআরিয়া মতবাদের সমর্থনে এতে কোরআনকে এমন নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেছেন যে, কোরআন বুঝার পক্ষে গ্রন্থটি শুধু যে অনুপকারী প্রতিপন্ন হয়ে গেছে তাই নয়, বরং অত্যন্ত

www.pathagar.com

অপকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কেউ যদি দার্শনিক বিতর্ক এবং আ'শআরিয়া কিংবা মু'তাযেলা মতবাদের বিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী হয় অথবা সে সম্পর্কে জানতে চায় যে, (তৎকালীন) দার্শনিকরা কোরআন কিভাবে বুঝেছেন, তা হলে তার জন্যে এটাই সবচেয়ে উত্তম গ্রন্থ।

তফসীরের চতুর্থ গ্রন্থ হল আল্লামা যামাখ্শারী (রঃ) প্রণীত 'তফসীরে কাশ্শাফ'। এর ধারা উল্লিখিত গ্রন্থরাজি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লামা যামাখ্শরীর লক্ষ্য সধারণতঃ কোরআনের পাঠ ও বাকপদ্ধতি। তিনি প্রথমত ভাষা, এ'রাব (স্বরচিহ্ন) এবং বাক্যের পারস্পরিক সামঞ্জস্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতপর সতর্কতার সাথে বিভিন্ন রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য খুবই মূল্যবান, তিনি সাধারণতঃ ভাষা, অভিধান বা এ'রাব (স্বরচিহ্ন)-এর ক্ষেত্রে সঠিক মতবাদ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে ইমাম রাযী নিজেও তাঁর যোগ্যতা স্বীকার করেন। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিরোধ সত্ত্বেও ইমাম রাযী তাঁর ব্যাকরণিক ও আভিধানিক গবেষণাকে প্রায়ই স্বীয় গ্রন্থে নির্দ্বিধায় কোন রদবদল ব্যতীত উদ্ধৃত করেছেন। এসব দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষার্থীর জন্য এ গ্রন্থটি ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত। কিন্তু ইমাম রাযী যেমন আ'শআরিয়া মতবাদের প্রবক্তা, তেমনিভাবে আল্লামা যামাখ্শারীও মু'তাযেলা মতবাদের মুখপাত্র। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কালামের সাথে এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অবিচার যে, মানুষ এর অনুসরণের পরিবর্তে একে নিজেদের কোন বিশেষ মতাদর্শের পেছনে চালাতে চেষ্টা করে।

এগুলোই তফসীরের মৌলিক গ্রন্থ, যা সাধারণতঃ জ্ঞানী মনীষীদের সামনে রয়েছে। এ ছাড়া এ বিষয়ে অন্যান্য যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে এ কয়টি গ্রন্থ থেকেই সংকলিত। কোন কোন তফসীর সূফীবাদের ধারায়ও রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর প্রমাণ পদ্ধতি কিংবা আলোচনা রীতিতে বিশেষ মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণ অতি প্রবল। কোরআনকে যারা রেওয়ায়েত কিংবা শব্দ ও ভাষার আলোকে বুঝতে চান, তাঁরা এসব গ্রহণ করতে পারেন না। এমন কোন তফসীরও আমার নজরে পড়েনি। কাজেই আমরা সেগুলোর ব্যাপারে সুবিবেচিত মতামত ব্যক্ত করতে পারছি না। অবশ্য সাধারণ পর্যালোচনাকালে কোন কোন সূফী মনীষীবৃন্দের যেসব মত সামনে এসেছে, তাতে একান্তই নিরাশ হতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ "সারখীল" সূফীচক্রের সাথে সম্পৃক্ত জনৈক বুযুর্গ—

www.pathagar.com

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, তাদের ভীতি প্রদর্শন কর আর না কর উভয়টাই সমান; তারা ঈমান আনবার নয়। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে এবং কানে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা পড়ে গেছে।

–আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যারা আল্লাহ্র বিশ্বাসকে নিজের অন্তরে গোপনে লুকিয়ে রেখেছে, তাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন কর আর নাই কর, দুইই সমান, তারা ঈমান আনবে না। কারণ, তারা আমাকে ছাড়া কোন কিছুরই গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে বিশ্বাস ভরে তার ওপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। এখন আর তাতে অন্য কারও ঢোকার ব্যবস্থা নেই।' সম্ভবতঃ এসব মত যুক্ত করে দেয়া হয়েছে– আল্লাহ্ করুন তাই যেন হয়। কিন্তু একথা সাধারণভাবে জানা আছে, তফসীর সম্পর্কে সূফীবাদের যেসব বর্ণনা বা মত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়, তাতে মতাদর্শের আকর্ষণের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। বরং এগুলোতে বাতেনিয়াত বা অভ্যন্তরিকতার গন্ধ পাওয়া যায়। যে কারণে ভাষা ও অভিধানবিমুখতা অপরিহার্য। যারা এ ধরনের গ্রন্থ পর্যালোচনা করেছেন, তারা হয়ত আমাদের এ মতের বিরোধিতা করতে পারবেন না।

এ ব্যাখার দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রাথমিক যুগের পরে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে প্রথম যে পদক্ষেপটি নেয়া হয়েছে, তাই হয়েছে ভ্রান্ত। যদিও একটা সৎ উদ্দেশ্যই এদিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এর আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, এভাবে একটা ফেতনার দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে অন্য এক ফেতনার দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। বেদআতপন্থী ও ভ্রান্তচারীদের স্বেচ্ছাচার এবং অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে পূর্ববর্তীদের উদ্ধৃতি ও বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু পরে এসব বর্ণনা-উদ্ধৃতির প্রতি নিবিষ্টতা এত বেশী বেড়ে গেছে যে, সেগুলোর যাচাই-বাছাইর বিষয়টিও লুপ্ত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে সত্য ও সঠিক বর্ণনার সাথে রূপক কল্পকাহিনী এবং বিভ্রান্তিকর ইসরাঈলী প্রচারণার একটি বিরাট অংশও সেসব তফসীর গ্রন্থে ঢুকে পড়েছে।

এই যাচাইহীনতার একটা দুখঃজনক পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত বর্ণনা উদ্ধৃতির এমন এক বিপুল স্তূপ একত্রে

www.pathagar.com

সংগৃহীত হয়েছে, যার ফলে কোন একটি আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাতে করে মানুষ শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করে এই জটিলতার সমাধান প্রচেষ্টার পরিবর্তে প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে অধিকতর বর্ণনা ও মতামত উদ্ধৃত করে দিতে পারাকেই কোরআন সংক্রান্ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেছে। অথচ এই মোটা কথাটা সাধারণ বুদ্ধিতেও বুঝা যায় যে, একটি আয়াতের সঠিক বিষয়বস্তু শুধু একটিই হতে পারে। কিন্তু একে তো বর্ণনাসমূহের যথার্থ পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাইর কাজটি খুব সহজ ছিল না। দ্বিতীয়ত সঠিক বর্ণনার দ্বারা যে মতামত সপ্রমাণিত হতে হবে সেগুলোর পূর্বাপর যোগসূত্র এবং শব্দ ও চয়ন পদ্ধতির সাহায্যে কোন একটি মতকে প্রাধান্য দেয়া ছিল তার চাইতেও কঠিন কাজ, কাজেই যা কিছু উদ্ধৃত রয়েছে সেগুলোকে হুবহু নকল করে দেয়ার মধ্যেই সবাই মঙ্গল বিবেচনা করেছেন এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে আলোচনা-সমালোচনা, যাচাই-বাছাইয়ের মাথা ব্যথা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

বলাবাহুল্য, তফসীরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রেওয়ায়েতের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা কোরআনের অকাট্যতা ব্যাহত করারই শামিল। এতে কোরআন মজীদের শব্দাবলীর সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ নির্ভরতা রেওয়ায়েতের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া রেওয়ায়েতও আবার তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত— যার ব্যাপারে পর্যালোচকদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এগুলোতে রেওয়ায়েতের সাধারণ রীতিনীতির খুব কমই পরোয়া করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের প্রবলতার দরুন যখন কোরআনের পবিত্র দরবারে তার্কিক বিতর্ক এবং দার্শনিক বাগবিতন্ডার অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন এই জটিলতা অধিকতর বেড়ে যায়। এ পর্যন্ত তো অনেকটা মঙ্গল ছিল যে, কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারটি রেওয়ায়েত পর্যন্তই সীমিত ছিল; প্রত্যেকটি বিষয়ের ধারাবাহিকতা ভুল হোক কি শুদ্ধ হোক— ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাত, কিন্তু এখন তাঁরাও একই দলে গিয়ে মিশেছেন, যাঁরা উদ্ধৃতি অপেক্ষা যুক্তির প্রতি আকৃষ্ট এবং কোরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতকে নিজের কাঠামোতে ঢেলে সাজাতে উৎসাহী। কোরআনের শব্দাবলীর প্রভাব ইতিপূর্বেই তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণে তাদের পথে রেওয়ায়েতের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া অন্য কোন বাধাই ছিল না। এই প্রতিবন্ধকতাকে ধর্মীয় পবিত্রতা এবং জনপ্রিয়তার দরুন অনেকটা সম্মানিত বলে মনে করা হত। ফলে তা সহসাই বিলুপ্ত করে দেয়া সম্ভব ছিল না। এই জটিল-

www.pathagar.com

তার সমাধান করতে গিয়ে তাঁরা রেওয়ায়েত ও বর্ণনা-উদ্ধৃতির বিপুল সংগ্রহ থেকে যেটা নিজ নিজ প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেছেন ঠিক ততটুকুই তুলে নিয়েছেন। আর বাকীগুলোতে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে প্রতিপক্ষের জন্যে রেখে দিয়েছেন। যেসব আয়াত স্বনির্ধারিত মতবাদের সাথে সুসমঞ্জস বলে মনে হয়েছে সেগুলোকে নিজের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন এবং যেগুলো বাহ্যত কিছুটা বিরোধী বলে মনে হয়েছে সেগুলোকে আয়াতে মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক)-এর তালিকায় তুলে রেখেছেন। এভাবে একই আয়াত কোন এক দলের মতে মুহ্কাম (অকাট্য) এবং অন্য দলের মতে মুতাশাবিহ্ (দ্ব্যর্থবোধক) হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বস্তুত মনসূখ বা রহিতকরণ ধারার ফলে ইতিপূর্বেই কোরআনের একটা বিরাট অংশ উম্মতের জন্য উদ্দেশ্যহীন হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি উল্লিখিত সাম্প্রদায়িক বিভক্তির দরুন আরো একটি বিরাট অংশকে আয়াতে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হল।

এসব মতবিরোধ পরবর্তী পর্যায়ে আরও একটি গোলযোগের জন্ম দিয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত শাব্দিক প্রমাণের যথার্থতা সন্দিগ্ধ হয়ে গেছে। ফলে জনমনে এমন একটা ধারণার উদয় হয়েছে যে, যেহেতু শব্দ ও বাক্যের মূল ভিত্তি সম্পূর্ণত উদ্ধৃতি-নির্ভর এবং উদ্ধৃতি একটি কাল্পনিক বিষয়, কাজেই শাব্দিক কোন প্রমাণ অকাট্য বিবেচিত হতে পারে না। বস্তুত এর ফল দাঁড়ায় এই, যেসব আয়াত তার উদ্দেশে একান্তই প্রকৃষ্ট ছিল, সেগুলোকেও যদি কোন দল নিজেদের গৃহীত মতবাদের বিরোধী মনে করেছে তা হলে আয়াতে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

ইমাম রাযী (রঃ) বলেনঃ

"জানা উচিত, স্থানটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই দাবী করে যে, যেসব আয়াত তাদের মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলোই মুহকাম বা অকাট্য। আর যেগুলো তাদের প্রতিপক্ষের মতবাদের সমর্থক সেগুলো মুতাশাবিহাত বা দ্ব্যর্থবোধক। সুতরাং মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের দাবী হল, فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ আয়াতটি মুহকাম। আর وَمَا تَشَآءُونَ আয়াতটি মুতাশাবিহ্। অথচ আহলে সুন্নতের দাবী এর বিপরীত। কাজেই এজন্যে একটি যথারীতি নীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য।"

(তফসীরে কবীরঃ খন্ড ২, পৃঃ ২৯২)

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের ভাষায় এই নীতিটি হল ঃ

"আমি বলি, যখন কোন একটি শব্দ দ্ব্যর্থবোধক হবে এবং এর একটি অর্থ প্রবল ও অন্য অর্থ দুর্বল হয় আর আমরা যদি দুর্বল অর্থ পরিহার করে সবল অর্থ ব্যবহার করি, তা হলে তা হবে মুহকাম। আর সবল অর্থ পরিহার করে যদি দুর্বল অর্থ প্রয়োগ করি, তা হলে তা হবে মুতাশাবিহ্। আর তখনই আমরা বলব, সবলকে বর্জন করে দুর্বলকে গ্রহণ করতে হলে তার সমর্থক কোন প্রমাণের প্রয়োজন। সে প্রমাণটি শাব্দিকও হতে পারে অথবা যুক্তিভিত্তিকও হতে পারে।

(তফসীরে কবীরঃ খন্ড ২, পৃঃ ৫৯২)

অতঃপর শাব্দিক প্রমাণ সম্পর্কে ইমাম রাযীর অভিমত ঃ

"শাব্দিক প্রমাণ কখনও অকাট্য হতে পারে না। কারণ, প্রত্যেকটি শাব্দিক প্রমাণই আভিধানিক ও ব্যাকরণিক উদ্ধৃতির ওপর নির্ভরশীল। আর এ সমুদয় বিষয়ই কল্পনাপ্রসূত। আর যা কল্পনাপ্রসূত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তা অধিকতর কাল্পনিক। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, শাব্দিক প্রমাণাদি কখনই অকাট্য হতে পারে না।"

শাব্দিক প্রমাণের কাল্পনিকতা এবং তা গ্রহণের অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর শুধু একটা বিষয়ই থেকে যায়। তা হল মানুষের জ্ঞান বা বুদ্ধি। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে জ্ঞান নয়, যা আল্লাহ্ তায়ালা যেকোন মানুষকেই দান করেছেন; বরং সে জ্ঞান যা যৌক্তিক মতামত এবং দার্শনিক বিতর্কে সমর্থ। এটা মেনে নিলে কোরআনের অর্থ চলে যায় তার্কিক বিতর্কবিদদের হাতে। সুতরাং এ সম্পর্কে ইমাম রাযী বলেনঃ

"কোন বিষয় যখন তার জায়গায় অকাট্য ও নিশ্চিত হবে, তখন তার সম্পর্কে কাল্পনিক ও দুর্বল যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কোন মন্তব্য করা জায়েয নয়। যেমন, আল্লাহর কালাম لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ্ কারও উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত চাপ-আরোপ করেননি) আয়াত সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের এমন চাপের সম্মুখীন করেন। আমরা এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিম্নে এর সমর্থনে পাঁচটি অতি দৃঢ় প্রমাণ উদ্ধৃত করছি। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহুর উদ্দেশ্য নয়। ইমাম রাযী এবং অন্যান্য সমস্ত আশায়েরা মতাবলম্বী মুফাস্সেরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাদের সাধ্যাতীত গুরুদায়িত্ব

www.pathagar.com

অর্পণ করেন, যা পালন করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে তিনি দেননি। এ বিষয়টির সমর্থনে তিনি সূরা বাকারার ৬ষ্ঠ আয়াত এবং উল্লিখিত আয়াতের প্রেক্ষিতে কতিপয় যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর তফসীরে যে কোনখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন তার প্রমাণসমূহের বিশ্লেষণ করেছেন। বস্তুত উল্লিখিত আয়াতকে তিনি নিজস্ব মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং প্রতিপক্ষ মু'তাযেলা মতবাদের সমর্থক বলে লক্ষ্য করেছেন। কাজেই এই বিরোধ থেকে বাঁচার জন্যে প্রথমত তিনি এর বাক্যবিন্যাস পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু তাতেও যখন সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তখন নিজের তীক্ষ্ণ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যুক্তির বিশেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করেও যখন পরিপূর্ণ আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেননি, তখন বের করে নিলেন সেই তলোয়ার, যার আঘাতের সামনে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক থাকে না। অর্থাৎ, ঘোষণা করে বসলেন যে, যদিও আয়াতটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সাধ্যাতীত কোন বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন করেন না, কিন্তু যখন একটি দুটি নয়, পাঁচ পাঁচটি যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ সাধ্যাতীত বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন, তখন কোরআনের একটি মাত্র আয়াত— যার প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে শ্রবণ ও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল, সে কেমন করে এহেন (যৌক্তিকতার) সুদৃঢ় দুর্গকে ধ্বংস করতে পারে?

উল্লিখিত বিশ্লেষণের ফলাফল দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

১। প্রাথমিক যুগের পরে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহের ওপর নির্ভর করা হয়। আর এতে এমনই বাড়াবাড়ি করা হয় যে, সত্য-মিথ্যা বা ভাল-মন্দ যেকোন রকম কল্পকাহিনী এবং মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়েতসমূহ তফসীর গ্রন্থসমূহে স্থান পায়। তদুপরি সেসব রেওয়ায়েতের ওপর এত বেশী নির্ভর করা হয়, যাতে কোরআনের বাক্যাবলীর প্রমাণিত বিষয়গুলো পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

২। তর্কশাস্ত্র এবং দর্শনের বাড়াবাড়ি কোরআন মজীদের অকাট্যতাকে আরও সন্দিগ্ধ করে ফেলেছে। কারণ, তার্কিকদের তথাকথিত যৌক্তিক-প্রমাণাদির মোকাবিলায় স্বয়ং কোরআনের বাক্যাবলীর প্রমাণগুলো সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ফলে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা সেসব প্রমাণপঞ্জির মধ্যে সীমিত হয়ে গেছে, যা ছিল আমাদের তর্কবিদদের একান্তই মস্তিষ্ক প্রসূত।

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া ঃ

যাঁরা সেসব তফসীরের সাহায্যে কোরআন বুঝার চেষ্টা করেছেন, উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর কারণে তাঁদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হতে হয়েছে এবং সময়ের গতিবিধির সাথে সাথে এই নৈরাশ্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি আজ আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন যে, এক দল সর্বশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে রেওয়ায়েত ও হাদীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। তাদের দাবী হচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোরআনকে তার বাক্যাবলীর মাধ্যমেই বুঝে নিতেন। এজন্য তাঁদের যেমন কোন রেওয়ায়েতের প্রয়োজন হয়নি, তেমনি তাঁরা তর্কবিদদের যুক্তিরও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অথচ বর্তমানে কোরআন বুঝা এবং বুঝানোর জন্যে ইবনে জারীর, ইমাম রাযী, কাজী বয়যাবী এবং ইমাম সুয়ূতী প্রমুখের গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হবে কেন?

অতপর পাশ্চাত্যানুরাগীরা এসব ধারণাকে অধিকতর রং লাগিয়ে ফলাও করেছে। এরা কোরআন মজীদ কিংবা ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে কথিত-বর্ণিত যেসব বিষয় জেনেছে, সেগুলো তাদের রুচি ও যুক্তির সাথে পুরোপুরিভাবে খাপ খায়নি। আর যা তারা জানতে পারেনি, সেগুলো না জানার গ্লানি স্বীকার করতেও রাজি হতে পারেনি। ফলে সম্পূর্ণভাবে হাদীস ও রেওয়ায়েতের যথার্থতাকেই অনেকে অস্বীকার করে বসেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, রেওয়ায়েতের অস্তিত্বও স্বীকার করব না এবং সেগুলো না জানার গ্লানিও মেনে নেব না। তারা দাবী করে যে, কোরআন মজীদ তো একটা অতি সহজ ও সরল গ্রন্থ। এতে প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে আরবদেরকে, যারা একান্তই বর্বর ও বেদুঈন ছিল, শুধু মোটা কথাই তারা বুঝতে পারত। কাজেই এমন জাতিকে এমন একটি গ্রন্থ দান করা— যার নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্য সম্পর্কে বলা হয়, এর বিস্ময়করতা কোন দিনই শেষ হবার নয়; একটা অর্থহীন কথা ছাড়া আর কিছু নয়। তদুপরি এমনটি আল্লাহ্‌র হেকমত বা অভিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কোরআন মজীদ সারা বিশ্ব মানবের জন্য হেদায়াত ও সুপথপ্রাপ্তির সনদ হিসেবে নাযিল হয়েছে। কাজেই তার সহজবোধ্য হওয়া অপরিহার্য। পক্ষান্তরে তা যদি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও নিগূঢ় রহস্যবহুল হয়, তা হলে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ তার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে। সর্বোপরি তাতে করে বান্দাদের ওপর আল্লাহ্‌র প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে তারা কোরআনের সেসব আয়াতকে

www.pathagar.com

প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে, যেগুলো তাদের ধারণা মতে কোরআনের সহজবোধ্যতা প্রকাশ করে। তা ছাড়া হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহকে তারা এই বলে বর্জন করে যে, এগুলো সবই কাল্পনিক বিষয়। যদি কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তফসীরের ভিত্তি এসব কাল্পনিক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে কোরআনের অকাট্যতা বিনষ্ট হয়ে পড়বে। এভাবে নির্বিঘ্নে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কোরআন বুঝার জন্যে আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। এসব ধারণা ও মতামতের প্রেক্ষিতে এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—

কালামের জটিলতা ও সহজবোধ্যতার তিনটি দিকঃ

কোন কালাম বা বাণীকে জটিল কিংবা সহজ বলতে হলে তিনটি দিক বিবেচনা করতে হয়ঃ

১। স্বয়ং বাণী হিসেবে। অর্থাৎ, যদি কোন বাক্যের শব্দসমূহ দুর্বোধ্য হয়, বিন্যাসে জটিলতা থাকে, ব্যাকরণিক নিয়ম এবং পরিভাষা যদি সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি-বিরুদ্ধ হয়, রূপক-উপমিতি যদি দুর্বোধ্য হয় এবং তুলনাগুলো যদি অস্বচ্ছ হয়, তা হলে সে কালাম বা বাণীকে জটিল বলা যাবে। পক্ষান্তরে শব্দ চয়ন, পরিভাষা প্রভৃতি যদি সাধারণ হয়, বাক্যবিন্যাসে কোন রকম জটিলতা না থাকে এবং ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মের প্রতি যদি যথাযথ লক্ষ্য রাখা হয়, তা হলে সে বাণী বা কালামকে সহজ, মার্জিত এবং জটিলতা বর্জিত বলা যাবে। মির্যা গালেবের যে কাব্য বেদিলের রীতিতে বিন্যস্ত, তা যেকোন লোকের পক্ষে কঠিন এবং বিস্বাদ বলে মনে হবে। কিন্তু যে অংশ তাঁর নিজস্ব রীতিতে বিন্যস্ত, সেগুলো সাবলীলতা, অলঙ্কার ও হৃদয়গ্রাহিতার একান্ত বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

২। বিষয়বস্তু হিসেবে। কোন কোন বিষয়বস্তু নিজেই খুব সহজ হয়। যেমন, কিস্‌সা-কাহিনী, গল্প-উপন্যাস এবং আইন প্রভৃতি। আর কিছু বিষয় আছে, যা নিজেই জটিল। যেমন-দর্শন, তর্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, গণিত, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি। প্রথমোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষ চিন্তা-ভাবনা কিংবা বিচার-গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দর্শন গ্রন্থ গল্প-উপন্যাসের মত পাঠ করে বুঝা সম্ভব নয়।

৩। যাকে সম্বোধন করা হবে, তার প্রেক্ষিতে। গালেবের একটা অতি সাধারণ গযলও প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠকের জন্য অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ তাঁর অতি কঠিন কবিতাটিও অতি সহজে বুঝে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে এখন কোরআন মজীদের সহজবোধ্যতা ও সরলতার কথা চিন্তা করুন। কোরআন মজীদ এমন এক বাণী, যার অলঙ্কারের কোন উদাহরণ আরব, আজম তথা গোটা বিশ্বে নেই। এমন বাণী সম্পর্কে প্রথমোক্ত বিষয়ের দিক দিয়ে কোন আলোচনাই আসতে পারে না। কারণ, বাণীর এহেন ত্রুটি বাস্তব অসমর্থতার দরুনই সৃষ্টি হতে পারে। পক্ষান্তরে কোরআন মজীদ যাঁর বাণী, তিনি যাবতীয় ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কাজেই কোরআন মজীদ যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছে, সে যুগের ভাষা অলঙ্কার ও সাহিত্য শৈলীর যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এমনকি সে যাদেরকে উদ্দেশ করে বক্তব্য রেখেছে, তারা পৃথিবীতে বাণী শিল্পের সবচাইতে উত্তম সমালোচক ছিল এবং তার প্রতিটি অক্ষরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একথা স্বীকার করত যে, এটা একান্তই 'জাদু'। কোরআন তাদের কাছে দাবী করেছে যে, তোমরা এর মত একটি মাত্র সূরা উপস্থাপন কর এবং প্রয়োজনবোধে তোমরা সেজন্য যাবতীয় আসমানী ও যমিনী শক্তিগুলোকে সমবেত করে নাও। কিন্তু তাদের কাছে এ দাবীর এ ছাড়া আর কোন উত্তরই ছিল না যে, 'এটা একান্তই জাদু'।

এমন একটি কালাম বা বাণীতে ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা, অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দাবলী ও পরিভাষার ব্যবহার বর্জন, জটিল ও বিভ্রান্তিকর দ্ব্যর্থবোধক শব্দাবলীর ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকা এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়গুলো এমনই প্রাথমিক পর্যায়ভুক্ত, যে ব্যাপারে আদপেই কোন প্রশ্ন ওঠতে পারে না। সুতরাং এ দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে দাবী করা যেতে পারে যে, কোরআন মজীদ একান্তই প্রকৃষ্ট ও সহজ বাণী।

অতপর দ্বিতীয় প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা যেতে পারে- অর্থাৎ, বিষয় নির্বাচন ও বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে। কোরআন মজীদ স্বীয় আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? যাঁরা কোরআন মজীদের বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাঁরা এ প্রশ্নের এ উত্তরই দেবেন যে, এটি উল্লিখিত উভয় শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর সম্পর্কে সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে যে, কোরআন আইন-কানুন ও নির্দেশাবলীর একটা সংগ্রহ। এই বিভ্রান্তিতে যেমনি ভুগছে সাধারণ মানুষ, তেমনি ভুগছেন বহু আলেমও। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাও এ ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে,

www.pathagar.com

এরা হারাম-হালাল নির্দেশক একটা মাপকাঠির উর্ধ্বে 'দ্বীন'কে অন্য কোন কিছু কল্পনাই করতে পারে না। কাজেই ফেকাহ শাস্ত্রের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবার পর অনেকেই কোরআন মজীদের তেলাওয়াতকে শুধুমাত্র বরকতের বিষয় হিসেবে গণ্য করে থাকে। ইলমুল একীন বা সত্য দর্শন সৃষ্টি করা এবং জ্ঞান ও চেতনা বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিতে একে আর তেমন উপকারী বলে বিবেচনা করা হয় না। এসব ধারণা সৃষ্টির এবং বিভ্রান্তির একটা ইতিহাস রয়েছে, যার বিশ্লেষণের স্থান এটা নয়। তথাপি কয়েকটি কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

১। প্রথম কথাটি হল, আমাদের ওলামা সম্প্রদায়ের সাধারণ ভুল ধারণা যে, ধর্মের ব্যাপারে যুক্তির কোন অবকাশ নেই। তাঁদের ধারণা, আমরা যেসব বিষয়ের ওপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করি তা নবী ও রসূলগণ বলে গেছেন বলেই করে থাকি। আর নবী-রসূলগণকে কোন যৌক্তিক প্রমাণের দ্বারা নয়, বরং মু'জেযা বা অলৌকিক কার্যকলাপের দ্বারা চিনতে পারি। ধর্মের ব্যাপারে যদি যুক্তির কোন প্রবেশাধিকার থাকত, তা হলে ওহীর কি প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া গায়েবের ওপর ঈমান আনার সংজ্ঞাই বা দেয়া হবে কেন? সহজ কথা এই যে, যাদের কাছে 'দ্বীন' বা ধর্ম এমনি একটা সহজ ও তুচ্ছ বিষয় বলে গণ্য, তারা কোরআন মজীদকে কতিপয় আদেশ ও নিষেধের নীতিমালার অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতেই পারে না। তা ছাড়া এহেন নীতিমালাকে বুঝার জন্যে নিশ্চয়ই বিশেষ চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন তাদের কাছে নেই। যে কেউ একে পড়ে অতি সহজভাবে বুঝে নিতে পারবে।

২। দ্বিতীয় কারণটি হল, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন। যাঁরা দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেছেন, তাঁরা কোরআন মজীদকে করা ও না করার বিষয়সমূহের একটা বিক্ষিপ্ত সংগ্রহ এবং ওয়াজ-নসীহতের একটি বিশুষ্ক পাণ্ডুলিপির অতিরিক্ত মর্যাদা দেননি। তাঁরা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং প্রকৃতি ও হেদায়াতের পথ থেকে ভ্রষ্ট দর্শনের নিগড়ে জড়িয়ে গেছেন। তাঁরা ধারণা করে নিয়েছেন যে, তৌহীদ ও রেসালাত বিষয়েও দর্শনের মাধ্যমেই দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। ধর্মও আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যর্থ। এই ধারণা তাঁদেরকে কোরআন মজীদ থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যেহেতু গ্রীক চিন্তা-দর্শন দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের মন-মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল, কাজেই তার প্রভাব মানুষের মনের ওপর এমনভাবে ছেয়ে ছিল যে, কারও কাছে

www.pathagar.com

কোরআনের প্রকৃত মাহাত্ম্য কিছুটা বিকশিত হয়ে থাকলেও সে সাধারণ প্রচলিত মতাদর্শের বিরুদ্ধে কিছু বলার মত সাহস করতে পারেনি।

৩। তৃতীয় কারণটি হচ্ছে, তদানীন্তন আরবদের মূর্খতা সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস, যার প্রতি ইতিপূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি। পরিতাপের বিষয়, আরবদের সম্পর্কে আমাদের ওলামা সম্প্রদায় এবং আধুনিক শিক্ষিত সমাজ উভয়েই সমানভাবে একই বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছেন। আলেমদের কাছে তো কোরআনের কোন মাহাত্ম্যই প্রকাশ পায় না, যে পর্যন্ত না তদানীন্তন আরবদেরকে চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করা হয়। আর আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ইসলামের আবির্ভাবকালীন জাহেল ও বন্য আরবদের মধ্যে মেধা-মস্তিষ্কের সামান্যতম যোগ্যতা কিংবা সামর্থ্যের কথা কল্পনাই করতে পারেন না। তাঁদের ধারণা, কোরআন মজীদ শুধুমাত্র কতিপয় নির্দেশ এবং কতিপয় উপদেশ বাণীর সহজ-সরল একটা সংকলন মাত্র। কাজেই কেউ যদি কোন আরবী পত্র-পত্রিকা বা পুস্তক-পুস্তিকার কোন রকমে উল্টা-সিধা তরজমা করতে সমর্থ হয়েই যেতে পারে, তা হলে সে কোরআনের তফসীর প্রণয়নেরও অধিকার লাভ করে ফেলে। অথচ আরবদের সম্পর্কে এহেন ধারণা একান্তই অবাস্তব। যিনি তাদের সাহিত্য সম্পর্কে সামান্যও পর্যালোচনা করেছেন, তিনি এই বাস্তবতা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারেন না যে, মেধা ও মস্তিষ্কের দিক দিয়ে জাহেলিয়াত যুগেও আরবরা তাদের সমকালীন যেকোন জাতি থেকে পিছিয়ে ছিল।

সারকথা, সাধারণ-অসাধারণ সবাই কোরআনকে তার প্রকৃত মান থেকে বহু নিম্নে নামিয়ে দেখেছে। সাধারণ সমাজ মানসিক যাতনা এবং বৈজ্ঞানিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে থাকে এবং ধর্মকে তারা শুধু বিশ্বাস হিসেবে মান্য করে। হালাল-হারাম জানা এবং ধর্মের বাহ্যিক রীতি-নীতি ও করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যই তাদের ধর্মের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর তাদের অতিরিক্ত অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনও থাকে না আর তারা এর চাইতে বেশী কোন কিছু চিন্তাও করতে পারে না। পক্ষান্তরে আলেম সমাজ সাধারণতঃ তদানীন্তন আরবদের প্রতি তাদের কুধারণার ফলে কোরআন মজীদের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন না। তাঁরা কোরআন মজীদকে আইন-কানুন ও নির্দেশাবলীর একটা সংকলন হিসেবে দেখেছেন, যাতে প্রাসঙ্গিকভাবে ওয়াজ-নসীহত আকারে বিগত জাতিসমূহের কিছু কাহিনী এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া কোন

৫—

www.pathagar.com

কোন জায়গায় তৌহীদ, আখেরাত প্রভৃতি সম্পর্কেও স্থূল দলিল-প্রমাণের উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, যা সাধারণ সমাজের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। যারা কোরআনকে মুজেযার ভিত্তিতে স্বীকার করত তাদের জন্য এর অতিরিক্ত কোন কিছুর প্রয়োজন আদৌ ছিল না। কিন্তু যারা এর 'চাইতে বেশী কোন কিছুর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, তারা কোরআনকে পাশ কাটানো গ্রীক দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মজে গেছেন।

কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ঃ

কোরআন সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী খারাপ ধারণার বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। তাই তা দূর করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

সর্বাগ্রে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা দরকার যে, কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কি?

কোরআনে আদম (আঃ) ও শয়তানের কাহিনী বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনী পাঠে জানা যায়, শয়তান যখন আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও অহঙ্কারের দরুন আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করে বসে, তখন আল্লাহ শয়তানকে হুকুম করেন-

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ
مِنَ الصَّاغِرِينَ -

জান্নাত থেকে বেরিয়ে যা। এ বিষয়ে অহঙ্কার করার কোন অধিকারই তোর নেই। বেরিয়ে যা। তুই নিকৃষ্ট অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত।

এতে শয়তান কিছু সময় চাইল এবং ঈর্ষার তোড়ে বললঃ

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ -

যেহেতু তুমি আমাকে গোমরাহ করেছ, আমি তাদেরকে গোমরাহ করার উদ্দেশে সকল পথ আগলে বসব। তারপর আমি তাদের কাছে সামনের দিক দিয়ে, পেছন দিক দিয়ে, ডান ও বাম দিক দিয়ে আসব। আর তখন তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত শয়তান আদমকে বিভ্রান্তিতে ফেলার উদ্দেশে আল্লাহ তাআলার নিকট কিছু সময় চেয়ে নিল এবং তাদেরকে ধোঁকা দিতেও কামিয়াব হয়ে গেল। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের দু'জনকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ এল। অতএব, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি নির্দেশ দিলেন-

اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَّ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ۔

তোমরা বেরিয়ে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়েছ এবং তোমাদের জন্য একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকা ও তা উপভোগ করা নির্ধারিত হয়েছে।

আদম এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য পৃথিবীর এই আশ্রয়টি ছিল অত্যন্ত কঠিন। শয়তানের সঙ্গে তাঁদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, যে কিনা ঈর্ষার জ্বালা ও প্রতিশোধের উন্মাদনায় এমনি মত্ত যে, প্রথম দিনেই চরম পত্র দিয়ে বসে— 'আমি তাদের অগ্র-পশ্চাত সব দিক দিয়ে এসে তাদের পথভ্রষ্ট করব এবং তাদের অধিকাংশকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।' অপর দিকে সে এমনই চতুর ও ধূর্ত যে, একই তুড়িতে আদমের দৃঢ়তার সমস্ত বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমতাবস্থায় রহমতে এলাহীর দায়িত্ব ছিল আদমকে এমন একটা অস্ত্র সরবরাহ করা, যা সেই ধূর্ত শত্রু শয়তানের মোকাবিলা করতে গিয়ে কাজে আসবে এবং তার সন্তান-সন্ততি শয়তানের অবিরাম আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শয়তানের মোকাবিলা করার জন্য সে অস্ত্র সরবরাহ করেছেন এবং নিম্নে বর্ণিত ভাষায় তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন-

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

আমার তরফ থেকে অবশ্য আসবে তোমাদের জন্য হেদায়াত (নবী ও শরীয়ত), যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের জন্যে না কোন ভয়-ডর আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।

এ ওয়াদাই সূরা আ'রাফের ৩৫ তম আয়াতেও করা হয়েছে-

يَا بَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِىْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

হে বনী আদম! যখন তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য কোন নবী

www.pathagar.com

আসেন এবং তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তখন তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। যারা পরহেযগারী অবলম্বন করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে তাদের জন্য চিন্তা ও ভয়ের কোন কারণ নেই।

শয়তানের দ্বারা দুনিয়াতে ভয় এবং আখেরাতে চিন্তার যে সম্ভাবনা আদমের ছিল, আল্লাহ্ এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে তা দূর করে দিয়েছেন।

এখানে এই কাহিনীর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব না। তবে শুধু এতটুকু দেখিয়ে দেয়া হবে যে, কোরআনে হাকীম যে মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছে এবং মানব জাতির বিকাশের যে ইতিহাস বর্ণনা করেছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, মানব চরিত্রে যেখানে অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, সেখানে এমন একটি শূন্যতাও রয়েছে, যার ফলে আল্লাহর তরফ থেকে নবী-রসূলগণের আগমন না ঘটলে তারা শয়তানের ফেতনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারত না; বরং তখন প্রতি পদে পদে তাদের জন্য ভয় ছিল প্রকৃতির নিয়ম থেকে সরে গিয়ে পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার। অতএব, দুনিয়ায় আদম সন্তানদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী-রসূল পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাঁরা পৃথিবীর এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে মানুষকে প্রকৃতি ও প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়েছেন এবং সত্য-সরল পথের দিকে হেদায়াত করেছেন।

যাঁরা কোরআন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাঁরা জানেন, কোরআনের পরিভাষায় শয়তান শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। জিনদের মাঝে যেমন শয়তান রয়েছে, তেমনি মানুষের মাঝেও। যেভাবে এরা মানুষের ক্রিয়াকলাপ বা আমল -আখলাককে বিভ্রান্ত করে তেমনিভাবে এরা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতিও আক্রমণ চালিয়ে তাকে অকেজো করে দেয়। যেমন, সূরা নাস-এর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন—

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

যারা মানুষের মনে ওয়াস্ওয়াসা বা সন্দেহের সৃষ্টি করে জিনও মানুষের মধ্য থেকে।

সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে-

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ -

www.pathagar.com

এরা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে যখন নিজেদের সঙ্গী শয়তানের সাথে মিলিত হয়, বলে ঃ আমরা তোমাদেরই সাথে রয়েছি।

তাদের ধূর্ততা, পথভ্রষ্টতা এবং মানুষকে গোমরাহ করার কলাকৌশল সম্পর্কে পারদর্শিতার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .

সে' এবং তার দল তোমাদেরকে সেখান থেকে লক্ষ্য করে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।

এতে বুঝা যাচ্ছে, এ পৃথিবীতে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি যেকোন রূপ ধরে এবং যেকোন দিক থেকে আসুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা শয়তানের পক্ষ থেকেই আসে। আর জিন ও মানুষের মধ্যে যে দুষ্ট সত্তা সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সরল পথ থেকে ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করে, তাদের সবাই শয়তান। শয়তানের রূপ অসংখ্য এবং তার ফাঁদ অগণিত। মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা জাহেরী ও বাতেনী বা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যত ক্ষমতা দান করেছেন, সে সবগুলোর অবস্থানই তার জানা। সেসব ক'টি দরজা দিয়েই সে ঢুকতে পারে এবং প্রতিটি রাস্তা দিয়ে বেরিয়েও আসতে পারে। সে রক্ত হয়ে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে পারে। আবার কামনা-বাসনা ও আবেগের আকার ধরে উত্তেজিত করে। হৃদয়ে রূপ-লাবণ্য হয়ে প্রলুব্ধ করে। প্রেম হয়ে মনের গভীরে তাড়নার সৃষ্টি করে। আশা ও অনুরাগের মায়ায় উচ্ছ্বসিত করে তোলে। আবার নিরাশার ফাঁদ পেতে ধরাশায়ী করে দেয়। অসংখ্য উপদেশমূলক গল্প-কাহিনী এবং দার্শনিক তত্ত্ব তার সংগ্রহে রয়েছে। কখনও সে একজন তার্কিকের মত যুক্তি উত্থাপন করে, কখনও দার্শনিকের মত বিশ্ব রহস্য ও সৃষ্টিতত্ত্বের শিক্ষা দান করে। আবার কখনও বিজ্ঞ রাজনীতিকের মত রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের বর্ণনা দিতে থাকে। কিন্তু যখন এই সমস্ত উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করেও আদম সন্তানের বিরোধিতা ও শত্রুতার আগুন প্রশমিত হয় না, তখন অনেক সময় নবুয়তের দাবীদার হয়ে নবুয়তী করতে আরম্ভ করে। এহেন ধূর্ত ও চতুর শত্রুর অনিষ্ট থেকে মানবকুলকে রক্ষা করার জন্য মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে যে গ্রন্থ দেয়া হবে, তা যদি শুধুমাত্র কতিপয় নিয়ম-নীতি বা আইন-কানুন কিংবা কিছু সংখ্যক উপদেশাবলীর সরল-সহজ একটি সংকলনে পরিণত হয়, তা হলে লক্ষ্য করে দেখুন, এহেন মামুলি একটা

www.pathagar.com

হাতিয়ার শয়তানের মত ভয়ঙ্কর শত্রুর মোকাবিলায় কতটুকু কাজে লাগতে পারে!

এটা ছিল একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়। আসল কথা হচ্ছে, আদি সেই প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বনী আদমের পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থরাজি নাযিল করেছেন। এমনকি আখেরী নবী (হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও একই উদ্দেশে পাঠিয়েছেন, যাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তাঁর বয়ে আনা আলোর জ্যোতি অনন্তকাল পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকবে। কোরআনে হাকীমে সূরা জুমুআর এক আয়াতে রসূল (সঃ)-এর প্রশংসা প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ

তিনিই (সেই পরওয়ারদেগার) যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই একজনকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত বা বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করেন।

এটা হযরত ইবরাহীমের সে দোয়া কবুল করারই ঘোষণা, যাতে তিনি নিবেদন করেছিলেনঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ـ

ইয়া পরওয়ারদেগার! তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ কর, যিনি তোমার আয়াত পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের তালীম দেবেন এবং তাদের আত্মাকে পবিত্র করে তুলবেন।

এ আয়াতটিতে মহানবী (সঃ)-এর চারটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে-

(১) আয়াত পাঠ।

(২) পবিত্রকরণ।

(৩) কিতাবের তালীমদান এবং

(৪) হেকমত বা অভিজ্ঞানের শিক্ষাদান।

www.pathagar.com

আর কোরআন যেহেতু এই বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়েরই সংকলন, তাই এখানে এগুলোর বিশ্লেষণ করে দেয়া আবশ্যক, যাতে করে কোরআনের নিগূঢ় তাৎপর্য প্রকাশ পায়।

আয়াতের তেলাওয়াত ও পবিত্রতা ঃ

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আয়াতের তেলাওয়াত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো। 'আয়াত' শব্দটি কোরআন মজীদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে উল্লিখিত আয়াতে এ শব্দটি দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কোরআন মজীদের বিশেষ করে সে অংশটিকে নির্দেশ করা যা দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি-সম্বলিত। কোরআন মজীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হল সেই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করা, যাতে বুঝা যায়, কোরআন তার শিক্ষার জন্যে নিজেই প্রমাণ ও যুক্তিপূর্ণ; বাইরের কোন যুক্তি-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

যাঁরা কোরআন মজীদের অবতরণধারা সম্পর্কে অবগত, তাঁরা জানেন, হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে কোরআন মজীদের যে অংশটি নাযিল হয়েছে, সেটি 'দ্বীন'-এর সেই মূলনীতি সংক্রান্ত, যা সমগ্র ধর্মের জন্য ভিত্তিস্বরূপ। যেমন করে একটি দালান বা প্রাসাদ ততক্ষণ পর্যন্ত নির্মিত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তেমনিভাবে কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাও ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মূলনীতিসমূহ যথাযথভাবে মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল না হবে। ইসলামের গোটা ব্যবস্থাও তিনটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তৌহীদ, আখেরাত ও রেসালাত। এই তিনটি বিষয়ের বুনিয়াদ প্রকৃতি, চক্রবাল ও দিঙ্মন্ডলের অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত দলিল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোরআন মজীদও সর্বাগ্রে এসব ভিত্তিকেই মজবুত করেছে। আর এগুলোর প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তার ফলে সেসব ভুল ও বিভ্রান্তিকর চিহ্ন আপনা থেকেই মুছে গেছে যা শিরক অবলম্বন করে আখেরাত ও নবুয়তের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন সৃষ্টি হয়েছিল। কোরআন এ সকল ভিত্তিকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং কি কি প্রমাণপঞ্জির মাধ্যমে মানুষের ভুল আকীদা ও বিশ্বাসসমূহ খন্ডন করেছে, এসব প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

www.pathagar.com

এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, এক্ষেত্রে 'আয়াত' বলতে কোরআনের সে অংশকে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বিষয়ক দলিল-প্রমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রাথমিক পর্যায়ে কোরআনের যে যে অংশ নাযিল হয়েছে তা ফেকাহ শাস্ত্রীয় নির্দেশাবলী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এতে শুধু ধর্মের সেই মৌলিক ও সাংগঠনিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা 'দ্বীন'-এর সমগ্র ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালার গাঁথুনি সদৃশ। লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, যুক্তির দিক দিয়েও তাই হওয়া উচিত। কারণ, কোন শিক্ষাই একটা মৌলিক ভিত্তির অবর্তমানে টিকে থাকতে পারে না। আমরা যখন কোন দালান তৈরী করি, তখন তার ছাদ বা অলিন্দ থেকে কখনও আরম্ভ করি না; বরং সর্বাগ্রে তার ভিত্তিটাকে সুদৃঢ় করে নিই। ধর্মের অবস্থাও তাই। এর সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো কতিপয় মৌলিক নীতিমালার আওতাভুক্ত। কাজেই যে পর্যন্ত সেই নীতিমালা সুদৃঢ় না হবে, সে পর্যন্ত আনুষঙ্গিক বিষয় ও তার শাখা-প্রশাখার উদ্ভব এবং টিকে থাকা অসম্ভব।

আর মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরই হচ্ছে সেই নীতিমালার উৎসমূল। কাজেই প্রকৃতি যদি কাল্পনিকতা ও কুসংস্কারের আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়ে না যায়, তা হলে নবুয়তের প্রথম আলোর পরশেই তা মন-মানসে উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়।

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ -

সত্বর তার তেলে অগ্নিস্পর্শের পূর্বেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠবে।

কিন্তু মানুষের প্রকৃতি যদি দুষ্ট চিন্তা-ভাবনা, বিকৃত কল্পনা এবং মিথ্যা ও শূন্যগর্ভ বিশ্বাসের পঙ্কে অপবিত্র হয়ে যায়, তা হলে তাকে পরিষ্কার করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা যথার্থভাবে পরিষ্কার না হবে, কোন রকম ভাল শিক্ষা গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। যেমন, একজন পেটের রোগীর পক্ষে অতি উত্তম খাবারও হজম করা সম্ভব হয় না। সেজন্যে প্রথমে সে রোগীর রোগ নির্ণয় করে ওষুধ দেয়া প্রয়োজন। তারপর তার পেট যখন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যাবে, তখনই তাকে পুষ্টিকর খাবার দেয়া যেতে পারে। এর আগে যদি পুষ্টিকর খাবার দেয়া হয়, তা হলে তার স্বাস্থ্য কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং কোরআনে হাকীমে সূরা আনয়ামের এক আয়াতে এমনি ধরনের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন লোকদের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে-

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ - كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

www.pathagar.com

আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করতে চান, তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন, সে যেন শূন্যে বিচরণ করেছে। এভাবে আল্লাহ্ তাদের ওপর অপবিত্রতাকে জমিয়ে দেন, যারা ঈমান আনে না।

বস্তুত আয়াতের তেলাওয়াতের পর উল্লিখিত আয়াতে যে পবিত্রতার উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা হচ্ছে আয়াতের তেলাওয়াতেরই ফল। আল্লাহর আয়াতসমূহের তেলাওয়াতে মানুষের মন থেকে যখন মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও কু-বিশ্বাসের মূলগুলো উপড়ে যায়, তখন তার মনোভূমি সুষ্ঠু বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বীজ বপনের জন্যে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং উপযোগী হয়ে ওঠে।

একথা যথাস্থানে সপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ মানুষের প্রকৃতিতে ভাল-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেমন মানুষ সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, সাদা-কালোর প্রভেদ বুঝতে পারে এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ ধরতে পারে, তেমনিভাবে তাদের প্রকৃতির অভ্যন্তরেও একটি আলো রয়েছে, যা সৎ ও অসৎ-এর মাঝে পার্থক্য করার ব্যাপারে তাদেরকে পথ প্রর্দশন করে। সূরা কিয়ামার এক আয়াতে বলা হয়েছে-

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ -

বরং মানুষ নিজের মন সম্পর্কে সচেতন।

অন্য এক স্থানে রয়েছে- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا -

বস্তুত তাকে তার পাপকর্ম ও পরহেযগারী সম্পর্কে ইল্‌হাম করে দেয়া হয়েছে।

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে- إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ -

নিশ্চয়ই আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি।

যাদের এই আলো রিপু ও কামনা-বাসনার অনুসরণ এবং দুনিয়ার মায়া-মোহের দরুন নিভে যায়, তারা আত্মিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মৃতে পরিণত হয়। নবী-রসূলগণ তাঁদের শিক্ষার সুতীব্র আলোকচ্ছটা যত প্রবলভাবেই তাদের ওপর সম্পাত করুন না কেন, তাদের মৃত আত্মায় কোন স্পন্দনই পরিলক্ষিত হয় না। এমনি লোকদের ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে-

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ -

www.pathagar.com

হে নবী, তুমি মৃতদের শোনাতে পারবে না। কালাদেরও তোমার ডাক শোনাতে সক্ষম হবে না যখন তারা পেছন ফিরে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۔

তোমার আমন্ত্রণ কবুল করবে শুধুমাত্র তারাই, যারা শোনে। আর যারা মৃত; আল্লাহ্ই তাদেরকে তুলবেন। অতপর তাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

সূরা বাকারার শুরুতে যেসব লোকের অন্তরে মোহর মারার উল্লেখ করা হয়েছে তারা এমনি ধরনের লোক। কিন্তু যাদের অন্তরে এ আলোর জ্যোতি বিদ্যমান, তা যতই আবছা এবং দুর্বল হোক না কেন, নবিগণ আয়াতের তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাকে উজ্জ্বল করে দেন।

এ ব্যাখ্যার পর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী করীম (সঃ) আমাদের প্রকৃতিগ্রাহ্য পন্থায়ই আমাদের পবিত্রতা সাধন করেছেন। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ভাল ও মন্দ চিনে নেবার যে মৌলিক যোগ্যতা বিদ্যমান, তিনি সর্বাগ্রে সেগুলোকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন এবং তারপর সেগুলোর ওপর নিজের শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন।

কিন্তু পবিত্রতা সাধনের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে, এটি কোন একক ও সহজ কাজ নয়। বরং কয়েকটি অংশে সংযোজিত। এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানব হৃদয়, যা জ্ঞান ও অনুশীলন— এই দুটি বিষয়ে সংগঠিত। এ কারণে পবিত্রতারও দুটি দিক রয়েছে। জ্ঞানের পবিত্রতা ও আমল বা অনুশীলনের পবিত্রতা। এই প্রেক্ষাপটে পবিত্রতা মানুষের সমস্ত আমল এবং যাবতীয় বিশ্বাসের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু মানুষের যাবতীয় আমল বা কর্মের উৎসমূল হচ্ছে আকীদা বা বিশ্বাস, কাজেই পয়গম্বর (সঃ) তাঁর শিক্ষায় সর্বপ্রথম এই আকীদা অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পবিত্রতা সাধন করেন।

জ্ঞানের পবিত্রতা অর্থ হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান যাবতীয় মলিনতা ও আবর্জনা থেকে এমন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে, যাতে করে সে চিন্তা-দর্শনের যাবতীয় ক্ষেত্রে যে কোন স্খলন-পতন থেকে বেঁচে থাকতে পারে। যদি কখনও

www.pathagar.com

রিপু বা শয়তানের প্রতারণায় তাতে কিছু আবর্জনা জমে ওঠে, তখন যাতে সামান্য লক্ষ্যের মাধ্যমেই তা অপসারিত হয়ে যায়। আর আমল বা ধর্মের পবিত্রতার অর্থ জীবনের কোন উত্থান-পতনেই যেন মানুষের কোন পদক্ষেপ রৈপিক কামনা-বাসনার নেতৃত্বে উত্থিত হতে না পারে। বরং প্রত্যেকটি পদক্ষেপই যেন আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী হয় এবং রিপুর দুর্বুদ্ধিতা কিংবা উত্তেজনার দরুন কোন ভ্রান্ত কার্যকলাপ সংঘটিত হয়ে গেলেও যেন অবগতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্ত সেই পদক্ষেপের জন্য অনুতাপ সহকারে তার সংশোধন করে নিতে পারে। সূরা আরাফে এমনি লোকদের প্রশংসায় এরশাদ হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ -

যাদের মনে আল্লাহ্র ভয় রয়েছে, কখনও যদি তাদের ওপর শয়তানের ছোঁয়া লেগে যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং সহসাই তাদের আত্মোপলব্ধি ফিরে আসে।

এবার শুধু ইলম বা জ্ঞানের পবিত্রতার বিষয়টি নিয়েই চিন্তা করা যাক। এর কতগুলো দিক হতে পারে, দেখা যাক। একজন কৃষক, যে ক্ষেতে লাঙ্গল চালায়, সেও চিন্তা-ভাবনা করে আর একজন দার্শনিক, যিনি সৃষ্টি-রহস্যের জটিলতার সমাধান খুঁজে বের করেন, তিনিও চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু এ দু'জনের চিন্তা–ভাবনায় বিপুল পার্থক্য। কৃষকের চিন্তার যেখানে শেষ, দার্শনিকের চিন্তার প্রথম ধাপটিও তার চাইতে বহু বহু গুণ এগিয়ে। আর একজন দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনার যেখান থেকে সূচনা, তা সাধারণ মানুষের যাবতীয় জ্ঞান ও বিদ্যার সপ্তর্ষিমন্ডলের উর্ধ্বে।

তেমনিভাবে তাদের একজনের সন্দেহ-সংশয় হচ্ছে অন্যের অনুকরণজনিত, যাতে সত্য ও বাস্তবতার সাধারণ আঘাত সহ্য করারও শক্তি থাকে না। ফলে অতি সহজেই তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় (অল্পেই তারা সন্দেহমুক্ত হয়ে যেতে পারে)। পক্ষান্তরে অন্য জনের ভ্রষ্টতাসমূহ তার স্বপক্ষে যুক্তি ও দর্শনের বহু দলিল-প্রমাণ এনে উপস্থাপিত করে। সেগুলোকে পরাভূত করার জন্যে অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কাজেই কোরআন যদি গোটা মানব জাতির সমস্ত শ্রেণীর পবিত্রতা সাধনের জন্যে এসে থাকে, তা হলে তার যুক্তি এবং প্রমাণ উভয়টিই সন্তোষজনক হওয়া প্রয়োজন। প্রথম ব্যক্তিকে সে যা দেবে তার

www.pathagar.com

মান যেন কোনক্রমেই তার যোগ্যতা ও বুদ্ধির উর্ধ্বে না হয় এবং তার ভুল -ভ্রান্তির সংশোধনকল্পে এমন সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি-প্রমাণ উত্থাপন করবে, যাতে সেগুলোর আকর্ষণীয়তায়ই সে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে দ্বিতীয় লোকটিকে যা শেখাবে, তার মান এমন উচ্চ হতে হবে, যাতে তার মন সন্তুষ্ট হতে পারে এবং তার আত্মায় একটা প্রশান্তির সৃষ্টি করে। আর এভাবে তার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নেবে, সেগুলোকে এমনি অটল ও সুদৃঢ় যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেবে, যাতে দর্শন, কিংবা যুক্তিশাস্ত্রের কোন শক্তিই তা উদ্ধার করতে না পারে।

বিষয়টির আরও একটি প্রণিধানযোগ্য দিক রয়েছে। তাহল নবী-রসূলগণের ব্যাপারে একথা সবারই জানা যে, তাঁরা নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেও পরিপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। তাঁরা নিজেদের পবিত্র -পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির আলোকে জ্ঞান ও কর্মের সেসকল ধাপ অতিক্রম করে নিতেন যা অন্যেরা ওহী ও ইলহামের দিকনির্দেশনা সত্ত্বেও অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু ইলম ও আমলের এমন সুউচ্চ মর্যাদা লাভ সত্ত্বেও রসূলগণের তৃষ্ণা ও আগ্রহাতিশয্য যথাস্থানে অব্যাহত থেকে যেত। যতক্ষণ পর্যন্ত ওহীরূপী রহমত অবতীর্ণ না হত ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের সে তৃষ্ণার অবসান হত না। তাঁরা নিজেদের আগ্রহাতিশয্য দূর করার জন্য এবং নিজের অন্তরকে অধিকতর আলোময় করে তোলার উদ্দেশে সর্বক্ষণ আল্লাহর ওহীর জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। ওহীর এ জ্যোতি তাঁদের এতই প্রিয় ছিল যে, তাঁরা ক্রমাগত তা বৃদ্ধির জন্য উদগ্রীব হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করতে থাকতেন – رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।

আর তা লাভ করার পর জড়জগতের যাবতীয় সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ এবং দুনিয়ার সমস্ত বিরোধিতার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যেতেন। সুতরাং সূরা হিজরে ইসলাম বিরোধীদের মন্দাচার ও ধূর্ততার আলোচনার পর নবী করীম(সঃ)- কে এভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে-

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ
سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ـ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ـ

www.pathagar.com

অতএব সুন্দরভাবে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা সৃষ্টিকারী এবং পরিজ্ঞাত। আর আমি তোমাকে দান করেছি সাতটি পুনরাবৃত্ত বিষয় এবং কোরআনে হাকীম। তা ছাড়া আমি তাদের (কাফেরদের) কোন কোন দলকে যা কিছু দেবার দিয়েছি। সেদিকে দেখো না কিংবা সেজন্য দুঃখ করো না। আর যারা মুমিন তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করো।

এ আয়াতটি সেই সত্যেরই একটি প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য যে, কোরআন মজীদ এবং তার আয়াতসমূহের মাঝে যে শক্তি নিহিত রয়েছে, তা দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ এবং সৈন্যসেনার মধ্যেও নেই। ইমাম মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী উল্লিখিত আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে লেখেছেনঃ

আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সঃ) কে বলেন, এই আধ্যাত্মিক সৈন্য-সেনার দ্বারা তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী সাহায্য পেতে পারবে, যতটা তুমি পার্থিব শক্তি-সামর্থ্যবানদের দ্বারা আশা কর। সুতরাং নামায পড় এবং কোরআন তেলাওয়াতে দৃঢ় থাক। আর যেসব নামাযী মুসলমান তোমার সাথে রয়েছে তাদেরকে সাথে নিয়ে মুশরিকীন এবং বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যাও।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইলম ও আমলের অস্বাভাবিক শক্তি যোগ্যতার প্রতিভূ নবী-রসূলগণ (আঃ) ও অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের জন্যে এই আয়াতসমূহের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এসব আয়াতের দিশাতেই তাঁরা সঠিক লক্ষ্যের সন্ধান লাভ করেছেন। এগুলোর জ্যোতিতেই তাঁদের আত্মার দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছে এবং আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠেছে। তখন তাঁর প্রেমে আত্মা পাগলপারা হয়ে- رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا (রাব্বি যিদনী ইলমান)-এর জপ করতে শুরু করেছে। আর আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান লাভ হওয়ার সময় তার উন্মাদনা, আত্মবিস্মৃতি এবং আগ্রহ ও ক্ষিপ্রতার অবস্থা এমনি পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, গায়েবী শিক্ষাগুরু তাঁকে لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ (লাতা জাল্ বিল্ কোরআন) অর্থাৎ কোরআনের ব্যাপারে ক্ষিপ্র হয়ো না বলে সাদর ভর্ৎসনা করেন।

যে কোরআনে হাকীমের আয়াতসমূহের এহেন মর্যাদা, তাকে এমন কিছু আইন-কানুন বা নীতি-নিয়ম, কিছু ওয়াজ-নসীহত বা উপদেশবাণী আর কতিপয় গল্প-কাহিনীর বিক্ষিপ্ত একটা সংকলন মাত্র বলে ধারণা করা এবং একে বুঝবার জন্য শুধু সামান্য চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্য কোন কারণ-উপকরণের

www.pathagar.com

সাহায্যের দরকার আছে বলে মনে না করা একান্তই পরিতাপের বিষয় এবং মারাত্মক বিভ্রান্তি।

এই বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নবীগণ সর্বাগ্রে আয়াতসমূহের তেলাওয়াতের দ্বারা মনের পবিত্রতা বিধান করেছেন, প্রকৃতির সুপ্ত প্রতিভা ভাণ্ডারকে জাগিয়ে তুলেছেন, কাদামাটিতে ভরে যাওয়া প্রস্রবণগুলোকে পূর্ণ প্রবাহিত করেছেন এবং চাপা পড়ে যাওয়া মানব যোগ্যতা ও প্রতিভাসমূহকে বিকশিত করেছেন। আর যেহেতু জ্ঞান বা ইলম নষ্ট করার মূল হচ্ছে শিরক বা অংশীবাদ, আর আমল বিনষ্ট করার মূল আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতি, কাজেই সর্বাগ্রে নবিগণ তওহীদ ও আখেরাত সংক্রান্ত শিক্ষাকেই মানব মনে বদ্ধমূল করে তুলেছেন। আর এই শিক্ষা সমাপ্তির পর 'কিতাব'-এর তালীমদানের পরিচ্ছেদ আরম্ভ করেছেন।

কিতাবের তা'লীমঃ

'তা'লীমে কিতাব' অর্থ কোরআনের শিক্ষা। কিন্তু আয়াতের এ প্রসঙ্গটি ওপরে আলোচিত হয়ে গেছে। 'হেকমত' সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। কাজেই কিতাব বলতে সমগ্র কোরআনকে উদ্দেশ করা যায় না। বরং এর শুধুমাত্র সে অংশটুকু হতে পারে, যা আদেশ-নিষেধ এবং নীতি-পদ্ধতি ও আইন-কানুন সংক্রান্ত। এভাবে বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করার কারণ এই যে, কোরআনের বিভিন্ন স্থানে 'কিতাব' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যার কয়েকটি প্রসিদ্ধ অর্থ নিম্নরূপ—

১। আসমানী 'কিতাব'–যা আম্বিয়ায়ে কেরামের ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন, ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ . এটি একটি আসমানী কিতাব বা গ্রন্থ, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

২। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত এবং নির্দিষ্ট নিয়তি। যেমন,

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ .

আর আমি কোন জনপদকেই ধ্বংস করিনি, কিন্তু তার জন্য একটা নির্দিষ্ট অবকাশ ছিল।

৩। বিধি-বিধান ও আইন-কানুন। যেমন,

لَاتَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ .

www.pathagar.com

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করো না, যতক্ষণ না আইন কর্তৃক নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

৪। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্তসমূহের রেজিস্টার বা দপ্তর। যেমন, وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ কাঁচা বা চিটা এমন কোন বিষয়ই নেই যে একটি প্রকৃষ্ট 'কিতাবে' লিখিত নেই।

৫। আমলনামা বা কর্ম বিবরণী। যেমন, اَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ـ

কিন্তু সেব্যক্তি যে তার আমলনামা ডান হাতে পাবে।

আমাদের ধারণা, নিম্নের আলোচ্য আয়াতসমূহে 'কিতাব' শব্দটি আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত নির্দেশ এবং বিধি-বিধান অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

কোরআন মজীদে এই অর্থে 'কিতাব' শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট স্পষ্ট। সুতরাং সূরা বাকারার যেখান থেকে সংবিধান পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়, প্রায় বিধানই كتب (কাতাবা) অথবা كتب (কুতিবা) শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ـ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ـ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ـ

প্রভৃতি। আবার অনেক জায়গায় পরিষ্কারভাবেই 'কিতাব' শব্দের দ্বারা প্রচলিত আইনকে উদ্দেশ করা হয়েছে। যেমন,

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ ـ

'কিতাব' শব্দের অর্থ হচ্ছে ইদ্দতের সময়। সূরা আহ্যাবে রয়েছে—

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ ـ

এ আয়াতে 'কিতাব অর্থ উত্তরাধিকার আইন।

ফলকথা, কোরআন মজীদে আইন ও সংবিধান অর্থে 'কিতাব' শব্দটির ব্যবহার যথেষ্ট পরিচিত। আর যেহেতু আলোচ্য আয়াতে কোরআন মজীদের সাংগঠনিক উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ উপলক্ষে এতে কি কি উপাদান বিদ্যমান তাও বলে দেয়া হয়েছে, কাজেই স্থান-কাল ও পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী এখানে 'কিতাব' বলতে সংবিধান ও আইন বিষয়ক অংশটিকেই বুঝতে হয়।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা খোদায়ী শিক্ষার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, তাতে আমাদের প্রকৃতির চাহিদার প্রতি এতটা লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত

www.pathagar.com

আমাদেরকে যাবতীয় অস্বাভাবিক জঞ্জালমুক্ত না করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন বা সংবিধানের আনুগত্যের কোন দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি।

প্রকৃতির উদাহরণ অনেকটা পাকস্থলীর মত। পাকস্থলী যেমন দূষিত খাদ্যের ব্যবহার কিংবা তাতে আবর্জনা জমা হয়ে গেলে তার খাদ্যস্পৃহা হারিয়ে বসে এবং তখন কোন সুস্বাদু বস্তুতেও কোন আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না, তেমনিভাবে বাজে কল্পনা ও কুসংস্কারের প্রবলতার দরুন প্রকৃতিও তার উৎকর্ষণস্পৃহা হারিয়ে ফেলে এবং অতপর কোন সৎকর্মের প্রতিও আকৃষ্ট হতে পারে না। কাজেই এমতাবস্থায় যেমন একজন কবিরাজ প্রথমে পাকস্থলীকে দূষিত আবর্জনা থেকে মুক্ত করে তার খাদ্য গ্রহণের আগ্রহ যথাস্থানে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, তেমনিভাবে একজন আধ্যাত্মিক চিকিৎসকও অন্তরকে প্রাকৃতিক যাবতীয় অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে তাতে প্রকৃত ক্ষুধার সঞ্চার করেন। এ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়ে যাবার পর শরীয়ত ও দ্বীনের প্রতিটি বিষয় গ্রহণ করার জন্য তেমনিভাবে সে উদগ্রীব হয়ে ওঠবে, যেমন একজন তৃষ্ণার্ত পানির জন্যে এবং একজন ক্ষুধার্ত খাবারের জন্যে উদগ্রীব হয়েও উঠে। কোরআন মজীদ এ অবস্থার প্রতি এভাবে আলোকপাত করেছেঃ

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ -

হে পরওয়ারদেগার! আমরা একজন আহবানকারীকে শুনেছি, তোমার প্রতি ঈমান আনার জন্য আহবান করে যাচ্ছে যে, হে মানবকুল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অতএব, আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদিগকে পাপমুক্ত করে দাও। আর আমাদের মৃত্যু দাও তোমার অনুগত বান্দাদের সাথে।

এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসে যায়।

১। গোটা শরীয়তের উৎসমূল হচ্ছে প্রকৃতির কতিপয় মৌলিক তত্ত্ব। 'এক' থেকেই যেমন শ' এবং হাজারের উদ্ভব হয়, তেমনিভাবে সেই কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অনুষংগ ও ফলাফলের প্রেক্ষিতেই ধর্মের সমস্ত বিশ্বাস ও কর্ম অস্তিত্ব

www.pathagar.com

লাভ করে। সেজন্যেই ইসলামকে বলা হয়েছে প্রকৃতির ধর্ম।

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ـ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

এটি আল্লাহ্‌রই বানানো প্রকৃতি, যার ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র (তৈরী) প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। এটাই হচ্ছে (ইবরাহীম কর্তৃক প্রচারিত) সহজ-সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করে না।

হেকমতের শিক্ষাঃ

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'হেকমতের' শিক্ষা। 'হেকমত' সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই 'হেকমত' কোরআনের একটা অংশ, না তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয়? আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র কালাম কোরআন মজীদ যেমন আল্লাহ্‌র আয়াত, নিদর্শন ও আহকাম বা বিধানসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে, তেমনিভাবে হেকমত বা জ্ঞান, দর্শন, তত্ত্ব ও রহস্যসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু আমাদের এ দাবী অবশ্য তাঁদের ধারণার বিরুদ্ধে যাবে, যাঁদের মতে হেকমত বলতে হাদীস কিংবা অন্যান্য কতিপয় জ্ঞানকে উদ্দেশ করা হয়েছে। আর যেহেতু কোন কোন বিশিষ্ট মনীষীর মতও তাই, যেমন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ। কাজেই বিষয়টি উপেক্ষা করা কঠিন। অতএব, দেখতে হবে, যাঁরা হেকমত বলতে হাদীস বুঝেন, তাঁদের প্রমাণ কি?

তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াতে 'হেকমত' শব্দটি 'কিতাব' শব্দের সংগে এসেছে। আর তারা 'কিতাব' অর্থে সামগ্রিকভাবে কোরআন মজীদকে বুঝেন। কাজেই অপরিহার্যভাবেই 'হেকমত' শব্দের দ্বারা অন্য কোন কিছু বুঝতে হয় (যা কোরআন নয়)। আর বলাই বাহুল্য, কোরআনের পরে হাদীস ছাড়া অন্য কোন বস্তু এ শব্দের অর্থ হতেই পারে না।

কিন্তু উল্লিখিত বিতর্কের দ্বারা একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রমাণটি যথেষ্ট শক্ত নয়। আমাদের ব্যাখ্যানুসারে উল্লিখিত আয়াতে 'কিতাব' অর্থ বিধান ও নির্দেশাবলী। কাজেই 'হেকমত'-এর জন্য স্বয়ং কোরআন মজীদেই যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—এর দ্বারা হাদীস কিংবা কোরআন বহির্ভূত অন্য কোন বস্তু উদ্দেশ করা অপরিহার্য নয়। অবশ্য এটা স্বতন্ত্র কথা যে, হাদীসেও (বিপুল) হেকমত রয়েছে।

৬ —

www.pathagar.com

হাদীসের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কোরআনের অব্যবহিত পরেই তার স্থান। এতেও কোরআনী হেকমত বা দর্শনের এক বিপুল ভাণ্ডার নিহিত। তা ছাড়া হাদীসেই যদি হেকমত না থাকবে, তা হলে থাকবে কোথায়? কিন্তু একথা যথার্থ নয় যে, আলোচ্য আয়াতে 'হেকমত' শব্দটি হাদীস অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন কারণ-উপকরণ এ ধারণার পরিপন্থী। তার কয়েকটির প্রতি আমরা এখানে ইংগিত করছি —

১। বেশ কতিপয় আয়াতে 'হেকমত' বুঝাতে গিয়ে يتلى (ইউতলা), انزل (উনযিলা) ও اوحى (উহিয়া) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার ব্যবহার হাদীসকে বুঝাবার উদ্দেশে কোরআনের কোথাও নেই। যেমন—

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ـ

আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হেকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা (ইতিপূর্বে) জানতে না।

অন্য জায়গায় আছে-

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِى بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ـ

তোমাদের ঘরে আল্লাহ্র যেসব আয়াত এবং হেকমত পাঠ করা হয়, সেগুলো স্মরণ রেখো।

আরো এক জায়গায় ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনার পর বলা হয়েছে ঃ ذَالِكَ مِمَّا اُوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ـ

তোমাদের পরওয়ারদেগার তোমাদের কাছে যে হেকমত ওহী (প্রত্যাদেশ) করেছেন, এটা তারই মধ্য থেকে।

২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের দলিল-প্রমাণগুলোকে 'হেকমতে বালেগাহ' শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং স্বয়ং কোরআন মজীদকে 'কোরআনে হাকীম' ও 'কিতাবে হাকীম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছেঃ

يٰسٓ ـ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ـ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ـ

৩। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ

স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে কিতাব, হেকমত, তওরাত এবং ইঞ্জীল-এর শিক্ষা দিয়েছি।

www.pathagar.com

এ আয়াতে কিতাব ও হেকমতের পর এরই ব্যাখ্যাস্বরূপ তওরাত ও ইঞ্জীল-এর উল্লেখ করা হয়েছে। 'কিতাব' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তওরাত আর হেকমত-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইঞ্জীল। পণ্ডিত মনীষীরা জানেন যে, তওরাত প্রধানত আইন-কানুন ও সাংবিধানিক বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ আর ইঞ্জিল হচ্ছে যুক্তি-প্রমাণ ও উপদেশাবলীর একটা সংকলন। প্রথমোক্তটিতে যুক্তি-প্রমাণ ও উপদেশের অংশ অতি অল্প। পক্ষান্তরে শেষোক্তটিতে নীতি-বিধানের আলোচনা নামমাত্র। সংবিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে ইঞ্জীল তওরাতের প্রত্যয়ন করেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। তওরাতের এই সাংবিধানিক গুরুত্বের কারণেই তাকে 'কিতাব' শব্দে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ইঞ্জীলকে তার যুক্তি-দর্শন ও উপদেশাবলীর জন্য 'হেকমত' বলা হয়েছে।

অপরাপর কয়েকটি আয়াতেও এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছেঃ

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ -

হযরত ঈসা যখন প্রকৃষ্ট ও প্রকাশ্য মু'জেযা নিয়ে আগমন করলেন, তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, হে জনগণ! আমি তোমাদের কাছে 'হেকমত' নিয়ে এসেছি এবং এমন কোন কোন বিষয় নিয়ে এসেছি যা নিয়ে তোমরা বিবাদ করছ, যাতে করে সেগুলো বিশ্লেষিত করতে পারি।

এ সব কারণ-প্রকরণের ভিত্তিতে 'হেকমত' বলতে 'হাদীস' অর্থ করা আমাদের মতে যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল 'কিতাব' এবং 'হেকমত' শব্দ দুটির একত্রিত হয়ে যাওয়ার দরুন। কিন্তু আমরা যে দিকটি বিশ্লেষিত করেছি, তার আলোকে 'কিতাব' ও হেকমতের পরিসীমা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যার পরে আর কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে না।

'হেকমত' শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণঃ

এবার সংক্ষেপে 'হেকমত'কে অভিধান এবং তার ব্যবহারের আলোকেও দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়। মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী তাঁর 'মুফ্‌রাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে এ শব্দটির সবিস্তার আলোচনা করেছেন। নিম্নে তারই প্রয়োজনীয় সার-সংক্ষেপ তুলে দেয়া হয়েছে—

www.pathagar.com

অভিধানে 'হুকুম' অর্থ মীমাংসা করা, সিদ্ধান্ত নেয়া। তা ন্যায়ই হোক কিংবা অন্যায়, যথার্থ হোক অথবা ভ্রান্ত। কোরআনে আছে—

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

(তোমাদের কি হল। কেমন ফয়সালা করছ তোমরা!)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

(তারা কি জাহেলিয়াত যুগের মীমাংসা কামনা করে?)

তা ছাড়া এই শব্দটি সে শক্তির উদ্দেশেও বলা হয়, যার আলোকে এ মীমাংসা সম্পাদিত হয়। তখন তার অর্থ হয় বিচার-বুদ্ধি। রইল 'হেকমত' শব্দটি। এটি সে শক্তির জন্য বলা হয়, যা যথার্থ মীমাংসার উৎসমূল। হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রশংসা উপলক্ষে আল্লাহ্ বলেছেন

اٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ـ

(আমি তাঁকে 'হেকমত' এবং সিদ্ধান্তমূলক কথা বলার যোগ্যতা দিয়েছি।) এখানে ক্রিয়াকে সে শক্তির পরে বলা হয়েছে, যা সে ক্রিয়ার উৎসমূল। আর সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা যেমন হেকমতের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া, তেমনিভাবে নৈতিক পবিত্রতা এবং শিষ্টাচারও তারই ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সে জন্যেই আরবের অধিবাসীরা এ শব্দটি সে শক্তিকে বুঝার জন্য ব্যবহার করত, যা বুদ্ধির পরিপক্কতা এবং শিষ্টাচার উভয়ের জন্যেই ব্যাপক। আর বুদ্ধিমান ও শিষ্টাচারীকে বলা হত 'হাকীম'। তেমনিভাবে 'হেকমত' শব্দটি 'প্রকৃষ্ট সংশোধন' অর্থেও ব্যবহৃত হত, যার উদ্দেশ্য এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাকে বুঝানো, যা মন ও মেধা উভয়ের কাছেই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। 'হেকমত' শব্দটি এ সমস্ত অর্থেই আরবী ভাষায় ব্যবহৃত। আর যেহেতু আরবরা শব্দটির এ সমস্ত দিক সম্পর্কেই সম্যক অবগত ছিল, কাজেই কোরআন এবং পয়গম্বর (সঃ) একে ব্যবহার করেছেন।

এ প্রসংগে মহানবী (সঃ) বলেছেন, কবিতার মধ্যে কোন কোনটা 'হেকমত'। অর্থাৎ, সব কবিতাই পথভ্রষ্টতা নয়; কিছু কবিতা এমনও রয়েছে যাতে সত্য কথা বলা হয়েছে এবং কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অতপর আল্লাহ্ তাআলা একে তার সর্বাধিক উত্তম অর্থে ব্যবহার করেছেন ; অর্থাৎ, ওহীর অর্থে। ওহীকে যেমন 'নূর', 'প্রমাণ', 'যিকর', 'রহমত' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনিভাবে 'হেকমত' শব্দের দ্বারাও তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, (আল্লাহ্) নিজের সত্তার জন্য 'হাকীম' ও 'আলীম' শব্দ ব্যবহার করেছেন .....।

www.pathagar.com

ওপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, 'হেকমত' বক্তব্য ও বক্তা উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। তার তাৎপর্য হচ্ছে সেই দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা, যা একান্তই বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। আগুনের অস্তিত্ব যেমন উষ্ণতার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে 'হেকমত' (প্রজ্ঞা)-ও তার ক্রিয়াকলাপেই চেনা যায়। এটা যখন কারো ভেতর সৃষ্টি হয়, তখন তার মধ্যে সত্য উপলব্ধি করার মত একটা যোগ্যতাও জন্মায়। তখন তার মুখ দিয়ে যে কথাটি বেরোয় তা হয় সত্য ও যথার্থ। আর তার দ্বারা যে কার্যানুষ্ঠানই হয় তা হয় সঠিক ও নির্ভুল। কোরআন মজীদে বর্ণিত হযরত লোকমানের কাহিনীতে তার কার্যক্রম সম্পর্কেই বর্ণনা রয়েছে। তা ছাড়া হাদীসেও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ জিনিসটিই আল্লাহ্‌র 'হাত', আল্লাহ্‌র ' চোখ'। যে এতে দেখে, তার রাতটিও দিনের মতই উজ্জ্বল হয়ে যায়। সে সংকীর্ণ অন্ধকার পথেও হুমড়ি-হোঁচট থেকে মুক্ত থাকে। সে বিন্দুতে বিশাল সমুদ্র প্রত্যক্ষ করে। সে কারণেই শরীয়তের ছোট একটি নির্দেশকে পর্বততুল্য জ্ঞান করে। অন্যের কাছে যে বিষয়ের গুরুত্ব একটা নুড়ি অপেক্ষা বেশী নয়, সে তারই মধ্যে দেখতে পায় হীরার দ্যুতি।

এমনিভাবে এটা (হেকমত) যখন কোন বাক্যে নিহিত থাকে, তখন সে বাক্য মেধাপথে মনের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে। যাবতীয় দোদুল্যমান অবস্থার তখন পরিসমাপ্তি ঘটে যায়, প্রতিটি সন্দেহ-সংশয় ধুয়ে-মুছে যায়, প্রতিটি অহেতুক দাবী বাতিল করে দেয়, প্রতিটি মিথ্যা যুক্তি ধসে পড়ে।

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا .

'সত্য এসে গেছে, মিথ্যা শেষ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা স্থিতিহীন।' আর এই হচ্ছে কোরআন মজীদের বৈশিষ্ট্য।

একটি লক্ষণীয় বিষয়ঃ

এক্ষেত্রে হেকমতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় তাৎপর্য বুঝে নেয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে প্রসংগক্রমে তওরাত এবং কোরআন মজীদের পারস্পরিক পার্থক্যটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কোরআন মজীদে তওরাতের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোথাও হেকমতের উল্লেখ নেই। বরং কোন কোন জায়গায় পরিষ্কারভাবে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে যে, তওরাত হচ্ছে সংবিধান আর ইঞ্জীল হেকমত। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তার উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। যেমন ঃ

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ -

(اعراف - ١٤٤)

আমি তার জন্যে লওহ্ তথা পটের ওপর সমস্ত বিষয় উৎকীর্ণ করে দিয়েছি। উপদেশবাণী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত (বিবরণ)।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'উপদেশবাণী' কি? আমরা যতটা লক্ষ্য করেছি, উপদেশও ' হেকমতেরই একটি শাখা; সরাসরি হেকমত নয়। হেকমত বা অভিজ্ঞান উপদেশ অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বের বিষয়। আর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ বিষয়টি সব ব্যক্তি কিংবা দলসমূহকেই দেয়া হয়, যারা বুদ্ধির পরিপক্কতায় পৌঁছতে পারে। যে পর্যন্ত কোন জাতি মেধার দিক দিয়ে শৈশবের পর্যায়ে অবস্থান করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে হেকমতের দ্বারা ভূষিত করেন না, বরং জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য তাদেরকে দেয়া হয় একটি শরীয়তী নীতিমালা। আর চিন্তা-ভাবনার সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য উপদেশাবলী দান করা হয়েছে। সূরা আ'রাফের এক আয়াতে এই বাস্তবতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) যখন 'তুর' পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হন, তখন তিনি আল্লাহ্কে দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তাতে আল্লাহ্ উত্তর দেন, "তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, আমার জ্যোতির ছটা পাহাড় পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না; আর মানুষের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।" অতএব, আল্লাহ্ যখন নিজের নূরের ছটা পাহাড়ের ওপর নিক্ষেপণ করলেন, পাহাড় খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেল আর হযরত মূসা (আঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এল, সাথে সাথে তিনি তওবা করলেন–

قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! এখন আমি তোমার দিকে ফিরে এসেছি। আমি প্রথম অনুগত বান্দায় পরিণত হচ্ছি।

আল্লাহ্ বললেন–

يَامُوْسٰى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ وَبِكَلَامِيْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ -

www.pathagar.com

হে মূসা! আমি আমার পয়গাম এবং আমার বাক্যের দ্বারা তোমাকে মানুষের মধ্যে বিশিষ্টতা দান করলাম। সূতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এই فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ـ আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর— এর শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন। বর্ণনারীতিতে পরিষ্কার বুঝা যায়, হযরত মূসা (আঃ) পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ বললেন, এমন অভিলাষ করো না; পরিপূর্ণ পরিচয়ের চাপ পাহাড়-পর্বতও সহ্য করতে পারে না। তা তুমি কেমন করে সহ্য করবে? কাজেই যেটুকু পেলে তাইতে সন্তুষ্ট থাক আর আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা।

বিষয়টিতে সে সত্যের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি পরিপূর্ণ হেকমত লাভের যোগ্য হতে পারেনি। তাদেরকে শুধু সংবিধান এবং উপদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, তাদের মন-মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা তার বেশী সহ্য করার উপযোগী ছিল না। হযরত মূসা (আঃ)-এর পর যেসব নবী আগমন করেন, তাঁরা ধীরে ধীরে বনী ইসরাঈলকে হেকমতের সাথে কিছুটা পরিচিত করাতে চাইলেন, কিন্তু তারা তার এতটুকু মর্যাদা দেয়নি। এমনকি হযরত ঈসা (আঃ) এলেন। তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা হেকমত সম্বলিত কিতাব দান করলেন। কিন্তু স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা অনুসারে তখনও পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের মেধাগত সামর্থ্য পরিপূর্ণ হেকমত বা অভিজ্ঞতা ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে তিনি বললেন, "তোমাদের প্রতি আমার অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু তোমরা সেসব বিষয় সহ্য করতে পারবে না।" অতঃপর তিনিও পরিপূর্ণ হেকমত শিক্ষাদানের বিষয়টি উত্তরসুরির দায়িত্বে রেখে দুনিয়া থেকে অন্তর্হিত হলেন।

এই উত্তরসুরি যখন এলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে এমন এক গ্রন্থ দান করলেন, যা তওরাতের মত শুধু সংবিধানই নয়, বরং ইঞ্জীলের মত হেকমত এবং উপদেশও বটে। তদুপরি হেকমতের সে অংশটিও এতে রয়েছে যার শিক্ষাকে হযরত মসীহ নিজের জাতির অযোগ্যতার দরুন মুলতবী রেখে দিয়েছিলেন। কিতাব ও হেকমতের এই হচ্ছে সমন্বয়, যাকে আমরা 'কোরআন' নামে অভিহিত করি। যেহেতু এ গ্রন্থটি পরিপূর্ণ হেকমতে ভরপুর, কাজেই এতে সম্যক পরিচয় লাভের সে সকল দ্যুতিও সংরক্ষিত, যার অতি সামান্য বিকিরণে

www.pathagar.com

গোটা 'তুর' পর্বত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল, হযরত মূসা (আঃ)-কে জ্ঞান হারাতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন চাইলেন, এমন একজন মানুষ জন্মিয়ে দিলেন, যিনি সে দায়িত্বের বোঝা তুলে নিলেন, যার চাপ সহ্য করা তুরের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সূরা হাশরের নিম্ন আয়াতে কোরআনে হাকীমের এই বাস্তব সত্যটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে—

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

আমি যদি কোরআনকে পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তা হলে তোমরা তাকে দেখতে সে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহর ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেত।

এই হল রহস্য যে, তওরাতের পক্ষে একইবারে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়েছে, কিন্তু কোরআনে হাকীমের অবতরণ একইবারে হয়নি, বরং অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে করে মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই বিদ্যুচ্ছটাগুলো সহ্য করে নেয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে এবং সেগুলোকে ধারণ করতে পারে। কাফের-মুশরিকরা ইহুদীদের প্ররোচনায় মহানবী (সঃ)-এর প্রতি প্রশ্ন তুলত যে, কোরআন মজীদ তওরাতের মত গোটাটাই একইবারে নাযিল হয় না কেন? এর উত্তরে আল্লাহ্ বললেন لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ (এর কারণ, যাতে করে একে বহন করার জন্য আমি তোমাদের মন-মস্তিষ্ককে সমর্থ করে তুলতে পারি।) লক্ষ্য করার বিষয়, যে পবিত্র বক্ষ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ-এর নূরের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাঁর পক্ষেও কোরআনকে বহন করা সহজ কাজ ছিল না। তা হলে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কি দাঁড়াত, যাদের যোগ্যতা এবং নবীর যোগ্যতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য?

সে জন্যই জ্ঞান-বুদ্ধি এবং মন-মস্তিষ্কের নিম্নলিখিত যোগ্যতা প্রয়োজন।

কোরআন মজীদ চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র ঃ

এই সবিস্তার আলোচনার সার-সংক্ষেপ এই দাঁড়াচ্ছে যে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা একান্তই ভুল যে, তা শুধুমাত্র আইন-কানুন ও সংবিধানের একটা সংকলন এবং সেই বাক্যশ্রেণীভুক্ত, যা বুঝার জন্য বিশেষ কোন মানসিক প্রচেষ্টা কিংবা চিন্তা-গবেষণার আদৌ প্রয়োজন নেই। যে কেউ আরবী কোন রচনার শুদ্ধাশুদ্ধ তরজমা করতে পারবে সে-ই কোরআন মজীদেরও

www.pathagar.com

তফসীর বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাধারণ শিক্ষার দিক দিয়ে কোরআন একান্তই পরিষ্কার ও সহজ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। জীবনকে যে গতিতে অতিবাহিত করতে হবে, কোরআন প্রথম দৃষ্টিতেই সেদিকে দিশা দেয়। করার মত যাবতীয় বিষয় এবং না করার মত প্রতিটি কাজ সম্পর্কে কোন রকম জটিলতা না রেখে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বাতলে দেয়। হারাম-হালাল বা বৈধ-অবৈধের সীমানা সুনির্দিষ্ট শব্দ ও অতি সাধারণ বাক্যের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অভ্যন্তরে এক সুগভীর দর্শন-অভিজ্ঞানও নিহিত রাখে। যার গভীরতা অথৈ, যার বিস্তৃতি অনন্ত। আর সে গভীরতায় পৌছার জন্যে শুধুমাত্র আরবী ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়; বরং সুগভীর চিন্তা-গবেষণারও প্রয়োজন। শুধুমাত্র সাঁতরানোই যথেষ্ট নয়; বরং তলিয়ে দেখারও প্রয়োজন। সাধারণ পথিকের মত শুধু হেঁটে যাওয়া উচিত নয় বরং প্রতিটি পদক্ষেপে বিরতি নিয়ে প্রতিটি রন্ধ্রের অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। তাও শুধু একবার নয় বরং যেমন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, 'বারবার দেখা কর্তব্য'। এটি উপর্যুপরি পর্যালোচনা আর ক্রমাগত চিন্তা-গবেষণারই বিষয়। মহানবী (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

تعاهدوا هذا القران فوالذى نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الابل فى عنقها (للشيخين)

এজন্যেই কোরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্যের ওপর চিন্তা-গবেষণার জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণ ও মেধাবী সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সমন্বয়ে বিভিন্ন পরিষদ কায়েম করা হয়েছিল। হুযুরে আকরাম এ ধরনের পরিষদ গঠনের জন্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় মানুষকে উৎসাহিত করতেন। আবু দাউদ গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে—

ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملئكة وذكرهم الله فيمن عنده ـ

যারা কোন জায়গায় একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পরে কোরআনের পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন মজলিস স্থাপন করে, তাদের ওপর আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি ও রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফেরেশতারা তাদেরকে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে থাকেন এবং আল্লাহ তাআলা নিজের ঘনিষ্ঠদের মাঝে তাদের নিয়ে আলোচনা করেন।

www.pathagar.com

এ হাদীসটির দ্বারা শুধু এ কথাই বুঝা যায় না যে, এ ধরনের মজলিস গঠনে বিরাট বরকত রয়েছে, বরং সাথে সাথে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সঃ)-এর আমলেও এ বিষয়টির ব্যাপক প্রচলন ছিল। তখনও কোরআন মজীদের আলোচনা -পর্যালোচনার উদ্দেশে জায়গায় জায়গায় মজলিস অনুষ্ঠিত হত। তাতে সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করতেন। কোরআনের আয়াত ও তার বক্তব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। হুযুরে আকরাম (সঃ) নিজেও কোন কোন সময় এসব মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি কোন কোন রেওয়ায়েতের দ্বারা বুঝা যায়, হুযুর (সঃ) এসব আলোচনা সভাকে যিকির-আযকারের মজলিস অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আবেদ-যাহেদের কোন এক মজলিস ছেড়ে তিনি জ্ঞানচর্চার মজলিসে এ কথা বলে গিয়ে বসেছিলেন যে, "আমি প্রশিক্ষক নিযুক্ত করে প্রেরিত হয়েছি।"

চিন্তা করার বিষয়, সাহাবায়ে কেরাম কিসের চিন্তা-ভাবনা করতেন? কোরআনের ভাষা ছিল তাঁদের নিজেদেরই ভাষা; তাতে তার বর্ণনাভঙ্গি ও তার রীতি-পদ্ধতিও তাঁদেরই; আলোচনার বিষয়টি নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা কিংবা বিতর্কানুষ্ঠানের মত ছিল না। কোরআন যেসব অবস্থা ও ঘটনার ওপর অবতীর্ণ হত, সেগুলোও ছিল তাঁদেরই নিজস্ব বিষয়। সেগুলো জানার জন্য তাঁদের গভীর চিন্তা-ভাবনা কিংবা চেষ্টা-চরিত্রের প্রয়োজন হওয়ারও কথা নয়। ইশারা-ইঙ্গিতের সম্পর্কও সেসব বিষয়ের প্রতিই হত, যা নিয়ে তাঁরা দৈনন্দিন বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতেন। এক কথায় সংস্কার, বিশ্বাস, কাজকর্ম এবং ভাল-মন্দ যেসব বিষয়ে কোরআন আলোচনা করত, তার সবই ছিল তাঁদের নিজেদেরই উপাখ্যান। বিগত জাতিসমূহের ইতিহাসের ওপর কোরআনে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেসবও ছিল তাঁদের দৈনন্দিনের চর্চা। ইহুদী-নাসারাদের ধারণা, বিশ্বাস কিংবা ঘটনা প্রভৃতির বিষয়ে কোরআন যে ইঙ্গিত করেছে, তার সাথেও তাঁরা একান্ত সম্পর্কের পর্যায়ে যথাযথভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। তা হলে কোরআনে এমন কোন্ বিষয়টি ছিল, যার ওপর তাঁদেরকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে হত? বাস্তবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং তা সাধারণ চিন্তা-ভাবনা নয়, বরং এমন চিন্তা-ভাবনা, যার কোন দৃষ্টান্ত বর্তমান গবেষণা পর্যালোচনার যুগেও অল্পই পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং 'মোয়াত্তা' গ্রন্থে উদ্ধৃত এক রেওয়ায়েতে আছে–

ان عبد الله ابن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين تعليمها

www.pathagar.com

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ক্রমাগত আট বছর যাবত সূরা বাকারার ওপর গবেষণা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে ওসব উপত্যকার একটিও পাড়ি দেয়ার প্রয়োজন ছিল না, বর্তমানে কোরআন মজীদের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে যা অতিক্রম করতে হয়। তাঁর পথ ছিল অত্যন্ত সহজ ও পরিষ্কার। কোরআন মজীদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য যেসব বিষয়ের আমরা মুখাপেক্ষী, সেসবগুলো থেকে না হলেও অধিকাংশগুলো থেকেই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর চিন্তা-গবেষণার বিষয় ছিল শুধুমাত্র কোরআনের তত্ত্ব রহস্য ও হেকমত বা অভিজ্ঞান। আমাদের প্রচলিত বিদ্যা ও কলাকৌশলের এসব আবেষ্টনীও তাঁর চারপাশে ছিল না। শুধু একটি মাত্র গ্রন্থ ছিল, যার জ্ঞান-অনুশীলন, পর্যালোচনা ও শিক্ষাদানই তাঁর জীবনের এবং জীবনের সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তথাপি সবাই দেখলেন, তিনি কোরআন মজীদের একেকটি সূরার ওপর আট আট বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁকে না শিখতে হয়েছিল কোরআনের ভাষা, না জড়াতে হয়েছিল তার শানে নযুল এবং নাসেখ-মনসুখ (রহিত ও রহিতকারী) আয়াতের বিতর্কে। ভাষা ছিল তাঁরই ভাষা। তাঁরই ছিল রুচি। ধারণা-কল্পনা তাঁরই। অবস্থা, বিষয়-আসয়, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও কার্যকারণ সবই ছিল তাঁদেরই। তথাপি একেকটি সূরার ওপর আট আট বছর চিন্তা-গবেষণা করার পরও তিনি পরিতৃপ্ত হতেন না। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে— যারা কোরআনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অপরিচিত এবং যাদের তার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য শতাধিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হয়, এমন ধারণা করা কেমন করে বৈধ হতে পারে যে, কোরআন মজীদ একটা খোলা গ্রন্থ; যা বুঝার জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা কিংবা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই?

এটা সাহাবায়ে কেরামের জীবনের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। তাছাড়া স্বয়ং কোরআন মজীদের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, এতে এমন কোন সূরা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যাতে চিন্তা-ভাবনা আর গবেষণা-পর্যালোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়নি। প্রতি পদে পদে لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (যাতে তোমরা বুঝ), কয়েক আয়াত পরে পরেই لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (যাতে তোমরা মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর) لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (যাতে তোমরা স্মারক গ্রহণ কর), প্রভৃতি বিষয়ের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা 'ক্বাফ'-এ কোরআন মজীদকে উপলব্ধি করার জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে –

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ-

নিঃসন্দেহে এতে স্মারকবাণী রয়েছে সে লোকের জন্য; যার প্রাণ আছে কিংবা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে।

অর্থাৎ, কোরআন মজীদের দ্বারা উপকৃত হতে হলে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, বুকের ভেতরে এমন একটি সজাগ অন্তর থাকবে, যা যাবতীয় জ্ঞানের উৎস। আর জাগ্রত অন্তর যদি নাও থাকে, অন্তত এমন শ্রবণশক্তি থাকবে যে, পরিপূর্ণ একাগ্রতা সহকারে মনোযোগ দিয়ে কোরআনের বাণীতে নিবিষ্ট হয়ে যায়, যাতে কোরআন যেন কর্ণকুহরে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। যদি এগুলোর কোনটাই না থাকে, তবে এমন লোকের পক্ষে কোরআন দ্বারা উপকৃত হওয়া অসম্ভব। কোরআন বুঝার জন্যে; তা উপলব্ধি করার জন্যে এ দুটি বিষয়ের একটির উপস্থিতি অপরিহার্য— হয় মানুষের অন্তরের দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে এবং জ্ঞান-দর্শনের আলো তার মধ্যে প্রজ্বলিত থাকবে, আর না হয় নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়কে সে এ জন্যে উন্মুক্ত করে দেবে এবং পরিপূর্ণ আগ্রহের সাথে তাকে স্বাগত জানাবে।

যারা এ দুটি বিষয় থেকে বঞ্চিত তারা কোরআন মজীদের মহিমালাভেও বঞ্চিত।

সূরা মুহাম্মদের এক আয়াতে তাদেরই চিত্র এভাবে আঁকা হয়েছে —

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ .

এরা কি কোরআনের ওপর চিন্তা করে না? নাকি এদের অন্তরে তালা লেগে রয়েছে?

এখানে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। মুনাফেকরা কোরআন পড়ত, কিন্তু মনোনিবেশ কিংবা একাগ্রতার সাথে নয়, বরং ভাসা ভাসা ও কুটিল মন নিয়ে পড়ত। তারা কোরআনের আয়াতের ওপর থেকে অবহেলাভরে চোখ ঘুরিয়ে নিত। অথচ এর দ্বারা উপকৃত হতে হলে তার ওপর চিন্তা করা ছিল অপরিহার্য। ফলে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার পরেও তারা অবিশ্বাস ও মন্দাচারে লিপ্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে তাদের সামনে কোরআনের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটিতই হয়নি। এ গ্রন্থের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে, এটা চিন্তা-গবেষণার জিনিস। বরং বলা যেতে পারে, এটা এমন এক গ্রন্থ যা মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করে। এর বিতর্ক ও প্রমাণরীতি আমাদের নৈয়ায়িকদের বিতর্ক ও প্রমাণরীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত বের করে শ্রোতাদেরকে হতবাক করে দেয়া কোরআনের রীতি নয়। কোরআন মজীদ দুনিয়ার মানুষকে হতভম্ব করে দেয়ার জন্যে আসেনি, বরং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মন-মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত করার জন্যে এসেছে। সে মানুষের চিন্তা ও প্রমাণের ক্ষমতাগুলোকে প্রশস্ত করে। সেগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং অতপর সেগুলোকে সে পথে পরিচালিত করে যা প্রকৃতির পথ এবং যাতে কোন ঘুরপাক নেই। কোরআনের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, সে যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেয়। প্রমাণ করার কোন কোন দিককে কিছুটা যবনিকামুক্ত করে দেয় এবং ফলাফলের কোন কোন দিকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে দেয়। যুক্তি শাস্ত্রীয় আরোহ অবরোহ পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে তা থেকে একটা সিদ্ধান্ত বের করার কাজটা কোরআন নিজে করে না, বরং শ্রোতাদের ওপরই ছেড়ে দেয়, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে এবং নিজেই কোরআনের দিশা অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে কতিপয় জিনিসের নাম উল্লেখ করে এই বলে নীরবতা অবলম্বন করে যে, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ (এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রমাণ।) সে দলিল-প্রমাণগুলো কি? সাধারণত সে এর বিস্তারিত কিছু বলে না; বরং এ কাজটি শ্রোতার ওপর ছেড়ে দেয়। তারপর শ্রোতাদের দায়িত্ব হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা করে দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করে নেয়া।

সূরা নাহ্‌লের একটি আয়াত গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই কোরআন মজীদের প্রমাণরীতির যথার্থ তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যেতে পারে। এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۔

www.pathagar.com

তিনিই (সে মহান সত্তা) যিনি তোমাদের জন্যে মেঘমালা থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তার কিছু তোমাদের পানীয় হিসেবে কাজে লাগে, কিছু শস্যভূমিকে সরস করে। তাতে করে তরুলতা উৎপন্ন হয় আর তোমরা তাতে নিজেদের (পালিত) পশুদের চরাও। এই পানির দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য শস্যও উৎপাদন করেন; জয়তুন, খেজুর এবং বিভিন্ন রকমের ফলমূলও। নিশ্চয়ই বিষয়টিতে মানুষের জন্য একটা বিরাট নিদর্শন রয়েছে, যারা লক্ষ্য করে। আর তিনি রাত্র, দিন ও চন্দ্র-সূর্যকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। আর তেমনি করে গ্রহ-নক্ষত্ররাজিও তোমাদেরই কাজে নিয়োজিত রয়েছে তাঁরই হুকুমে। এতে তাদের জন্যে মহা নিদর্শনসমূহ রয়েছে যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায়। আর ভূপৃষ্ঠে তোমাদের জন্যে যে নানা রঙ্গেরশস্য সামগ্রী সৃষ্টি করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তাতে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন রয়েছে; যারা চিন্তাশীল, যারা ভাবুক তাদের জন্যে।

এখানে ধারাবাহিকভাবে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (যারা গভীরভাবে চিন্তা করে তাদের জন্যে)। لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (যারা বুদ্ধি বৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্যে)। لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ (যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য)। অতপর এক জায়গায় বলেছেন, اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً (এতে একটি বিরট প্রমাণ রয়েছে। কি সে প্রমাণ? তা কিছুই বলা হয়নি। চিন্তা করলে বুঝা যাবে। অন্য জায়গায় বলেছেন, اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ (এতে প্রমাণসমূহ বিদ্যমান)। কি সেসব প্রমাণ এবং কিসের ওপর সে প্রমাণগুলো? এসব প্রশ্নের উত্তর দেননি, বরং বলে দিয়েছেন, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, যারা বুদ্ধির সাহায্য নেয়, তারা নিজেরাই উত্তর পেতে পারবে। তারপর কোন কোন বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً (এতে একটি প্রমাণ বিদ্যমান)। কি সে প্রমাণটি? কোন্ বিষয়ের প্রমাণ? তার কোন উত্তর দেননি, যাতে করে শ্রোতার চিন্তা ও গবেষণা শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নিজেই সে উত্তরটি বে র করে নেয়।

দলিল-প্রমাণ ও হেকমতের বিষয় বিবৃত করতে গিয়ে কোরআনের সাধারণ ধারা তাই যা ওপরে বলা হল। সে হেকমতের (অভিজ্ঞানের) এক বিপুল, অন্তহীন ভান্ডার নিজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখে, যাতে করে মানুষ নিজে, আপন চেষ্টায় সে যবনিকা উন্মোচিত করে তা থেকে যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে নেয়। আসল বিষয় হল হেকমত অনুসন্ধানের দক্ষতা সৃষ্টি করা। এই দক্ষতা কারো মাঝে সৃষ্টি হলে

www.pathagar.com

সে দেখতে পায়, কোরআন মজীদে লুক্কায়িত সে জ্ঞানভান্ডার কোন কালেই শেষ হওয়ার নয়। সুতরাং স্বয়ং কোরআন মজীদেরই ভাষ্য–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (الكهف ـ

বলে দাও, আমার পরওয়ারদেগারের কালামসমূহের জন্যে (বাণীসমূহকে লেখার জন্যে) সাগর যদি কালিতে পরিণত হয়, তা হলে আমার পরওয়ারদেগারের বাণীগুলো শেষ হওয়ার আগেই সাগর শুকিয়ে যাবে, আরও এ পরিমাণ কালিও যদি আমরা অতিরিক্ত আনিয়ে দেই।

তিরমিযীতে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রেওয়ায়েত করেছেন হারেস আওয়ার–

مررت فى المسجد فاذا الناس يخوضون فى الاحاديث فدخلت على على فاخيرتهب فقال او قد فعلوها ؟ قلت نعم ـ قال اما انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا انما ستكون فتنة ـ قلت فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال كتاب الله فيه بناء ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الوصل لبس بالهزل من جبار قصمة الله ومن ابتغى الهدى فى غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذى لاتزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الا لسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه وهو الذى لم تنته الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرأنا عجبا يحدى الى الرشد فامنابه من قال به صدق من عمل به اجر، ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم خذها اليك يا اعور ـ

আমি মসজিদে ঢুকে দেখলাম, কিছু লোক কোন একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। এমনি সময় হযরত আলী (রাঃ) এলে আমি বিষয়টি সম্পর্কে জানালাম। আলী বললেন, আচ্ছা, তাহলে এসব কথা হচ্ছে! আমি বললাম, জি-হাঁ। তিনি বললেন, মনে রেখো, বিষয়টি আমি হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর কাছে শুনেছি; তিনি বলেছেনঃ শীঘ্রই একটা বিরাট ফেতনা মাথাচাড়া

www.pathagar.com

দিয়ে ওঠবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব। এতে তোমাদের সকল সমস্যার কথাই রয়েছে। যা পরবর্তীকালে আসবে তার সংবাদ রয়েছে। আর যেসব বিষয় তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হবে তার মীমাংসা এতে আছে এবং সেগুলোর দু-একটা অতি মোক্ষম কথা। যে উদ্ধত-অবাধ্য একে বর্জন করবে, আল্লাহ্ তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেবেন। যে লোক এটাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছুকে হেদায়াতের অবলম্বন বানাবে, আল্লাহ্ তাকে গোমরাহ করে দেবেন। আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রশি এটাই। এটাই হেকমতে পরিপূর্ণ গ্রন্থ। এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃষ্ট পথ। এর বর্তমানে রিপুজনিত কামনা-বাসনা কাউকে পথভ্রষ্ট করে না, জিহ্বার স্খলন ঘটে না। জ্ঞানীরা এর পর্যালোচনা করে কখনও তৃপ্ত হন না। যতই পড়, পড়ার কোন শেষ নেই। এর জ্ঞান রহস্য কখনও ফুরাবে না। এর পাঠ শোনার সাথে সাথে জিনরা বলে ওঠেছে, ইন্না সামি'না কোরআনান্ আজাবান্ (আমরা এক আশ্চর্য কোরআন শুনেছি)। এর উদ্ধৃতি সহযোগে যে লোক কথা বলে, সত্য বলে। যে এর ওপর আমল করবে, প্রতিদান পাবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, ন্যায় করবে। যে এর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সরল-সহজ পথের। হে আ'ওয়ার! তুমি এ কথাগুলো ভাল করে আত্মস্থ করে রাখ।

এর যথার্থ ব্যাখ্যা ঃ

ولقد يسرنا القران সম্পর্কে আরেকটি কথা রয়ে গেছে। একদন্ড বিরতি দিয়ে সে বিষয়টির ওপরও চিন্তা করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। যারা কোরআন মজীদকে চিন্তা-ভাবনার বিষয় বলে মনে করেন না, সাধারণত তাঁরা-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

(আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করেছি। তবে আছে কি কেউ, যে এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে?) এ আয়াতটির দ্বারা প্রমাণ উত্থাপন করেন। এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাঁরা বলেন, কোরআন মজীদ একটা সাদাসিধে, সহজ-সরল গ্রন্থ। ওয়ায-নসীহত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এতে একান্ত সহজ ভাষায় বাতলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এর প্রশংসা উপলক্ষে বলেছেন, 'আমি একে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত সহজ

www.pathagar.com

করেছি।' তা হলে এর একেকটি সূরা নিয়ে আট আট বছর যাবত মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন ছিল? আরবী বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে এমন যেকোন লোকই নির্বিঘ্নে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। কেন খামাখা বিভিন্ন রেওয়ায়েত, উদ্ধৃতি, তফসীর, শানে নযুল প্রভৃতি বিষয়ের শরণাপন্ন হতে হবে? এই বিভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশে এখানে সংক্ষেপে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

আয়াতটির যথার্থ মর্ম বলে দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

কোরআন মজীদের সহজবোধ্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশেই এ আয়াতটি উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয়, তারা নিজেরাও আয়াতটির প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে লক্ষ্য করেননি। আয়াতটির যে অর্থ সাধারণভাবে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে, কোরআন মজীদ উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে খুবই সহজ গ্রন্থ। কথাটি স্বস্থানে যথার্থ। কিন্তু এ আয়াতের উদ্দেশ্য তা নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, তফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ ধরনের কিছু কিছু মতও উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে ভুল বুঝাবুঝির উদ্ভব হতে পারে। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন মজীদ মুখস্থ করার জন্যে সহজ। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আয়াতটির ব্যাখ্যায় প্রাচীন মনীষীবৃন্দের এমন উদ্ধৃতির অবতারণাও করা হয়েছে যা প্রকৃত তত্ত্ব-তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু ভাষার দৈন্যের দরুন অধিকাংশ অনুবাদকই আয়াতটির প্রকৃত মর্ম তুলে ধরতে পারেননি। কারণ, অনেক সময় আরবী ভাষায় ছোট একটি শব্দ যে বিপুল ও বিস্তারিত অর্থ ব্যক্ত করে, অন্যান্য বহু ভাষার গোটা একটি বাক্যও তা প্রকাশ করতে পারে না। কাজেই এমন সব ক্ষেত্রে অনুবাদক- বৃন্দকে বাধ্য হয়েই এমন কোন শব্দ বেছে নিতে হয় যাতে মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্যটা ধরে নেয়া যায়।

এ ধরনের একটা জটিলতা আলোচ্য আয়াতেও রয়েছে। অতএব এর দুটি শব্দ يسرنا ও للذكر সম্পর্কে আমরা কোরআন ও আরবী অভিধানের আলোকে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

ব্যাখ্যাতাগণ يسرنا (ইয়াস্সারনা) শব্দটির মর্ম বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ هوناه (একে সহজ করে দিয়েছি) এবং ইবনে যায়েদ بيناه (একে বিকশিত করে দিয়েছি) বলেছেন। অন্য ভাষায় যারা অনুবাদ করেছেন তাঁরা বলেছেন, একে সহজ করে দিয়েছি। কিন্তু পন্ডিত মনীষীরা জানেন, এ সব

৭—

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার কোনটাই এমন নয়, যা এ শব্দটির প্রকৃত মর্ম তুলে ধরতে পারে কিংবা শব্দটির যাবতীয় দিকগুলো নির্দেশ করতে পারে। বেশীর চেয়ে বেশী এটুকু বলা যায় যে, এতে শব্দটির মর্মার্থ মোটামুটি ব্যক্ত হয়েছে।

يسر -এর মূল আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোমলতা ও আনুগত্য। এ থেকেই تيسر যার অর্থ, কোন বস্তুকে কোন উদ্দেশের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী, সুষম, বিন্যস্ত ও অনুকূল করে নেয়া। যেমন, বলা যাবে–يسر الفرس এর অর্থ হবে ঘোড়াটিকে গদি, রেকাব ও লাগাম প্রভৃতিতে সাজিয়ে আরোহণের সম্পূর্ণ উপযোগী করে ফেলেছে।

يسرنا قته للسفر اذا ارحلها ـ ويسر الفرس للغز واذا اسرجه والجمه ـ

আ'রাজ মোআন্নার কবিতা ঃ

قمت اليه با للجام ميسرا هنالك * يجرينى الذى كنت اصنع ـ

আমি আমার ঘোড়াটির দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন সে ছিল লাগাম দ্বারা সম্পূর্ণ তৈরী। এমনি সময়েও আমার সহানুভূতির প্রাপ্য পরিশোধ করল।

অর্থাৎ, যে বস্তুর দ্বারা যে কাজ করার কিংবা যে উদ্দেশ্য সাধন করার থাকে তাকে সে উদ্দেশে এমন উপযোগী ও অনুকূল করে নেয়া, যাতে কেউ তার দ্বারা উদ্দেশ্য আদায় করতে চাইলে উত্তমভাবে তা পেতে পারে। এমনি সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এর চাইতে কোন ভাল ও সহজ পন্থা আর একটিও থাকবে না। এখান থেকেই এ শব্দটিতে 'পারঙ্গম' ও বিচক্ষণ করে তোলার অর্থও সৃষ্টি হয়। মাদাররিস ইবনে রুবাই-এর কবিতা ঃ

ونعين فاعلنا على ما نابه ـ حتى نيسره لفعل السيد ـ

আমাদের নেতাকে যেসব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, আমরা সেগুলোর নিরসনে তাকে সাহায্য করি। এমনকি তাকে নেতৃত্বের কাজের জন্য পারঙ্গম ও বিচক্ষণ করে দেই।

للذكر অর্থ কোন কোন অনুবাদক 'উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে' করেছেন। আবার অনেকে অর্থ করেছেন 'বুঝার জন্যে'। আমাদের মতে দ্বিতীয় অর্থটিই শব্দের প্রকৃত মর্মের সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ। বলতে গেলে মূল শব্দের এটাই যথার্থ প্রতিশব্দ। ذكر (যিকর)-এর প্রকৃত অর্থ স্মরণ করা এবং বর্ণনা করা। কোরআন মজীদে শব্দটি আসমানী গ্রন্থকে বুঝাবার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ (আসমানী গ্রন্থের যারা অধিকারী তাদেরকে জিজ্ঞেস কর)। স্বয়ং কোরআন মজীদের জন্যেও এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنٰهُ (আর এটা হচ্ছে মহিমান্বিত 'যিক্র,' যা আমি অবতীর্ণ করেছি)। তাছাড়া কোরআন মজীদের গুণবাচক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, বলা হয়েছে- وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ যিক্র সম্বলিত কোরআনের কসম।

কোরআনকে ذكر শব্দের দ্বারা বুঝাতে গিয়ে একটি বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি ইংগিত করা উদ্দেশ্য।

আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্‌র শিক্ষা আপাদমস্তক মানব প্রকৃতিরই বর্ণনা ও বিকাশ। আল্লাহ্ আম্বিয়া ও রসূলগণের মাধ্যমে আসমানী গ্রন্থ -পুস্তিকা অবতরণ করে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা এমন কোন বিষয় নয়, যা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়ে থাকবে, বরং তা স্বয়ং মানুষের মনেরই প্রতিধ্বনি, তার আত্মারই সংগীত এবং মানুষের প্রকৃতিরই স্বীকৃতি। আর সেসব মৌলিক বাস্তবতাকেই আল্লাহ্ নবী-রসূলের মাধ্যমে বিকশিত করেছেন। সে কারণেই ইসলামকে বলা হয়েছে প্রকৃতির ধর্ম فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا আর আম্বিয়া (আঃ)-কে مذكر (স্মারক দানকারী) এবং তাঁদের শিক্ষা ও আমন্ত্রণ-আহ্বানকে ذكرى ও تذكير (অর্থাৎ, স্মারক) শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى (অতএব স্মরণ করিয়ে দাও যদিই বা এই স্মারক কোন উপকার সাধন করে)। কারণ, বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্‌র শিক্ষা স্মারক ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম ও আদর্শের এই গোটা ব্যবস্থাটা মানুষের বাইরে থেকে অঙ্কুরিত হয়নি, বরং এর বীজ তাদের প্রকৃতিতেই প্রোথিত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাদের মাধ্যমে তার সেচের ব্যবস্থা করেছেন আর তাতেই সেটা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ভূমি যেমন প্রজনন ও প্রবর্ধনের সমস্ত ক্ষমতা সমৃদ্ধ, কিন্তু বৃষ্টির মুখাপেক্ষী; যা বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে তার সুপ্ত সমৃদ্ধি বিকশিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, তেমনিভাবে মানব প্রকৃতিও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বুদ্ধি-বিবেচনার যাবতীয় গুণাবলীতে ভরপুর। কিন্তু তার বিকাশ ও ফলশ্রুতি একটি আসমানী বৃষ্টির মুখাপেক্ষী। যখন সে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন তার প্রতিটি অংশ স্বর্গের জন্যও ঈর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এ বৃষ্টি না হলে মানব প্রকৃতি একটি মৃত ভূখন্ডের মতই হয়ে পড়ত। নৈতিক ও আত্মিক জীবনের সমস্ত নিদর্শন

www.pathagar.com

থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রয়ে যেত। এই আসমানী বৃষ্টিই হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব কোরআনে হাকীম।

কোরআনের বিভিন্ন নামের মধ্যে تذكره এবং نور এমন দুটি নাম–যা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সেই সত্যটির প্রতি ইঙ্গিত করে, যা ওপরে উল্লেখ করা হল।

تذكره অর্থ হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তার মানে কোরআনে হাকীম আমাদিগকে যাই কিছু শিক্ষা দেয়, তা সম্পূর্ণভাবে আমাদের প্রকৃতি মোতাবেক হওয়ার ফলে এমনভাবে মনে বসে যায়, যাতে মনে হয়, আমাদেরই বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এমন কোন কথাই সে বলছে না যা আমাদের জন্যে অদ্ভুত, বিরল কিংবা স্থূল।

'নূর' অর্থ হচ্ছে 'আলো' বা জ্যোতি। আলো বা জ্যোতি বস্তুকে দর্শনীয় করে তোলে। অন্য কথায় যার অর্থ দাঁড়ায়, মানব প্রকৃতির স্তরের পর স্তর পর্দার অন্তরালে প্রকৃত জ্ঞান ও দর্শনের যে মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ লুকিয়ে আছে, আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্যোতি বিকিরিত হয়ে সেগুলো চোখের সামনে তুলে ধরে।

এই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ذكر শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটাই যাবতীয় জ্ঞান-দর্শনের উৎসমূল। শব্দটি এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের পথ হচ্ছে এই যে, মানুষ সে পাঠগুলোর যথাযথ অনুশীলন করে নেবে, যা তাদেরকে সৃষ্টিলগ্নে পড়ানো হয়েছে, কিন্তু তারা তা ভুলে রয়েছে। 'মারেফাত' বা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ এবং হেকমত বা অভিজ্ঞানের সমস্ত রহস্য আল্লাহ্ আমাদের প্রকৃতির অভ্যন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু আমরা হয় সেগুলো বিস্মৃত হয়ে আছি, না হয় সেগুলো আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে। আমরা সেগুলো স্মরণ করতে অথবা নিজের স্মৃতির সামনে তুলে আনতে চেষ্টা করব। এই হচ্ছে সেগুলোকে ফিরে পাওয়ার পথ। এ কাজে আমাদের সাহায্য করার উদ্দেশে, আমাদেরকে পথ দেখাবার জন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, বিভিন্ন কিতাব নাযিল করেছেন এবং সব শেষে নাযিল করেছেন কোরআন মজীদ, যা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশে সর্বাধিক উপযোগী, সবচেয়ে বেশী কার্যকর এবং সমস্ত গ্রন্থের শেষ গ্রন্থ। এদিক দিয়ে কোরআন মজীদ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সহজ গ্রন্থ। জ্ঞান ও দর্শনের সর্বোচ্চ শীর্ষে আরোহণ করার জন্য এর চাইতে সহজ-সরল পথ দ্বিতীয় একটি নেই। সবচাইতে বেশী নিকটবর্তী, সবচেয়ে বেশী সমতল, সবচেয়ে বেশী নিরাপদ পথ এটাই। অন্যান্য

www.pathagar.com

পথে রয়েছে ভ্রষ্টতা, রয়েছে গোলযোগ, রয়েছে দুর্গম গিরিসংকট, দূরতিক্রম্য সাগর-সমুদ্র, রয়েছে ভয়াবহ মরু-প্রান্তর। কিন্তু কোরআন মজীদের যে পথ, তা সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌছার জন্যে আল্লাহ্ কর্তৃক উন্মোচিত পথ এটাই। সেজন্যে এতে কোনরকম বক্রতা নেই; এটাই সেরাতে মুস্তাকীম। এই হচ্ছে অমর ধর্ম। মানুষের অথবা শয়তানের কোন রকম হস্তক্ষেপই এর সরলতাকে বাঁকিয়ে দিতে পারে না; পারেনি, পারবে না। এ পথ যে অবলম্বন করবে আল্লাহ্র সান্নিধ্য সে পাবেই। কিন্তু এর অর্থ কখনো এই নয় যে, এ পথের পথিক দূরত্ব অতিক্রম করার এবং পাথেয় সাথে নেয়ার যে পরিশ্রম তা থেকেও অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং বিনা পদক্ষেপে, বিনা পরিশ্রমে আপন গন্তব্যস্থানে পৌছে যাবে। এই ত সেদিনও সাগরে পালের নৌকা চলত এবং সাগরের যাত্রীরা জীবনবাজি রেখে এ যাত্রাপথ অতিক্রম করত। এখন সে জায়গাটি দখল করে নিয়েছে বাষ্পীয় জাহাজ। ফলে সামুদ্রিক সফরের অশেষ কষ্টের অনেকটা অবসান হয়েছে। কিন্তু সাগর তবুও সাগরই রয়ে গেছে; ডাঙ্গা হয়নি। এমনি অবস্থা আমাদের আত্মিক ও নৈতিক জগতের। কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা আল্লাহ্র মারেফাতের সাগর যেন পালের নৌকার সাহায্যে পাড়ি দিতাম এবং এ সফরে অসংখ্য ভয়-শঙ্কা, অগণিত বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। কিন্তু কোরআন মজীদ নাযিল করে আল্লাহ্ এ সাগরের জন্যে এমন নৌযান পাঠিয়ে দিলেন, যা উৎকর্ষের সর্বশেষ নির্দশন। সে মহাদেশসমূহের সীমান্তগুলো মিশিয়ে দিয়েছে। সাগরের যাবতীয় ভয়-শঙ্কাকে জয় করে নিয়েছে। উত্তাল তরঙ্গমালা, প্রচন্ড ঝড়-জলোচ্ছ্বাস আর বরফের বিশাল চটানকে পরাজিত করেছে। এসব কিছুই হয়েছে, কিন্তু সাগর আজও সাগরই থেকে গেছে; নিজের বাড়ীর আংগিনা হয়ে যায়নি।

সুতরাং কোরআন মজীদের 'সহজ' হওয়ার অর্থ শুধু এই যে, কোন শিক্ষার্থী যদি এর নির্দেশানুযায়ী প্রকৃত সত্যে পৌছতে চায়, তা হলে আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে সাহায্য পাবে। কারণ, সে যে পথ ধরেছে আল্লাহ্ নিজেই তার উন্মোচন করেছেন। তার চেয়ে সরল-সমতল পথ আর দ্বিতীয়টি নেই। হযরত কাতাদা (রাঃ) هل من مدكر (হাল মিম মুদ্দাকির)-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে নিম্নলিখিত শব্দ সমষ্টিতে এ বাস্তবতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। هل من طالب علم فيعان عليها আছে কি এমন কোন জ্ঞান-সাধক যাকে সাহায্য করা যেতে পারে?

www.pathagar.com

এ তাৎপর্যের প্রতিই তফসীরে কাশ্‌শাফ প্রণেতা এভাবে ইঙ্গিত করেন-

يجوز ان يكون المعنى ولقد هيأناه للذكر من يسر ناقته للسفر اذا رحلها يسر فرسه للغز واذا اسرجه والجمه ـ

অর্থাৎ, এর এ অর্থও হতে পারে যে, আমি যিকর (জ্ঞানার্জন)-এর জন্যে কোরআন মজীদকে উপযোগী করে দিয়েছি। যেমন, প্রচলিত বাগধারা রয়েছে- يسر ناقته للسفر ويسر فرسه (সে উটনীকে সফরের জন্যে এবং ঘোড়াকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য উপযোগী করেছে)।

বিস্তারিত এই বর্ণনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সাধারণভাবে এ আয়াতের যে অর্থ করা হয় এবং তা থেকে যে মর্ম উদ্ধার করা হয়, তা সঠিক বা যথার্থ নয়। যে প্রেক্ষাপটে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করলেও সে বাস্তবতাই প্রকাশ পায়, যে সম্পর্কে আমরা ইংগিত করেছি। আয়াতটি সূরা ক্বামারে বারংবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সূরা ক্বামারে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, কাফেররা আল্লাহ্ তাআলার কেয়ামত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ওয়াদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং দাবী করে যে, আযাব যদি আসারই হয়ে থাকে তা হলে তার একটা নিদর্শন আমাদের কাছে আসুক; আমরা তাকে একটু চোখেই দেখে নিই! তারপরেই না হয় ঈমান আনব। এরই উত্তরে আল্লাহ্ তাআলা বললেন, ইতিপূর্বে বহু জাতি এমনিভাবে আযাব যাঞ্চা করেছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কারণ, আযাবের নিদর্শন দেখার পরেও ঈমান ও হেদায়াতের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে, এই হল ঈমান ও হেদায়াতের পথ। যখন তারা জ্ঞান-বুদ্ধির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল, তখন আর তাদের জন্য ঈমান ও সত্যের লক্ষ্যে পৌছার কোন পথই থাকেনি। বুদ্ধি-বিবেচনা অকেজো করে দেয়ার দরুনই তারা আসমান-যমীনের অসংখ্য নিদর্শনকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অগণিত বিস্ময়কর বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, সীমাহীন অলৌকিক মু'জেযা থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। তা হলে যারা এমনি হাজারো প্রকৃষ্ট বিষয় অস্বীকার করেছে, কেমন করে তারা এটাকে মেনে নেবে? যে সুতীব্র আলোকচ্ছটায় ধাঁধিয়ে যাবার ফলে তারা সেগুলো অস্বীকার করেছিল সে ধাঁধার কারণেই এটাকেও অস্বীকার করবে। এ কারণে আয়াত ও মু'জেযাসমূহের দাবী সম্পূর্ণ নিরর্থক। তারা যদি ঈমান গ্রহণ করতে চায় আর এ ওয়াদা যদি শুধু

www.pathagar.com

উপহাস-কৌতুক না হয়ে সত্যিকারভাবে তাদের মনের স্বীকৃতি হয়, তা হলে জ্ঞান-বিবেচনার পথই গ্রহণ করে নিক। জ্ঞান অর্জনের জন্যে আমি কোরআন মজীদকে পূর্ণাংগ ও উপযোগী করেছি। তাতে যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান রয়েছে। প্রতিটি সন্দেহ-সংশয়ের মীমাংসা রয়েছে। প্রতিটি মানসিক ব্যাকুলতার সান্ত্বনা রয়েছে। একে গ্রহণ করলেই সে প্রতিটি লক্ষ্যে পথ প্রদর্শন করবে, প্রতিটি জটিলতার সমাধান দেবে।

সহজতার কয়েকটি দিক ঃ

'তাইসীর' ব সহজতার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবার পর এবার লক্ষ্য করা যেতে পারে, আল্লাহ্‌রাব্বুল আলামীন কোরআনকে জ্ঞান ও মারেফাত কিংবা আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভের জন্য কতভাবে উপযোগী করেছেন।

১. এ প্রসংগে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে কোরআন মজীদের প্রকৃষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া। আল্লাহ্ কোরআন মজীদের এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একাধিক জায়গায় আলোচনা করেছেন। সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

আমি কোরআনকে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি।

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ـ

(এমন গ্রন্থ, যার নিদর্শনগুলোকে আরবী কোরআন আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।) وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (আর এটা প্রকৃষ্ট আরবী ভাষা।)

— (সূরা নাহ্‌ল)

কোরআনের সর্বপ্রথম লক্ষ্য ছিল আরবরা। তাদের জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল কোরআনের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া। তা না হলে কোরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়া তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হত। তখন এই প্রশ্ন হতে পারত, কোরআন মজীদকে তাদের জন্য পরিপূর্ণভাবে খুলে দেয়া হয়নি। কারণ, তার ভাষা আজমী অথচ তারা হল আরব, আরবী আর আজমীর কি সম্পর্ক? সূরা ফুসসিলাতে বর্ণিত হয়েছে-

لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ

(তারা আপত্তি উথাপন করত যে, কোরআনের আয়াতগুলেকে কেন খুলে দেয়া হল না? ভাষণ আজমী ভাষায়, অথচ শ্রোতা আরবী!) সে জন্যেই কোরআন

www.pathagar.com

আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাও এমন আরবী যা 'মুবীন' বা প্রকৃষ্ট। সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোন রকমের জটিলতা নেই। যেকোন শ্রেণীর লোক অতি সহজে বুঝতে পারে। কোন সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা নেই; কোন গোত্র, কোন দল কিংবা কোন শ্রেণীর বর্ণনারীতি, শব্দ, বাগধারার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত নয়, বরং আরবের ভাষাবিদদের যে রীতি, কোরআন সেভাবেই অবতীর্ণ। যা সবাই বুঝতে পারত, যার বাগ্মিতা সম্পর্কে সবাই ছিল একমত। সুতরাং কোরআনের আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়াটা আরবদের হিসেবে অত্যন্ত প্রকৃষ্ট ও সহজ ছিল। কোন কোন আয়াতে এরও ব্যাখ্যা রয়েছে। বলা হয়েছে-

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ . وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا .

অর্থাৎ, আমি তাকে উপযোগী বানিয়েছি তোমাদের ভাষায়, যাতে তোমরা তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে সুসংবাদ এবং হটকারীদেরকে অবহিত করে দিতে পার। সূরা জাসিয়ার এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

আর আমি তাকে তোমার রসনায় সুদৃঢ় করেছি, যাতে তারা স্মারক গ্রহণ করে।

কেউ হয়ত বলতে পারে, এই সহজবোধ্যতা আরবদের জন্যে হয়েছে আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়ায়; অনারব আজমীদের তাতে কি ফায়দা হল? প্রশ্নটি যথার্থ। এই تيسر বা সহজীকরণের ব্যাপারটি বিশেষ করে আরবদের সাথেই যুক্ত, যারা কোরআনের প্রাথমিক শ্রোতা বা লক্ষ্য এবং যাদেরকে আল্লাহ্ অন্যান্য জাতিসমূহের হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, কোরআনের আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে تيسير সহজীকরণ-এর সাধারণ দিকটিও রয়েছে। এর বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, কোরআন মজীদের পক্ষে যেকোন দেশে অথবা যেকোন একটা জাতিতে কোন একটা বিশেষ ভাষায় অবতীর্ণ হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী; অপরিহার্য। সরাসরি পৃথিবীর সমস্ত জাতির প্রতি এবং প্রচলিত সমস্ত ভাষায় অবতীর্ণ হওয়াটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এমন হওয়াটা গোটা পৃথিবীর জন্য মঙ্গলকরও হত না। ইসলাম একটা বিশ্বজনীন একত্ববাদের আমন্ত্রণ জানায়। এতদুদ্দেশেই পৃথিবীর জন্য সর্বশেষ যে বিধান, যে বাণী, যে আহবান ঘোষণা

www.pathagar.com

করা হবে তার কেন্দ্র কোন একটা জাতি, কোন একটা স্থান, কোন একটা সত্তা এবং কোন একটা ভাষাকে করাই ছিল জরুরী। আল্লাহ্‌র অভিজ্ঞান জাতিসমূহের মধ্যে বনী ইসরাঈলকে, স্থানসমূহের মধ্যে ইবরাহীমের আবাসভূমিকে, লোকসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আবুল্লাহ্ (সঃ)-কে, ভাষাসমূহের মধ্যে প্রকৃষ্ট আরবী ভাষাকে নির্বাচিত করেছে। বস্তুত আজকের বিশ্ব এই সত্য অস্বীকার করতে পারে যে, এই নির্বাচন ছিল একান্ত উত্তম নির্বাচন। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য, হেকমতের ধারা ও মর্ম এবং আলমে গায়েব (অদৃশ জগতের) গোপন রহস্য বর্ণনা করার জন্যে আরবী ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা এমন উপযোগী হতে পারত না। কাজেই কোরআনের আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়া যেমন আরবদের জন্যে রহমত বা অনুগ্রহ ছিল, তেমনিভাবে কোন কোন দিকের প্রেক্ষিতে গোটা বিশ্বের জন্যেই রহমত বটে।

২. تيسر বা সহজীকরণের দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, কোরআন মজীদের অল্প অল্প করে নাযিল হওয়া। যদি গোটা কোরআন মজীদ একবারে নাযিল হয়ে যেত, তা হলে তার শিক্ষাসমূহ মানব মনে বদ্ধমূল হতে পারত না। অতি গভীর বিষয়সমূহ তখনই মনের গভীরে শিকড় গেড়ে নিতে পারে, যখন তা ধীরে ধীরে পাঠ করে শেখানো হয়। তেমনিভাবে তা মন-মস্তিষ্কে পরিপূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করে এবং একেকটা বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপক্বতা লাভ করে। আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদের ব্যাপারে তাই করেছেন। তাকে একবারে নাযিল করেননি; বরং ধীরে ধীরে, সময় ও অবস্থার তাগিদ অনুসারে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন। আর যখন কাফেররা প্রশ্ন তুলেছে যে, কোরআনও তওরাতেরই মত একবারেই নাযিল হয়ে যায় না কেন; অল্প অল্প করে কেন অবতীর্ণ হচ্ছে? তখন তাদের উত্তরে বলা হয়েছে —

ذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ـ (فرقان)

এমন হওয়ার কারণ হল, এভাবে আমি তোমাদের অন্তরকে দৃঢ় করে নিই এবং কোরআনকে থেমে থেমে অবতীর্ণ করি।

সূরা বনী ইসরাঈলের এক আয়াতে বলা হয়েছে —

لِتَقْرَأَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ ـ

যাতে তুমি এটা মানুষকে থেমে থেমে শুনাতে পার।

www.pathagar.com

প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, ذكر তথা জ্ঞানার্জনের সবচাইতে সহজ এবং যথার্থ পদ্ধতি এটাই। আর সেজন্যেই কোরআন মজীদেও সে পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে।

৩. সূরা হূদের শুরুতে কোরআন মজীদের সহজীকরণ বিষয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক এভাবে বর্ণনা করেছেন—

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ -

(এটা) এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহকে পূর্বাহ্নে সুগঠিত করা হয়েছে। অতপর একজন অভিজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, কোরআন মজীদ প্রথমে ঈমান ও ধর্মের মৌলনীতিসমূহের শিক্ষা দিয়েছে। অতঃপর দিয়েছে আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ। শিক্ষাদানের এই পদ্ধতি মানব প্রকৃতির জন্য সর্বাধিক অনুকূল। সেজন্য কোরআনও এ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতে ধর্মের সমস্ত মৌলিক নীতিসমূহের শিক্ষা, তওহীদ, রেসালাত, আখেরাত প্রভৃতি বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে এবং ব্যাপক বাক্যের মাধ্যমে বলা হয়েছে। তখন এগুলোর সবিস্তার বিশ্লেষণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। এসব মৌলিক নীতিমালা মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার পরে এর আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় এবং মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে সেগুলোর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একান্ত মানব প্রকৃতির জন্যে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য এবং ধর্মীয় বিধানসমূহের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ অতি উত্তমভাবে প্রকাশ করার মত করে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ কারণে এটাও সহজীকরণের অন্তর্ভুক্ত।

৪. تيسير বা সহজীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, একই বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলা, যাতে সে বিষয়টি উত্তমভাবে শ্রোতাদের মনে বসে যায়। কোরআন মজীদের পরিভাষায় একে تصريف ايات বলা হয়। কোরআন এ বিষয়টি একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছে। সূরা আনআমের এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ

লক্ষ্য কর, আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের প্রমাণগুলোকে কেমন করে বর্ণনা করি। তবুও তারা বিমুখতা অবলম্বন করে।

www.pathagar.com

(انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون (انعام লক্ষ্য কর, কেমন করে আমি আমার দলিল-প্রমাণসমূহকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি, যাতে করে তারা উপলব্ধি করে।

কোরআনের গবেষণা ও পর্যালোচনা দ্বারা تصريف ايات (তাসরীফে আয়াত) -এর এ অর্থ বুঝা যায় যে, কোন কোন সময় একই বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে বর্ণনা করা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করাই 'তাসরীফে আয়াত'। আয়াতে কোরআনের ক্ষেত্রে শব্দটি تصريف رياح (তাসরীফে রিয়াহ্) থেকে নেয়া হয়েছে। তাহলে 'তাসরীফে রিয়াহ্'-এর তাৎপর্যটা কি? বায়ু একই, কিন্তু তার রূপধারণের কোন শেষ নেই। কখনও করুণা, কখনও শান্তি, কখনও মৃদুমন্দ চলে আর কাননে ফুল ফুটায়, ক্ষেতে ফসল পাকায়। কখনও লু হয়ে দেখা দেয় এবং পুষ্পোদ্যান আর শস্যভূমিকে ঊষর মরুভূমিতে পরিণত করে চলে যায়। কখনও মেঘমালাকে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে আসে, যাতে খরাতপ্ত যমীন পানিতে থৈ থৈ করতে থাকে, কখনও সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় আর তাতেই কৃষকের, সাধারণ মানুষের তথা পৃথিবীবাসীর জন্যে থাকে অসংখ্য কল্যাণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত, আবার বছরের বিভিন্ন মাসে না জানি সে কতভাবে রূপ বদলায়! তার প্রতিটি রূপবদলই সৃষ্টি জগতের জীবন ও তার প্রবৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন। কখনও সে হয় উষ্ণ, কখনও শীতল, কখনও শুষ্ক, কখনও আর্দ্র। কখনও প্রচন্ড ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণির ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, কখনও প্রভাতীর মনোহারী সৌরভ হয়ে। পরওয়ারদেগারে আলম বায়ুর এই বিবর্তনের কথা বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। সূরা জারিয়াত ও সূরা মুরসালাতে তার এই বিবর্তন-বিস্ময়ের শপথও নিয়েছেন।

হুবহু এমনি অবস্থা কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহেরও। কোন কোন সময় একই আয়াত এত বিবিধ দিক সংরক্ষণ করে যে, তার সবগুলো বক্তব্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর একই বিষয় বা বক্তব্য এত বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে যা গুনে শেষ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একে কোরআন মজীদ تصريف -(তাসরীফ) বা বিবর্তন শব্দে প্রকাশ করেছে। এর একটা উদাহরণ দেয়া বাঞ্ছনীয়। সূরা আরাফের এক জায়গায় বৃষ্টির উদাহরণ দিয়েছেন ঃ

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ -

আর তিনিই (সে সত্তা) যিনি বায়ুগুলোকে স্বীয় রহমতের পূর্বে পাঠান সুসংবাদ বানিয়ে।

আর বৃষ্টির এই একটা উদাহরণেই নিম্নোক্ত তিনটি বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১. আশা-নিরাশায় শুধু আল্লাহ্কেই স্মরণ করা উচিত। তাঁর থেকে কখনও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তাঁর রহমত বা করুণা সর্বক্ষণ মানুষের অতি নিকটে। কখনও দেখা যায়, দীর্ঘ দিন বৃষ্টি হচ্ছে না। সারা শস্যক্ষেত্র জ্বলে যাচ্ছে; আকাশের দিকে তাকালে বৃষ্টির চিহ্নটি দেখা যায় না, হঠাৎ কোনখান থেকে ভেসে আসে একটা ছোট্ট মেঘখন্ড মুহূর্তে চারদিকে পানি থৈ থৈ করতে থাকে আর সমস্ত নিরাশা আশায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে ঃ

اُدْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

আশা হোক, নিরাশা হোক, যেকোন অবস্থায় তাঁকেই ডাক। আল্লাহ্র রহমত তাঁর বান্দাদের নিকটেই রয়েছে।

২. কেয়ামতে যারা অবিশ্বাসী তারা অবাক যে, এটা কেমন করে হবে। মানুষ যখন পচে-গলে যাবে সে আবার কবর থেকে ওঠে আসবে! অথচ এতে এতটুকুও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা অহরহ এরূপ প্রত্যক্ষ করি। গোটা শস্যক্ষেত্র জ্বলে-পুড়ে গেছে, ঘাসের একটা কুটোও কোথাও নজরে পড়ে না। এমনি সময় হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে যায়, আর কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায়, সমগ্র ভূমিতলে শ্যামল বনাত বিছিয়ে গেছে।

كَذٰلِكَ سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى -

আমি এই মেঘমালাকে কোন শুষ্ক ভূমির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই এবং সেখানে পানি বর্ষাই। তারপর তা থেকে সৃষ্টি করে দেই সব রকমের ফল। এভাবেই মৃতকেও তুলে দাঁড় করাব।

বৃষ্টি হয় যমীনের সব অংশেই, কিন্তু তার ফলাফল ও ক্রিয়া সব জায়গায় একই রকম হয় না। পাঠকবৃন্দ হয়ত দেখে থাকবেন, যে ভূমি উর্বর ছিল, বৃষ্টির সাথে সাথে সেগুলো আপন বুকে লুকিয়ে রাখা সমস্ত ভান্ডার উজাড় করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। আর যে যমীন ছিল লোনাযুক্ত, তাতে হয় কোন কিছু গজালই না, আর যদি গজিয়ে থাকেও তা এমন বস্তু নয়, মানুষ যার ফল-ফসল খাবে। বরং এমন জিনিসই সে বের করল যাতে মানুষকে দুঃখই পোহাতে হবে। এমন অবস্থা আকাশের আধ্যাত্মিক বৃষ্টিরও। যমীনের মওসুমের মতই তারও একটা মওসুম আসে। আর সে মওসুমে আল্লাহ্ আসমান থেকে হেদায়াত অবতীর্ণ করেন যার আবেদন সাধারণভাবে সবারই জন্যে হয়ে থাকে, কিন্তু তার কল্যাণ সবাই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারেই প্রাপ্ত হয়। যার প্রকৃতি সৎ, সে ত এই বৃষ্টিতে যথার্থ আশীর্বাদ লাভ করে, কিন্তু যে লোক সৎপথ ভ্রষ্ট, এ বৃষ্টিতে তার সে ভ্রষ্টতায় স্ফীতি ঘটে। সুতরাং–

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ـ

যে ভূমি উর্বর আল্লাহ্র কৃপায় তার চারা যথেষ্ট পরিমাণে গজায়। আর যে জমি খারাপ তাতে খুব কমই গজায়।

লক্ষ্য করার বিষয়, বৃষ্টির একটিমাত্র উদাহরণে কেমন সব তাৎপর্য বেরিয়ে এসেছে। এসব ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত করার পর এরশাদ হচ্ছে—

كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ

এমনি করে আমি আমার নিদর্শনসমূহকে বিবর্তিত করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা প্রকারে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ লোকের জন্য।

এই বিবর্তনের সম্পর্ক কোরআনের শিক্ষা কিংবা তার সহজবোধ্যতায় একান্ত পরিষ্কার। এ ব্যাপরে কোন বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই বিবর্তন সম্পর্কে কোরআন মজীদের নিজের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তার অর্থ হচ্ছে, লোকেরা যাতে বুঝে এবং স্মরণ করে সে জন্যেই এমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করা। বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ـ

আর আমি এই কোরআনে আমার প্রমাণগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করেছি, যাতে মানুষ স্মারক গ্রহণ করে। কিন্তু এ বিষয়টি তাদের ঘৃণাই বৃদ্ধি করেছে। আরো বলা হয়েছে–

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ـ

www.pathagar.com

লক্ষ্য কর, আমি কেমন করে নিজের নিদর্শনগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি, যাতে করে মানুষ বুঝে।

কোরআনের সহজীকরণের কয়েকটি দিক বর্ণিত হল। এগুলো ছাড়া আরও বহু বিষয় রয়েছে, যা কোরআন মজীদের ভেতর থেকে আহরণ করে নিয়ে তুলে দেয়া যেত, কিন্তু এর চাইতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এটা উপযুক্ত স্থান নয়।

যা হোক, বর্ণিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 'তাইসীরের' আয়াত দ্বারা সাধারণভাবে যে অর্থ নেয়া হয়, তা সঠিক নয়। জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, বইটি জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান লেখার জন্য অত্যন্ত সহজ, তবে তার অর্থ এই নয় যে, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আদপেই এখন আর কোন জটিলতা রইল না। বরং এর অর্থ হবে এই যে, এসব বিষয় শিক্ষাদানের উদ্দেশে ভালর চেয়ে ভাল যে পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারত, এ গ্রন্থটি সেসব নিয়ম-পদ্ধতিতে প্রণীত। এমনিভাবে কোরআন মজীদ সম্পর্কে যে কথাটি বলা হয়েছে, তা 'যিক্‌র' অর্থাৎ জ্ঞানার্জন, উপদেশ ও প্রমাণ গ্রহণের জন্যে অত্যন্ত সহজ। তার অর্থ এই নয় যে, এতে ধর্মীয় জ্ঞান র্জনের জন্য চিন্তা-ভাবনা; গবেষণা-পর্যালোচনার যেসব চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, তা আর রইল না। বরং এর মর্ম হচ্ছে, এই মহান জ্ঞান অর্জন করার জন্যে এমন একটি গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটেছে যা সর্বোত্তম নিয়ম-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধর্মের নিগূঢ় তাৎপর্য, তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ শিক্ষা দেয়।

কোরআন মজীদ সম্পর্কে পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা যে মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করেছি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইমাম মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ)-এরই কতিপয় সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের বিশ্লেষণ। নিম্নে মাওলানার মতামত স্বয়ং তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করে দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করছি। তিনি বলেনঃ

১. কোরআন পাক এমন একটা কালাম, যাকে নিতান্ত খোলা এবং সহজ বলা যায়, আবার অত্যন্ত কঠিন এবং প্রচ্ছন্নও বলা যায়। আল্লাহ্‌ পাককেই দেখুন, আমরা সবাই তাঁকে জানি। আবার কেউই তাঁকে জানি না। নিজেকেই একবার ভাবুন; অন্য কোন কিছুতে সন্দেহ হতেও পারে, নিজের অস্তিত্বে তো আর সন্দেহের অবকাশ নেই? কিন্তু তথাপি লক্ষ্য করার বিষয়, আমরা নিজেকে কতটুকু জানি? তাই গালেব বলেছেনঃ

www.pathagar.com

"হাম ওহাঁ হাঁয় জাহাঁ সে হামকো

কভী কুচ্ হামারী খবর নাহী আতী!"

আমরা এমন এক স্তরে অবস্থান করছি, যেখান থেকে আমাদের নিজেদের কাছেই কোন খবর আসে না।

কোরআন নিজেও নিজেকে অত্যন্ত খোলা ও সহজ বলে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে অতি গম্ভীর এবং আবৃত। এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে বলেন, তিনি যাহের এবং বাতেনও বটে।

২. বলাবাহুল্য, দুটি স্ববিরোধী বর্ণনা যদি একই ক্ষেত্রে বলা হয়, তখন অবশ্যই এ দুটি বিপরীত বিষয়ের সম্মিলন দুটি বিভিন্ন দিক দিয়ে হবে। অতএব, কোরআন মজীদের সহজ এবং কঠিন উভয়টির নিশ্চয়ই দু'টি হিসাব থাকবে। কাজেই প্রয়োজনীয় ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটি যথেষ্ট সহজ। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা এবং সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন। এমন হওয়াই যথার্থ। কারণ, যারা উচ্চতর অগ্রগতির যোগ্যতায় পৌঁছুতে পারেনি, তাদের জন্য সেসব সূক্ষ্ম ও উচ্চতর বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেয়া হলেও তারা না কিছু বুঝবে, না তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। বরং তাদের উপকৃত হওয়ার যে যোগ্যতা, তাতে আরও ক্ষতি সাধিত হবে। কারণ, দ্বীনের পথ হচ্ছে এক অসীম রহস্য জগতে পরিভ্রমণ। বস্তুত রহস্য জগতে ভ্রমণ করা যায় নিবিষ্ট চিন্তা-গবেষণার দ্বারা। কোন লোক যে বিষয়টি গভীর চিন্তা-গবেষণার দ্বারা অর্জন করতে পারে, যদি তা পূর্বাহ্নেই বলে দেয়া হয়, তা হলে তার চিন্তা বা গবেষণাশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সেই বলে দেয়া বিষয়টিও সে সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারবে না– যেমনটি হওয়া উচিত। তদুপরি পরবর্তী অগ্রগতি থেকেও সে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। সেজন্যেই আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার জিন্দেগীতে চেষ্টাকে অত্যন্ত জরুরী সাব্যস্ত করেছেন, যাতে মানুষ তার উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় শিক্ষা কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়বে। 'কারণ, মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তি অকেজো হয়ে গেলে জ্ঞান নিষ্ফল হয়ে যাবে। এতো হলো বাহ্যিক জ্ঞানের কথা। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে এর চাইতে আরও কিছুটা বেশী মনে করা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে 'জানা' তারই নাম যাকে 'হওয়া' বলা হয়। ভাল-মন্দ জানবে অথচ আগ্রহ বা ঘৃণা সৃষ্টি হবে না, এ জানা ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোন দার্শনিকও যদি শুধুমাত্র নামের দার্শনিক না

www.pathagar.com

হয়, তবে এমনি জানা জানে। শীর্ষস্থানীয় গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতও ছিল তাই। তিনি পাপ এবং মূর্খতাকে সমার্থক বলতেন।

৩. বস্তুত আল্লাহ্ তাআলার যে অভিজ্ঞান বা হেকমতের ওপর মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভরশীল, সে অনুযায়ী কোরআনকে চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র বলা হয়েছে এবং যাহেরকে বাতেনের ওপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রাথমিক নেয়ামতসমূহ দান করেই চূড়ান্ত নেয়ামতসমূহের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। অতপর আমরা যতই চেষ্টা করতে থাকি, সে অনুপাতে সেই নেয়ামতসমূহের অধিকারী হতে থাকি। আর ন্যায়সঙ্গতও তাই। তা না হলে মর্যাদার পার্থক্য কেন? অতএব, এমনিভাবে কোরআন অনুধাবন করার ব্যাপারেও মানুষ যতই উন্নতি করতে থাকবে, ততই তার সামনে রহস্যের একের পর এক দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকবে। আর এভাবে প্রকৃষ্টরূপে সে তা অনুধাবন করতে এবং মেনে নিতে বাধ্য হবে। বস্তুত একথা বলাই যথার্থ যে, কোরআন তার সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও যথেষ্ট প্রকৃষ্ট ও সহজ। পক্ষান্তরে তার গোপনীয় হওয়াটা শুধু এজন্যে যে, আমরা এখনও বহু পেছনে পড়ে আছি। কাজেই স্বয়ং কোরআন আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেঃ "যারা আলো গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য আলোকে বাড়িয়ে দেন।" সাধারণ শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের বেলায়ও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। লেখা যতই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হোক অ-আ-ক-খ পড়ুয়াদের জন্য তাই নিতান্ত জটিল হয়ে থাকে। কিন্তু একজন বিজ্ঞ পন্ডিতের জন্য তা জটিল বলাটা নিতান্তই অন্যায়। কোরআনও নিজের গুণ বর্ণনা প্রসংগে তার গভীরতা ও গোপনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। গ্রন্থের ললাট দেশেই এমন তিনটি অক্ষর লেখে দেয়া হয়েছে, যার অর্থ এত চেষ্টা সত্ত্বেও অদ্যাবধি প্রকাশ পায়নি। এই তাৎপর্যপূর্ণ পথের পহেলা পদক্ষেপেই যেন এই শিরোনাম লাগিয়ে দেয়া হয়েছে,- আর তাকে শুধু প্রথমে লাগানো হয়েছে তাই নয়, বরং আরো জায়গায় যতি ক্ষেত্রের মাথায় একই লেখা টাংগিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে পথিক ঘটনাচক্রে এক জায়গায় ভুল করে ফেললেও অন্য জায়গায় স্মরণ করে নিতে পারে।

৪. কোরআন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এই সাগর থেকে আপন আপন পাত্র অনুযায়ী পানি ভরে নাও। গোটা সাগর লোটায় ভরে নেয়ার লোভ করো না। সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়টি ভাল করেই জানতেন ও বুঝতেন। কোথাও কোন কিছু বোধগম্য না হলে অনর্থক তার পেছনে জড়িয়ে পড়তেন না।

www.pathagar.com

কারণ, হেদায়াতের জন্য যতটা প্রয়োজন কোরআনের সে অংশটুকু অত্যন্ত প্রকৃষ্ট ছিল।

সাগর পাড়ি দিয়ে তারা নিজের লক্ষ্যে পৌছতেন ঠিকই, কিন্তু গোটা সাগরের রহস্য উদঘাটন করতে যেতেন না। তাঁরা তাকে সীমাহীন এবং অনন্তই মনে করতেন। অবশ্য প্রত্যেকেই নিজের মেধা ও মস্তিষ্কের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী তা থেকে নির্যাস বের করে নিতেন। আর সাধারণ রাজপথের দু'পাশে যে মনোরম দ্বীপমালা পড়েছিল, তাঁরা সেগুলোই আবিষ্কার করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-"এ সাগরের বিস্ময় কখনও শেষ হবার নয়।"

৫. যারা কোরআনকে একটা সাধারণ কালাম বলে ধারণা করে এবং নিজের যোগ্যতা তার চাইতে বেশী মনে করে, তারা ভাবে, কোরআন অনুধাবন করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, তারা কোরআনের মর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত থেকে যায়। তাদের অনেকে নিজের বক্র বুদ্ধিকে আপত্তি উত্থাপন বা প্রশ্ন বলে অভিহিত করে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা কোরআন কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছেন, তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী একে অনুধাবন করার জন্য প্রাথমিক বিষয়টি হচ্ছে, একে একটা উন্নত মানের কালাম বলে মেনে নিতে হবে। কোরআন পাক নিজেও নিজের সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে এ কথাই বলেছে যে, যারা অস্বীকার করে তারা একে কখনও অনুধাবন করতে পারে না। হযরত ঈসা (আঃ)-কে যখন তাঁর জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন যে, উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেন কেন? তখন তিনি বলেছিলেন, "যাতে বিষয়টি অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা শুনেও শুনে না, দেখেও দেখে না।" কোরআন নিজের ব্যাপারে বলেছে– "এতে অসদাচারীদের অসদাচরণ আরও বেড়ে যায়।" অতএব সব সময়ই এমনি হয়ে এসেছে। যারাই সত্যকে মেনে নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন এবং সত্য পথে চলতে শুরু করেছেন; এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। কিন্তু যারা গড়িমসি করেছে, তারা উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছুতে পারেনি। আর যারা বিমুখতা অবলম্বন করেছে, তারা সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ, তারা যে বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তিকে প্রতিটি কাজে নিজেদের পথপ্রদর্শক সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সে বুদ্ধিই তাদেরকে যখন সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, তখন তারা তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে বলেছে, এই

www.pathagar.com

কালামটিতে জাদু রয়েছে। ফলে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। বস্তুত তারা বুদ্ধির ওপর নিজেদের কামনা-বাসনাকে স্থান দিয়েছে এবং অহেতুক সন্দেহ দাঁড় করিয়ে নানারকম ছল-চাতুরীর পথ অবলম্বন করেছে, যাতে নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর একটা আবরণ দিয়ে দিতে পারে। কারণ, প্রকৃতি অন্ধকারকে সদাই ঘৃণা করে। সুতরাং তারা যখন বুদ্ধির চোখে এভাবে পট্টি বেঁধে দিয়েছে, তখন বলাই বাহুল্য, যা-ও এক-আধটু আলো বেঁচেছিল, তাও হারিয়ে বসল। এই অবস্থাটিই কোরআন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে। তা ছাড়া ইঞ্জীলেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। —(সূরা ইখলাসের তাফসীরের ভূমিকা)

যাকে সম্বোধন করা হয় তার সম্বোধনের ভিত্তিতে কোরআনের জটিলতা ঃ

আলোচনার শুরুতেই আমরা লেখেছি, কোন একটি বক্তব্য কারো জন্য খুবই সহজ এবং কারো জন্য খুবই জটিল হতে পারে। কোরআন মজীদের ক্ষেত্রে এদিক দিয়েও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আমলের মুসলমানদের জন্যে কোরআন মজীদ ছিল যথেষ্ট সহজবোধ্য। কিন্তু সে সহজবোধ্যতা পরবর্তী যুগের লোকদের জন্যে রয়নি। কারণ, তারা নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী, আপন যুগের প্রচলিত নিয়ম-রীতি এবং নিজের জাতির বিশ্বাস ও কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। কোরআন যেকোন বিষয়ে যেকোন ইশারা-ইঙ্গিত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা তা বুঝে নিতে পারতেন। এমনকি সেসব আয়াতসমূহ বুঝতেও তাঁদের কোন জটিলতার সম্মুখীন হতে হত না, যাতে কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে ও সূক্ষ্ম ইশারা বা ইঙ্গিত করা হত। কোন একটি আয়াত অবতীর্ণ হল আর তার কোন একটা শব্দে তাঁরা কোন বিশেষ ইঙ্গিত-সংকেতের গন্ধ পেলেন কি না পেলেন, সাথে সাথে তার যথার্থ লক্ষ্যের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে দিতেন এবং উদ্দেশের গভীরতা পর্যন্ত এমনভাবে পৌঁছে যেতেন যেন রাখাঢাকা কোন বিষয়ই ছিল না। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। কোরআন মজীদের বহু আয়াত আছে, যাতে আবু লাহাব সম্পর্কে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেসব আয়াতে যে ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার প্রতি সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি যত সহজে পড়তে পারত, তত সহজে আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হতে পারে না। তাঁরা আকার-অবয়ব সম্পর্কে ভাল করে জানতেন বলে

www.pathagar.com

অদৃশ্য রসনা থেকে কোন একটি কথা নিঃসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বিঘ্নে তার উদ্দেশ্য বুঝে নিতেন। কোন কোন আয়াতে সাহাবাদের কারো কোন বিশেষ প্রশংসা অথবা কারো কোন বিশেষ কাজের নিন্দা করা হলে তা কোরআন অবতরণকালের লোকেরা যত সহজে ধরে নিতে পারতেন, পরবর্তী শতাব্দীসমূহের লোকদের পক্ষে সে বিষয়টি যে তত সহজে ধরে নেয়া সম্ভব নয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমল-আকীদার ব্যাপারটিও একই রকম। কোরআন মজীদে এমন একটি সূরাও হয়ত নেই, যাতে সেযুগের বিশ্বাস কিংবা কাজ-কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু যেভাবে প্রসিদ্ধ কোন বিষয় বর্ণনা করা হয়, তেমনি সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে; বিস্তারিত বর্ণনারীতি তাতে অবলম্বন করা হয়নি। যেমন, সূরা আনআমে আরবদের কোন কোন কাজ বা আমল ও বিশ্বাস বা আকীদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ
بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ
لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ
مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ـ
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ـ وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ
حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ
لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ـ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ـ
وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا
وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ ـ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ـ
قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ
قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ـ (١٣٧ -- ١٤١ انعام)

আর তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ফসল ও চতুষ্পদ পশুসমূহের মধ্যে একটা অংশ সাব্যস্ত করল এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলল, এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্যে আর এটা আমাদের (অন্যান্য) অংশীদারদের জন্যে। বস্তুত যে অংশটি তাদের অংশীদারদের জন্যে সাব্যস্ত তা আল্লাহ্ পেতে পারেন না, আর যে অংশটি

www.pathagar.com

আল্লাহ্র জন্যে তা তাদের অংশীদাররা পেতে পারে। কি যে মন্দ সিদ্ধান্ত! তেমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের অংশীদাররা তাদের সন্তানদের-কে হত্যা করার বিষয়টিকে উত্তম করে দেখিয়েছে, যাতে তাদেরকে ধ্বংসে পতিত করা যায় এবং যাতে তাদের ধর্মকে তাদের কাছে সন্দিগ্ধ করে তোলা যায়। আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তা হলে তারা এমনটি করতে পারত না। সুতরাং তাদের এবং তাদের নিন্দাবাদ ছেড়ে দাও। আর তারা বলে, এই চতুষ্পদ এবং ফসল অস্পৃশ্য; এগুলো খেতে পারবে না, কিন্তু আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে তা স্বতন্ত্র কথা। নিজেদের ধারণা অনুযায়ী আরও কিছু চতুষ্পদ জীব রয়েছে, সেগুলোর পিঠ হারাম এবং কিছু চতুষ্পদ রয়েছে, যাতে আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় না, আল্লাহ্র প্রতি নিন্দাচ্ছলে। আল্লাহ্ তাদের নিন্দাবাদের শীঘ্রই তাদেরকে প্রতিফল দেবেন। আর তারা বলে, এই চতুষ্পদের পেটে যে বাচ্চাটি রয়েছে, তা পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত জন্মায়, তা হলে তারা তাতে সমান সমান অংশীদার হবে। আল্লাহ শীঘ্রই তাদেরকে (স্বকল্পিত) বিশ্লেষণের বদলা দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি অভিজ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞানী। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা বোকামির দরুন কোন রকম জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াই নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহ্র প্রতি বিদ্বেষবশত হারাম করেছে। এরা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে; সরল পথে নেই।

এ আয়াতগুলোতে কিছু কাল্পনিকতা ও কুসংস্কারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর বর্ণনাভঙ্গি সংক্ষিপ্ত ও ইংগিতপূর্ণ। এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, যাদেরকে এই কাহিনী শোনানো হচ্ছে তারা সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। কাজেই ভাষালংকারের দাবী ছিল যেন এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া না হয়। কিন্তু পরবর্তীদের জন্যে, যারা সে যুগটি শেষ হয়ে যাবার পর এসেছে, ঐসব সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত যথাযথ বুঝে ওঠা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। সে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে তাদের মনে বহু প্রশ্ন দেখা দেবে, যার উত্তর দিতে গিয়ে সে যুগের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া অপরিহার্য।

ব্যাপারটি আরও একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নেয়া যায়। সূরা আন্ফালে বলা হয়েছে ঃ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً

www.pathagar.com

খানায়ে কা'বার সামনে তাদের নামায তালি বাজানো আর শীষ দেয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আজকের দিনে আরবদের সে এবাদত-উপাসনার স্বরূপ কল্পনা করাটা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু যে যুগে কোরআন নাযিল হয়েছিল, তখনকার লোকদের জন্যে এর চাইতে সাধারণ ও জানা বিষয় আর দ্বিতীয় একটিও হতে পারত না। তারা শুধু যে নামাযের পরিপূর্ণ রূপ ও তাৎপর্য জানতেন তাই নয়, বরং ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নিজেরাও এ নামাযই পড়তেন।

আরো একটি উদাহরণ সূরা আ'রাফ থেকে নেয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

আর যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ কাজ করতে দেখেছি। তা ছাড়া আল্লাহ্ আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। বলে দাও, আল্লাহ্ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন কাজের অপবাদ আরোপ করছ, যার ব্যাপারে তোমাদের জানা নেই?

কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বুঝেছেন, মক্কাবাসীর উলঙ্গ অবস্থায় খানায়ে কা'বা তওয়াফের সাথে আয়াতটি সম্পৃক্ত। অথচ এতে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। বেশীর চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র। কিন্তু বক্তব্যের আনুপূর্বিক ধারাটা এমন ছিল যে, যারা মক্কাবাসীর সে অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাদের ধারণা শুধু সেদিকেই ধাবিত হতে পারত। অবশ্য পরবর্তী যুগের লোকদের বিষয়টি যথাযথ বুঝতে গিয়ে বিরাট জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার কারণ, তাদের সামনে ছিল শুধুমাত্র বক্তব্যের আনুপূর্বিক যোগসূত্র; সে অবস্থা ও পরিবেশ তাঁদের সামনে ছিল না, যদ্দরুন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। যদিও শব্দাবলী এবং বক্তব্যের আনুপূর্বিক যোগসূত্র যথার্থ উদ্দেশের প্রতি পথনির্দেশের জন্য অপর্যাপ্ত নয়, তবুও সেই সংগে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিরও যদি সাহায্য পাওয়া যায়, তা হলে প্রকৃত বাস্তবতা আপনিই সামনে এসে যায়।

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতটির সাথে সাথেই বলা হয়েছে ঃ

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ـ (اعراف ٣١ - ٣٢)

হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেকবার মসজিদে সমবেত হওয়ার সময় তোমরা উত্তম সজ্জা গ্রহণ করে নাও এবং পানাহার কর আর অপব্যয় করো না। কারণ, আল্লাহ অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে হারাম করল আল্লাহ্‌র সাজ সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রুজিকে, যা তিনি বান্দাদেরকে দান করেছেন?

এ আয়াতটিও উপরোল্লিখিত বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। এতে উলঙ্গ তওয়াফ করার আসল দর্শনটা বুঝা যাচ্ছে যে, আরবদের এই বোকামিসুলভ কাজটি তাদের অন্যান্য বহু কাজের মতই প্রকৃতপক্ষে একটা আবেগ নির্ভর আচরণ ছিল। এই নির্লজ্জ কাজটি তারা এজন্যে গ্রহণ করেছিল যে, তারা একে বৈরাগ্য ও পরহেযগারী বলে ধারণা করত। তাদের ধারণায় পোশাক-পরিচ্ছদ হল দাম্ভিকতা ও শোভ-সৌন্দর্যের বস্তু-সামগ্রী। কাজেই তারা তওয়াফের সময় তা খুলে ফেলত, যাতে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ সেই পার্থিব মলিনতা থেকে পবিত্র থাকে। কোরআন মজীদ উল্লিখিত আয়াতে তাদের সে ধারণার খন্ডন করেছে যে, আল্লাহ্-ভক্তির এহেন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, আল্লাহ যেসব নেয়ামত বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো মানুষ নিজের জন্যে হারাম করে রাখবে। বরং এই নেয়ামতসমূহের দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। কারণ, সেগুলো সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপকার সাধন। অবশ্য অপব্যয় নাজায়েয। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

বলাবাহুল্য, উক্ত আয়াতের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে পারা উলঙ্গাবস্থায় তওয়াফ করার দর্শনটির অবগতির ওপর নির্ভরশীল, যদিও এই দর্শনটি আয়াতের শব্দাবলী থেকেই বেরিয়ে আসছে। বরং এ বিষয়টি মেনে নেয়া ছাড়া আয়াতটির কোন যথার্থ ব্যাখ্যা করাই সম্ভব নয়। কিন্তু এর শব্দগুলোতে এমন ব্যাপকতা রয়েছে, যদি বিষয়গুলো সামনে না থাকে এবং বক্তব্যের পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য না করে, তা হলে আয়াতটির যথার্থ উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে গিয়ে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু যাঁদের সামনে এসব কার্যকলাপ এবং

www.pathagar.com

দর্শন উভয়টিই রয়েছে, তাঁদের পক্ষে আয়াতটি বুঝতে গিয়ে কি অসুবিধা থাকতে পারত? উপাখ্যান যেহেতু নিজেদেরই ছিল, তাই কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে তার যাবতীয় তাৎপর্য আয়নার মত সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গেল। এমনি করে সূরা বাকারায় হজ্জের আহকাম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۔

(بقرة - ٢٠٠)

হজ্জের যাবতীয় ফরযগুলো যখন সম্পাদন করে ফেলবে তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো, যেমন করে স্মরণ করতে নিজেদের পিতা-পিতামহের কথা, বরং তার চেয়েও বেশী করে স্মরণ করো।

পূর্ববর্তী ওলামা-মনীষীদের কাছ থেকে আমাদের কাছে كذكر كم اباءكم এর যে ব্যাখ্যা এসে পৌঁছেছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ

وكانوا اذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل فبعد دون فضائل اباء هم ويذكرون محاسن ايامهم ۔

হজ্জের আরকান ও ফরযসমূহ সম্পাদন শেষে লোকেরা মিনায় অবস্থিত মসজিদ এবং পাহাড়ের মাঝামাঝি এক জায়গায় বসে পড়ত এবং নিজেদের পিতা- পিতামহের গৌরব ও তাদের কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করত।

আয়াতের শব্দাবলী যদিও উল্লিখিত বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করেছে, কিন্তু এই ইঙ্গিত ধরে নেয়া তাদের পক্ষে সহজ নয় যারা পরিস্থিতি, ঘটনাস্থল এবং আরবদের রুচি সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিফহাল নয়। অবশ্য যারা কোরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাঁদের পক্ষে বিষয়টি বুঝা মোটেই কঠিন নয়।

তেমনিভাবে যেকোন কালের কথা ও বক্তব্য তখনকার অসংখ্য কৃষ্টিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে জড়িত থাকে। ফলে সে কথাটির প্রকৃত সৌন্দর্য, তার যথার্থ বলিষ্ঠতা তখনও পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায় না, যতক্ষণ না সে কথা বা বক্তব্যের পরিবেশ নিজের আশেপাশে তৈরী করে নেয়া যায়। যেমন, কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ

www.pathagar.com

الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্য পার্থিব জীবনে অন্য আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছ। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। বস্তুত তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর তোমাদের কোন সহায় থাকবে না।

এ আয়াতে- مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অংশটির প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এতে তৎকালীন রাজনীতির একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বুঝতে না পারলে আয়াতটির ব্যাখ্যায় কোন কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক আবরণমুক্ত হতে পারে না।

আরব এবং অন্যান্য পৌত্তলিক জাতিসমূহে পৌত্তলিকতাটা শুধু একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসই ছিল না, বরং তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক এবং সামগ্রিক সম্পর্কও এরই সাথে জড়িত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের পৃথক পৃথক মূর্তি ছিল এবং প্রচলিত নিয়ম ছিল। কোন্ গোত্র যখন অন্য কোন গোত্রের সাথে ঐক্য স্থাপন করতে চাইত, তখন তারা সে গোত্রের মূর্তির উপাসনায় অংশ নিত। আবার যখন কোন গোত্র অপর গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইত, তখন এই বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা করে দিত। এরপরে পারস্পরিক সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। লক্ষ্য করার বিষয়, যাঁদের সামনে বাস্তব এই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, তাদের পক্ষে এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে কি অসুবিধা হতে পারে? শুনল আর বুঝে নিল। কিন্তু আমরা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময়কার রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে না পারব, এই শব্দসমষ্টির তাৎপর্য কিংবা এতে যে বলিষ্ঠতা রয়েছে তার কি বুঝব?

এ বিষয়টিরই বিশ্লেষণকল্পে সূরা বাকারার সে আয়াতটিও একটি চমৎকার উদাহরণ, যা মদ্যপান ও জুয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ (بقره - ٢١٢)

তারা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এগুলোতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্যে কিছু উপকারিতাও বটে। তবে সেগুলোর পাপ উপকারিতার তুলনায় অনেক বেশী।

www.pathagar.com

এ আয়াতটি সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। মানুষ মনে করে, মদ্যপান ও জুয়ার যে উপকারিতার কথা কোরআন স্বীকার করেছে, সেগুলো তাদের চিকিৎসা বিষয়ক এবং ব্যক্তিগত। অথচ কথাটি কোনক্রমেই ঠিক নয়। কোরআন যে উপকারিতার কথা স্বীকার করেছে, তা হচ্ছে তাদের কৃষ্টিগত, নৈতিক ও সামাজিক উপকারিতা। কোন বস্তুর চিকিৎসা বিষয়ক এবং ব্যক্তিগত উপকারিতা একে তো কোরআনের আলোচ্য বিষয় নয়, দ্বিতীয়ত যদি মদে কিছু উপকারিতা থেকেও থাকে, তবে দুনিয়ার এমন কোন্ ক্ষতিকর বস্তুটি রয়েছে, যাতে উপকারিতারও একটা না একটা দিক বিদ্যমান নেই? তা হলে মদ আর জুয়ার ভেতরে এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য কোরআন মজীদকে সেগুলোর হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে সেগুলোর উপকারিতার বিষয়টিও স্বীকার করতে হবে? অন্যান্য বহু বস্তু হারাম করা হয়েছে। সেগুলো কি সম্পূর্ণভাবেই উপকারিতা বিবর্জিত ছিল? তা যদি না হয়ে থাকে, তবে সেগুলোর সম্পর্কে এই স্বীকৃতি দেয়া হল না কেন? শূকরের মধ্যে কি উপকারিতার কোন একটি দিকও ছিল না?

আমাদের মতে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ ভুলের সংশোধনকল্পে অবশ্য আয়াতে উল্লিখিত نفع ও اثم (নাফা ও ইস্‌ম্) দুটি শব্দের তুলনাই যথেষ্ট। যদি বিষয় দুটির ব্যক্তিগত উপকারিতা-অপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হত, তাহলে نفع (নাফা) বা উপকারিতার বিপরীতে ضرر (জরর) বা অপকারিতা কিংবা এরই সমার্থক কোন শব্দ আসত। اثم (ইস্‌ম্) পাপ শব্দটি আসত না, যা কিনা আরবী ভাষায় দৈহিক অপকারিতা অথবা তার অর্থে ব্যবহৃত হয় না, বরং নৈতিক স্খলন বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

কারও মনে হয়ত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, মদ বা শরাব এবং চিকিৎসা কিংবা ব্যক্তিগত উপকারিতার বিষয়টি তো সহজই ছিল যে, তার কোন কোন দিক ছিল মোটামুটিভাবে জানা। কিন্তু সেগুলোর সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উপকারিতা আবার কি, যা কোরআন স্বীকার করে নিয়েছে? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আজ কালকার লোকদের জন্য সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যথেষ্ট কষ্টকর। কারণ, যে মদ্যপান ও জুয়া খেলা আমাদের সামনে রয়েছে, তা আপাদমস্তক ক্ষতিকর ও হাঙ্গামা সৃষ্টির কারণ। এতে উপকারিতার সামান্যতম সম্ভাবনাটিও নেই। এগুলো শরীর, মন, ব্যক্তি, সমাজ সবার জন্যেই সমানভাবে অভিশাপ। অবশ্য আরবদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক দিক দিয়ে একটি গুরুত্ব ছিল।

www.pathagar.com

তাদের সমাজে এতদুভয় দুরাচারই সদাচারের পথ ধরে ঢুকত। তারা এ দুটি জিনিসকেই মেহমানদারী বা আতিথেয়তা এবং দানশীলতার সবচেয়ে বড় উপকরণ বলে জানত। সে কারণেই তারা সেসব লোককে অত্যন্ত হেয় দৃষ্টিতে দেখত, যারা মদ্যপান এবং জুয়া থেকে বিরত থাকত। যারা তৎকালীন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত তারা আমাদের এই বিবৃতি অস্বীকার করতে পারেন না। জাহেলিয়াত আমলের যেকোন কবির কবিতা পড়লেই দেখা যাবে, তারা সে দুটি জিনিসকেই সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হিসেবে উপস্থাপন করবেন, যাকে আমাদের বর্তমান সমাজে সবচাইতে খারাপ বলে মনে করা হয়। কারণ, গরীবদের সহায়তা, আত্মীয়-বন্ধুদের আপ্যায়ন-অভ্যর্থনা, বেওয়া-বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনাথ -এতীমদের সাহায্যের সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা এ দুটি বিষয়ের মাঝেই নিহিত ছিল।

আরবের অতিথিপরায়ণ এবং সুরাসক্তদের রীতি ছিল, শীতের সময়ে যখন আরবে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তারা মদ্যপানের আসর বসাত এবং শরাবের নেশায় বিভোর হয়ে বহু মূল্যবান উট জবাই করে সেগুলোর মাংস একত্রে স্তূপীকৃত করে সেগুলোকে বাজিতে লাগিয়েই জুয়া খেলত এবং যারা জিতত তারা মাংসগুলো গরীব- দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করে দিত।

জুয়া এবং শরাবের এই ছিল মহিমা, যার ভিত্তিতে কোরআনে যখন সেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন মানুষ অবাক হয়ে যায় যে, এমন একটা জনহিতকর উপকারী বিষয়কে ইসলাম হারাম করল কেন? কোরআন তাদের উত্তরে এ বিষয়টি অবশ্য স্বীকার করে নিল যে, শরাব এবং জুয়ায় কোন কোন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উপকারিতা অবশ্যই আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটিও প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এগুলোর সাংস্কৃতিক অপকারিতার তুলনায় এগুলোর উপকারিতার দিকটা অতি নগণ্য। সে কারণেই এগুলোকে নিষিদ্ধ ও হারাম করা যাচ্ছে।

এ বিষয়টিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, কোরআন মদ-জুয়ার আলোচনা অতিথি পরায়ণতার শিক্ষা প্রসঙ্গে করেছে, যাতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ জিনিসগুলো আরবদের মধ্যে দুরাচার নয় বরং মহদাচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এগুলো শুধু ভোগ-বিলাস ও খেলাধুলা হিসেবেই গ্রহণ করেনি, বরং সমাজের একটা বিরাট মহিমা মনে করে গ্রহণ করেছিল।

www.pathagar.com

এখন চিন্তা করা প্রয়োজন যে, এসব উপাখ্যান যাদের জানা ছিল, তাদের পক্ষে قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (বলে দাও, এগুলোতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে।)-এর প্রকৃত তাৎপর্য পর্যন্ত পৌঁছতে জটিলতাটা কি ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন এ সমস্ত বিষয় দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেছে, তখন ব্যাখ্যার এ দিকটি কেমন করে মানুষের সামনে আসতে পারত?

বিষয়টি আরও অধিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন মনে করলে সূরা নূরে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাতে সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে বেশ কতিপয় নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত সেগুলো বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে সেগুলোর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করতে গেলে তৎকালীন সমাজের অবস্থা সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে এবং মনে হয়, বক্তব্য তার বিশ্লেষণের জন্য এসব বিষয়ে অবগতির অপেক্ষা রাখে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে যে পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে পরিস্থিতিটি সামনে না আসে, মনের সন্দেহ দূর হয় না। তেমনি সূরা বারাআত প্রভৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সে যুগের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, বিপ্লব -আন্দোলন এবং সমস্ত ধর্মীয় দলগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা ইসলামের আর্বিভাবের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

যা হোক, প্রত্যেক যুগের বাণীতেই সে যুগের সংস্কৃতি, নৈতিকতা, রাজনীতি ও ধর্মের এমন সব তাৎপর্য নিহিত থাকে, যেগুলো জানা ছাড়া সেই বাণীর বহু গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্মতা পরিষ্কারভাবে বিকশিত হতে পারে না। বস্তুত এ বিষয়টি শুধু কোরআনের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং যেকোন বাণীর বেলায়ই তাই। হোমার এবং শেক্সপিয়ারকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলেও তাই করতে হয়। বহু বাহ্যিক বিষয়ের সাহায্যে নিজেদের চারপাশে হোমার ও শেক্সপিয়ারের পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে চেষ্টা করি আমরাও। হোমার-শেক্সপিয়ার তো তবুও বহু প্রাচীন কাহিনী। তাদের সংস্কার আর আমাদের সংস্কারের ব্যবধান শুধু যুগেরই নয়, বরং উভয়ের বর্ণ-গোত্র এবং দেশ-আবাসও বিভিন্ন। মীর এবং গালেবকেই ধরা যাক। তাঁরা তো আমাদের এ উপমহাদেশেরই কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁদেরকে বুঝতে গিয়ে কি আমাদের সেসব বিষয়গুলোর মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

আল-ইসলাহ-এর প্রথম সংখ্যায় ইমাম হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) প্রণীত 'কোরআনের বিন্যাস ও সংবিধান' শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি লাইন গভীর মনোযোগসহ পড়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

১. কোরআন যে যুগে নাযিল হয়েছিল, তার সম্যক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

২. আমাদের জানা প্রয়োজন, তখনকার ইহুদী, খ্রীস্টান, মুশ্‌রিক ও অন্যান্যদের ধর্ম- বিশ্বাস কি ছিল।

৩. আমাদের প্রয়োজন আরবের সাধারণ সংস্কার-কুসংস্কারগুলো আবিষ্কার করা।

৪. আমাদের জানা প্রয়োজন, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় নতুন কি কি ঘটনা ঘটেছিল এবং তাতে আরবদের বিভিন্ন দলের মধ্যে কি ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কি কি দেশী ও সামাজিক ঝগড়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং গোটা আরবে কি আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল?

৫. আমাদের আরও জানা দরকার, তখন আরবের সাহিত্য রুচি কি ছিল। তারা কোন্ ধরনের কথাবার্তা শুনতে এবং বলতে অভ্যস্ত ছিল। তখনকার আসর-বৈঠকে তাদের বক্তব্য কেমন করে উপস্থাপন করত। রহস্যজনক ও সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ এবং ভাষার অলঙ্কার ও গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে কোন্ প্রণালীকে তারা কেমন করে ব্যবহার করত?

৬. এবং অতঃপর আমাদের এ কথাও জানতে হবে যে, আরবদের ধারণায় নৈতিকতার ভাল ও মন্দের মাপকাঠি কি ছিল?

পূর্ববর্তী মনীষীদের তফসীর রীতি ঃ

উল্লিখিত কারণেই পূর্ববর্তী প্রবীণ ওলামা-মনীষীদের তফসীরের রীতি ছিল এই যে, তাঁরা সর্বপ্রথম কোরআনকে কোরআনের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করতেন। তারপর কোন জটিলতা থেকে গেলে সেগুলোর সমাধান অনুসন্ধান করতেন হুযূর আকরাম (সঃ)-এর বাণী ও তাঁর কাজকর্মে। তারপরেও যদি কোন বিষয়ের কোন দিক বিশ্লেষণসাপেক্ষ রয়ে গেলে তার সমাধানের উদ্দেশে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা-বিবৃতির সাহায্য নিতেন। কারণ কোরআন মজীদ সেসব লোকের অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাদেরকে সে সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছে, তাঁরা কোরআন মজীদের তত্ত্ব-রহস্য এবং তার ইঙ্গিত ও তাৎপর্যসমূহ যত সুন্দরভাবে বুঝতে পারতেন, তেমনটা আর কারও পক্ষে, বিশেষত, যাদের

www.pathagar.com

তখনকার অবস্থা সম্যকভাবে জানা নেই, সম্ভব ছিল না। সুতরাং আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'এত্কান'-এ তফসীরের নিয়ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আলেমগণ বলেছেন, কেউ যদি কোরআন মজীদের তফসীর করতে চায়, তা হলে প্রথমে কোরআন মজীদের মাধ্যমেই তার তফসীর করা উচিত। এতে এক জায়গায় যে বিষয়ের বর্ণনা দুর্বোধ্যভাবে, রয়েছে অন্যত্র তার ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। আর যে বিষয়টি একখানে সংক্ষিপ্ত অন্যত্র তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। ইবনে জাওযী (রঃ) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে কোরআনের সেসব আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন যেগুলো এক জায়গায় দুর্বোধ্য অন্যত্র বিস্তারিত। কিন্তু আমি দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে সেগুলোর উদাহরণসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছি। কোথাও তাতে ফল না হলে (অর্থাৎ কোরআনের তফসীর কোরআনেরই দ্বারা সম্ভব না হলে) সুন্নত বা হাদীসে তার তফসীর সন্ধান করতে হবে। কারণ, সুন্নত হল কোরআনের ব্যাখ্যাতা বা মুফাসসের। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, মহানবী(সঃ)-এর যাবতীয় সিদ্ধান্তই পবিত্র কোরআন থেকে উদ্ভাবিত। 'আল্লাহ্ বলেছেন। انا انزلنا اليك الكتاب....। হুযুর বলেন, আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তারই মত আরেকটি জিনিস অর্থাৎ সুন্নত। অতএব সুন্নতেও যখন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, তখন সাহাবাদের বাণীর প্রতি লক্ষ্য করতে হবে; তাঁরাই কোরআনের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অবগত। কারণ, তাঁরা কোরআনের অবতরণকালের সমস্ত অবস্থা ও রীতি-পদ্ধতিসমূহ স্বয়ং দেখেছেন। তদুপরি তাঁরা পরিপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও নেক আমলের গুণেও বিভূষিত ছিলেন।

তফসীরের এ রীতিটি সম্পূর্ণ প্রকৃতিগ্রাহ্য। আসল জিনিস হল কোরআনের শব্দাবলী এবং তার নিজের ব্যাখ্যা। তারপর মহানবী (সঃ)-এর সুন্নত। আর তৃতীয় পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ।

এতে এই সত্যটি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যাঁরা মহানবী (সঃ)-এর ব্যাখ্যা এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহের আলোকে কোরআন মজীদ বুঝতে চান, তাঁরা কোরআনের শব্দমালার গুরুত্ব বাতিল করতে চান না। ওপরে আমরা যেসব মতামত ও বাণী উদ্ধৃত করেছি, তাতে তফসীরের জন্য কোরআনের শব্দাবলী এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত হয়। বলা হয়েছে

www.pathagar.com

القران يفسر بعضه بعضا (কোরআনের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যাদান করে)। অবশ্য কোন বিষয় যদি কোরআন মজীদের বর্ণনাতে পরিষ্কার না হয়, তবে কি করতে হবে? যেকোন স্বাধীন চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন লোকও এ প্রশ্নের এ উত্তরই দেবেন যে, এ ধরনের জটিলতার ক্ষেত্রে সবচাইতে উত্তম পথের সন্ধান দিতে পারে মহানবীর হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ। যাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে এবং যাঁদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা একে যতটা উত্তমভাবে বুঝতে পারেন, ততটা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই পথনির্দেশের পন্থা কি হবে? তা হবে এই যে, একটি আয়াতের ওপর তার শব্দাবলীর আলোতে পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য করতে হবে, কোরআন মজীদে যে সমস্ত আয়াত উল্লিখিত আয়াতের অনুরূপ, সেগুলোর আলোকেও তা ভাল করে দেখে নিতে হবে, পূর্বাপর আয়াতের সাথে তার সামঞ্জস্য এবং ব্যাকরণিক গঠন- প্রকৃতির দিক দিয়েও বিচার-বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এই সমস্তের পরেও পুরোপরি সন্তুষ্টি না এলে বুঝতে হবে, আয়াতের শব্দাবলী আরও একটা কিছু চাইছে। কিন্তু সে বিষয়টি যদি সাধারণভাবে অনুধাবন করা না যায় তবে এক্ষেত্রে আমরা মহানবী (সঃ)-এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীর শরণাপন্ন হই। আর তাতে যদি এমন কোন বিষয় পেয়ে যাই, যাতে সে আয়াতের সমস্ত জটিলতা পরিষ্কার হয়ে যায়, তারপরে আর আয়াতের শব্দগুলোর মর্ম উদ্ধারের জন্য অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা থাকে না। ব্যাকরণিক গঠন ও অগ্রপশ্চাৎ সম্পর্কের যাবতীয় চাহিদাই পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে সে বিষয়টি যদি যথার্থ ও বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত হয়ে থাকে, তা হলে আমরা তা গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে আয়াতের শব্দাবলী কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখুক আর নাই রাখুক, কোন কথা রেওয়ায়েতের সংগ্রহে দেখতে পেলেই খামাখাই এনে তার সাথে লাগিয়ে দেব না অথবা গঠন ও আনুপূর্বিক সংযোগ, সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীর প্রকাশ্য বিরোধী হলে তা গ্রহণ করব না। এ ধরনের বাড়াবাড়ির কারণেই মানুষের মধ্যে হাদীস ও পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহের প্রতি একটা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং এমন সব ধারণার বিস্তার ঘটেছে, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। যাঁরা অনুসন্ধান -গবেষণা করেন, কোন কালেই তাঁদের এ ধর্ম ছিল না। তাঁরা কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে সর্বদা কোরআনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন।

www.pathagar.com

অবশ্য কোন বিষয় বিশ্লেষণসাপেক্ষ হলে এবং সঠিক হাদীস ও পূর্ববর্তী বর্ণনার দ্বারা তার বিশ্লেষণ হয়ে গেলে তাঁরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। আর এটা এমন একটা ব্যাপার যার বৈধতা সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই।

এখন রইল, এই হাদীস অথবা 'আসার'গুলোকে একান্তভাবেই শুদ্ধ ও প্রমাণিত হতে হবে; মওজু বা জাল হলে চলবে না। বস্তুত এটাও এমন একটা বিষয়, যার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। আমাদের ওলামা সম্প্রদায় নিজেরাও বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এতকানে আছে ঃ

> তফসীরের কয়েকটি উৎস রয়েছে। তন্মধ্যে চারটি মূলনীতিস্বরূপ। প্রথমত, সেসব উদ্ধৃতি, যা মহানবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অগ্রগণ্য। কিন্তু এতে দুর্বল ও মওজু থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ, এ ধরনের রেওয়ায়েত সংখ্যা বিপুল। সে কারণেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তিনটি বিষয় আছে, যার কোন আমল নেই; তফসীর, মালাহেম ও মাগাজী।

একথা কেউই বলেন না যে, শুদ্ধাশুদ্ধ সব রকমের রেওয়ায়েতের ওপরই বিশ্বাস করতে হবে। বরং সবাই বলেন যে, পরিপূর্ণ যাচাইয়ের পর যেসব রেওয়ায়েতই গ্রহণযোগ্য বেরোবে এবং বর্ণনা ও ব্যবহারের সমস্ত মূলনীতিতে যাচাই করার পর যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে, শুধু সেসব রেওয়ায়েতই গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই মত স্থির করেছি যে, শুদ্ধ রেওয়ায়েত এবং কোরআনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; বরং কোরআন মজীদের সবচেয়ে উত্তম তফসীরই হচ্ছে শুদ্ধ রেওয়ায়েত, প্রমাণিত 'আসার' এবং মহানবী (সঃ) যা কিছু করেছেন, যা কিছু বলেছেন তার সবই কোরআন থেকে নির্গত। ওপরে প্রসঙ্গক্রমে হযরত ইমাম শাফেয়ীর একটি উদ্ধৃতি বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সঃ) যত বিচার-মীমাংসা করেছেন, সবই কোরআন মজীদ থেকে নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

قال الشافعي (رح) كلما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القران -

এমতাবস্থায় কোরআন এবং হাদীসের মাঝে বিরোধ হবে কেমন করে? সাধারণত মানুষ হাদীসের বিরাট সংগ্রহের মধ্যে শুধু এতটুকু অংশকেই কোরআন সম্পর্কিত বলে মনে করে, যা 'তফসীর পরিচ্ছেদ' শিরোনামে সংযোজিত রয়েছে।

www.pathagar.com

আর বাকী অংশকে কোরআনের সাথে সম্পর্কহীন বলে মনে করে। পক্ষান্তরে হাদীস সম্পূর্ণভাবেই কোরআনের জ্ঞান। হাদীসের ওপর যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে হাদীস ও কোরআনের যে গভীরতর সম্পর্ক, তা অতি পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায়।

তথাপি হাদীসের মান মূলের মত নয় বরং শাখার মত। মূল হচ্ছে কোরআন মজীদ। এটি যেমন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবসমূহের জন্য কষ্টি পাথরের মত, তেমনিভাবে পরবর্তী সমস্ত কিতাবের জন্যও। কখনও কোন রেওয়ায়েত এবং আয়াতের মধ্যে কোন রকম বিরোধ দেখা দিলে আয়াতের কোন রকম রূপক বিশ্লেষণ করা চলবে না, কিন্তু রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা করা চলবে। আয়াত যথাস্থানে বহাল থাকবে। কোরআন গবেষকদের রীতি সব সময়ই তাই ছিল। মন্‌সুখ বা রহিতকরণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মত ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক সমস্ত কিতাবেই বর্ণিত রয়েছে। তাঁর মতে সুন্নাহ্ কখনই কোরআন মজীদের কোন আয়াতকে রহিত করতে পারে না। অবশ্য এ মতের বিরোধীরা এ বিষয়টি নিয়ে তাঁর প্রচুর সমালোচনা করেছেন। এমনকি 'মুসাল্লামুস্ সুবূত' গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা একে অন্যায় বাড়াবাড়ি পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত ও যথার্থ মত এটাই।

'ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি' গ্রন্থে ইমাম সাহেবের যুক্তি-প্রমাণাদি উদ্ধৃত রয়েছে। এ শাস্ত্রে তাঁর নিজেরও রচনা রয়েছে। তাতেও তিনি নিজ মতামত সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। আল্লামা আমুদীও তাঁর কিতাবে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বরং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং অধিকাংশ আলেমের মতও তাই, যাঁরা হাদীস ও রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। কাজেই ফেকাহশাস্ত্রের ওলামা ও তর্কশাস্ত্রের পন্ডিতদের মত আলাদা হতে যাবে কেন?

যা হোক, হাদীসসমূহকে এই মর্যাদায় রেখে যদি কোরআন মজীদ বুঝতে চেষ্টা করা হয়, তা হলে তাতে কোরআন বুঝার ব্যাপারে যথেষ্ট মূল্যবান সাহায্য লাভ হবে। কোন রকম জটিলতাই সৃষ্টি হবে না। আমাদের মতে, হাদীসকে উল্লিখিত মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে দেখা অনেকটা বাড়াবাড়ি এবং এর চাইতে নীচে নামানো দুর্ভাগ্য ও আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। যারা ইদানীং হাদীসসমূহকে বাদ দিয়ে কোরআন বুঝতে চান, তাঁদের তুলনা সেই যৌবনোন্মত্ত চপল যুবকের মত, যে

www.pathagar.com

কোন নৌকা-ভেলা ছাড়াই মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর মনে মনে ধারণা করে, সাঁতরেই এ সাগর পাড়ি দেবে! এই দুঃসাহস বাহ্‌বার যোগ্য হতে পারে, কিন্তু প্রকারান্তরে তা আত্মহত্যারই নামান্তর, যা আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না।

শানে নুযূল ঃ

ওপরে রেওয়ায়েত ও হাদীস সম্পর্কে আমরা যে মৌলিক আলোচনা করেছি, তা রেওয়ায়েত ও কোরআন মজীদের মধ্যকার সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বিশেষভাবে শানে নুযূল সম্পর্কে মানুষের মনে এমন কিছু কিছু প্রশ্নের উৎপত্তি হয়, যেগুলো দূরীকরণকল্পে সে মৌলিক আলোচনার পরেও বিষয়টির বিশেষ বিশেষ দিকগুলো সামনে রেখে কয়েকটি ছত্র লেখে দেয়া প্রয়োজন।

তফসীরের কিতাবসমূহের স্পষ্ট পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাধারণত একটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় যে, প্রায় সব আয়াতের নীচেই শানে নুযূল হিসাবে একটা না একটা ঘটনা বিবৃত থাকে। বরং কোন কোন সময় একই আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে একাধিক ঘটনাও বর্ণনা করা হয়। পক্ষান্তরে, অনেক সময় সেসব ঘটনার মধ্যে বিরোধ, এমনকি বৈপরীত্যও দেখা যায়। আর সাধারণত এসব ঘটনা এমন বিস্ময়কর এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, যা মানতে মন সংকোচ বোধ করে। এ ধরনের রেওয়ায়েত বা উদ্ধৃতি সম্পর্কে মানুষের মনে দু'রকমের সংশয় রয়েছে। প্রথমত এসব ঘটনার অধিকাংশই এমন, যার সাথে মূলত আয়াতের কোন সম্পর্কই নেই। দ্বিতীয়ত যদি প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই এক বা একাধিক ঘটনাকে শানে নুযূল মেনে নেয়া হয়, তা হলে কোরআন মজীদে নিয়ম-শৃঙ্খলা বা ক্রমবিন্যাসের অন্বেষণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, শৃঙ্খলার দাবী হল ধারাবাহিকতা। অথচ প্রত্যেকটি আয়াতেরই কোন বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্ক থাকাটা এই ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ সন্দেহটি সূরা আন'আম-এর তফসীর করতে গিয়ে হযরত ইমাম রাযী (রঃ)-এর মনেও উদয় হয়েছিল এবং তিনি তার কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়েই এগিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং - واذا جاءك الذين يؤمنون بايتنا আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তিনি লেখেছেন ঃ

> এখানে আমার সামনে একটা জটিল প্রশ্ন রয়েছে। তা হল, সবই এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্ণ এই সূরাটিই একবারে নাযিল হয়েছে। ঘটনা যদি তাই হয়,

www.pathagar.com

তবে সূরাটির প্রত্যেকটি আয়াত সম্পর্কে একথা বলা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, এটি অমুক ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নটির সমাধানকল্পে পূর্বোক্ত কোন কোন আলোচনাই যথেষ্ট। অর্থাৎ, তফসীরের প্রকৃত মূলনীতি হচ্ছে, রেওয়ায়েতের আগে মূল আয়াতের শব্দাবলী এবং আনুপূর্বিক বিন্যাস ও ধারাবাহিকতার বিষয় চিন্তা করা। শব্দগুলো যদি তার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে দেয়, আয়াতের যথার্থ বিশ্লেষণ যদি বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই পরিষ্কার হয়ে যায়, বিন্যাস যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যাবতীয় শর্ত মোতাবেক হয়ে থাকে, তা হলে এমন কোন ঘটনা আয়াতের সাথে খাটিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, যা তার বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা বিধ্বস্ত করে দেয় এবং সুব্যাখ্যাকে আহত করে। অবশ্য শানে নুযূল যদি আয়াতের পরিচ্ছন্ন ও যথার্থ বিশ্লেষণের সমর্থন যোগায়, তা হলে তা অতিরিক্ত আত্মতুষ্টি ও প্রশান্তির কারণ হতে পারে। এ বিষয়টি উপেক্ষা করার কোন কারণও নেই। বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয় যে, একজন চিকিৎসক যেমন একটা ব্যবস্থাপত্র দেখে তার অংশগুলো এবং সেগুলোর পারস্পরিক গঠনবিন্যাস লক্ষ্য করেই বুঝে নিতে পারেন, তা কোন্ রোগের জন্য লেখা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে কোরআন মজীদের একজন শিক্ষার্থীকেও আয়াতের উদ্দেশ্যসমূহ, তার অংশসমূহ এবং সেগুলোর পারস্পরিক বিন্যাস লক্ষ্য করে সূরার শানে নুযূল স্বয়ং সূরার ভেতর থেকেই বের করে নেয়া কর্তব্য। অতপর অতিরিক্ত সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে সেসব ঘটনাপঞ্জির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, যা শানে নুযূল হিসেবে আয়াতের প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে দুর্বল ও অসমর্থিত রেওয়ায়েতের দ্বারা বিভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। তখন কোরআনের আলোই সঠিক পথের দিশা দেবে। যেসব রেওয়ায়েত সঠিক, সেগুলোতে কোন সংশয় সৃষ্টি না হয়ে বরং পরিতুষ্টি ও প্রশান্তি লাভ হবে। পক্ষান্তরে যেসব রেওয়ায়েত সঠিক নয়, সেগুলো আপনা থেকেই সরে যাবে।

ওপরে হযরত ইমাম রাযী (রঃ)-এর যে সন্দেহটির উল্লেখ করা হয়েছে, তাও তেমন একটা জোরালো নয়। গবেষকদের যেসব উত্তর তফসীরের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেই তার সমাধান হয়ে যায়। অতএব, আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ ধরনের সন্দেহের উত্তরে লেখেছেন ঃ

জারাক্শী (রঃ) তাঁর 'বোরহান' নামক গ্রন্থে লেখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের একটা সাধারণ রীতি ছিল যে, যখনই তাঁদের মধ্যে কেউ

www.pathagar.com

বলতেন, "এ আয়াতটি অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে", তখন তার অর্থ এই হত যে, এ আয়াতে অমুক বিষয়ের নির্দেশও রয়েছে। এর এই অর্থ হত না যে, হুবহু অমুক ঘটনাই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ। সে আয়াতের দ্বারা যেন বিষয়টির যথার্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনার উদ্ধৃতি নয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর গবেষণাও তাই। তিনি 'ফওযুল কবীর' গ্রন্থে লেখেছেন ঃ

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বর্ণনা সংগ্রহ থেকে যা বুঝা যায়, তা হচ্ছে-

نزلت فى كذا অর্থাৎ এ আয়াত অমুক ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে মন্তব্য শুধুমাত্র হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর সময়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতটির বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর ব্যাপারে ব্যবহৃত হত। ما صدق عليه اية বলে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) যেগুলোর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সেসব ঘটনার সাথেই এ আয়াতকে সংশ্লিষ্ট মনে করা ঠিক হবে না। শানে নুযূল সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর দ্বারা এ কথা কখনও বুঝা যায় না যে, এ আয়াত বা সূরা শানে নুযূলে বর্ণিত ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। বরং পারিপার্শ্বিক যেসব অবস্থা সংশোধনার্থ সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরায় জোর দেয়া হয়েছে, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেসব ঘটনাই শানে নুযূল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মত হল, শানে নুযূল সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোকে আয়াত বা সূরার মর্ম উদ্ধারের সহায়ক হিসেবে গণ্য করা। কেননা, কোরআনের প্রত্যেকটি নিদর্শন ও বক্তব্যই সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ। দেশ-কাল ও পাত্রের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য যেহেতু কোরআনের আবেদন, সেহেতু বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেন্দ্রিক তফসীর বা ব্যাখ্যা কোন অবস্থাতেই সংগত হবে না। (সংক্ষেপিত)

এতে نزلت فى كذا فانزل الله قوله অথবা فنزلت বা وانزلت প্রভৃতি পরিভাষার মর্ম সাহাবা ও তাবেয়ী (রঃ)-গণের দৃষ্টিতে কি ছিল এবং শানে নুযূল সম্পর্কে তফসীরের কিতাবগুলোতে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর অবস্থাই বা কি তা বুঝা যাচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে সেগুলোর মর্যাদা কি, উদ্ভাবন, প্রমাণ উপস্থাপক আর আনুপূর্বিক সম্পর্ক স্থাপনের, নাকি উদ্ধৃতি কিংবা নকলের। প্রশ্নও এখান থেকেই ওঠেছিল। মানুষ বুঝে নিয়েছিল যে, যে আয়াত

www.pathagar.com

সম্পর্কে বলা হয়, نزلت فى كذا (অমুক বিষয়ে অবতীর্ণ) তখন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে, হুবহু এ ঘটনাটিই এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ। কিন্তু ওপরে আল্লামা জারাক্‌শী এবং হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর যে মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, نزلت فى كذا কিংবা فانزل الله تعالى প্রভৃতি পরিভাষার উদ্দেশ্য তা নয়, যা সাধারণত লোকেরা বুঝে, বরং এটা প্রমাণ উপস্থাপন ও উদ্ভাবন পর্যায়ের একটা বিষয়। অর্থাৎ, এসব পরিভাষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ আয়াত দ্বারা অমুক বিষয়টি উদ্ভাবিত হয় কিংবা অমুক বিষয়টি প্রমাণ করে। এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জেনে নেয়ার পরে সমস্ত প্রশ্ন ও সন্দেহ আপনা থেকেই শেষ হয়ে যায়।

তফসীর এবং শানে নুযূলের কিতাবসমূহে কোন কোন সময় একই আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে এমন কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়, যার সংঘটনকাল ও আয়াতের অবতরণকাল কোনক্রমেই এক হতে পারে না। আবার অনেক সময় সূরাটি দেখা যায় মদীনায় অবতীর্ণ আর যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে মক্কার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তেমনিভাবে কখনও আয়াত হয় মক্কী আর সম্পৃক্ত ঘটনা হয় মদীনার। বরং কোন কোন শানে নুযূল এমনও দেখা যায়, যেগুলোর সংঘটনকাল এবং সে সম্পর্কিত আয়াতটির অবতরণকালের মধ্যে বহু কালের ব্যবধান রয়ে গেছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থী যদি এ কথা না জানে যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন (রঃ)-এর দৃষ্টিতে শানে নুযূলের প্রকৃত অর্থটা কি, তা হলে পড়তে গিয়ে তাকে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বরং তাকে সন্দেহ-সংশয়ের কিংবা অস্বীকৃতির এমন সব অবস্থার সাথে সংগ্রাম করতে হয়, যার বর্ণনা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, শানে নুযূলের ব্যাপারে মানুষ প্রচুর বাড়াবাড়ি করেছে। হয়ত বা এমন কোন আয়াত খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার নীচে কোন একটা কাহিনী উদ্ধৃত করে দেয়া হয়নি এবং হয়ত সাধারণত সেসব কাহিনী এমন ভিত্তিহীন যা হাদীসবেত্তা মনীষীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোরআন শিক্ষার্থীদেরকে এসব কাহিনীতে জড়ানো উচিত নয়। বরং এটা কোরআন শিক্ষার পক্ষে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থী কোরআনের বিন্যাস বিষয়ে অন্বেষণ করেন (বস্তুত যা কোরআন বুঝার প্রকৃত পথ), তাদের জন্য এসব গল্প-কাহিনীর চাইতে বেশী বাধা দ্বিতীয় একটি

www.pathagar.com

নেই। হযরত ইমাম রাযীর মনে যে প্রশ্ন উদয় হয়েছিল এবং যা আমরা বর্ণনা করেছি, তাও এ ধরনের অলীক কাহিনীরই ফসল। এমন ধরনের গল্প-কাহিনীসহ কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান করা সম্ভব নয়।

এ উপলব্ধিটি শুধু আমাদেরই নয়, বরং হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এরও ছিল। তিনি বলেছেন ঃ

এটা জানবার বিষয় যে, শানে নুযূলের বিরাট অংশেরই কোরআন বুঝার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এর কার্যকরী অংশ অতি অল্প। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক কালবী যে বাড়াবাড়ি করেছেন এবং প্রতি আয়াতের নীচেই একটা না একটা কাহিনী উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তার বড় অংশই মুহাদ্দেসীনের দৃষ্টিতে সঠিক নয় এবং সেগুলোর সনদও গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই একে তফসীরের শর্ত মনে করা একান্তই ভুল। আল্লাহ্র কালামের গবেষণা-পর্যালোচনা এর ওপর নির্ভরশীল সাব্যস্ত করাটা নিজেই নিজেকে আল্লাহ্র কালাম থেকে বঞ্চিত করার শামিল।

সুতরাং কাহিনী ও ঘটনাসমূহের ব্যাপারে সঠিক মত হচ্ছে ওই কাহিনীগুলো জানার জন্য চেষ্টা করতে হবে, যেগুলোর প্রতি কোরআনের আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হচ্ছে এবং যেগুলো জানা আয়াতগুলো পরিপূর্ণভাবে বুঝার জন্য প্রয়োজন।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ) বলেন ঃ

তফসীরকারদের পক্ষে কাহিনীসমূহের মধ্যে দু'রকমের কাহিনী জানা আবশ্যক। প্রথমত সেসব কিস্সা বা কাহিনী, যেগুলোর প্রতি কোরআনের আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। এ ধরনের আয়াতের ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারা কিসসাগুলো জানা ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত সেসব কাহিনী, যাতে কোন সাধারণ বিষয়কে বিশিষ্টতা দেয়া হয় অথবা এমনি ধরনের অন্য কোন বিষয়, যা প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে অপর কোন তাৎপর্যের প্রতি নিয়ে যাওয়ার মত। নিঃসন্দেহে এমন ধরনের আয়াতসমূহ সেসব কিসসা-কাহিনীর সাহায্য ছাড়া বুঝা যেতে পারে না।

এখানে উপরোল্লিখিত প্রকারের যেসব কিস্সার প্রতি কোরআনের আয়াতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তার কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করছি। এর একটি চমৎকার উদাহরণ সূরা সুজাদালায় রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ۔ (مجادله - ١)

আল্লাহ তাআলা সে মহিলার কথা শুনে নিয়েছেন, যে তোমার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে ঝগড়া করছিল এবং আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের দু'জনের কথাবার্তাই শুনছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।

উল্লিখিত আয়াতে সে মহিলার যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা যদি সবিস্তারে জেনে নেয়া যায়, তা হলে এ আয়াতটি বুঝতে গিয়ে যথেষ্ট সাহায্য হতে পারে।

এমনিভাবে সূরা আহ্যাবের নিম্নলিখিত আয়াতে হযরত যায়েদ এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ঘটনার প্রতি সাধারণভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলে বিষয়টিও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۔ (الاحزاب -٣٧)

আর যখন তোমরা বলছিলে, সে লোকের সাথে যার প্রতি আল্লাহ্ রহমত করেছেন যে, নিজের স্ত্রীকে আটকে রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর তোমরা নিজেদের মনে এমন বিষয় গোপন করে রাখতে যা আল্লাহ্ প্রকাশ করতেন। বস্তুত আল্লাহ্ই তার বেশী অধিকারী যে, তাকে ভয় করা হবে। অতএব যায়েদ যখন তার (স্ত্রী) সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছি, যাতে মুমিনদের নিকট বানানো পুত্রদের স্ত্রীদের সম্পর্কে কোন সংশয় থাকতে না পারে, যখন তারা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়।

এমনিভাবে সূরা তাহরীমের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতেও কোন কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতগুলো বুঝার জন্য তা জানা থাকা প্রয়োজন। বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ (تحريم - ٣)

আর মহানবী (সঃ) যখন নিজের বিবিদের মধ্যে কারও সাথে একটি কথা গোপনে বললেন, অতপর যখন সে সে বিষয়ে সংবাদ দিয়ে দিল এবং আল্লাহ নবীর নিকট কথাটি প্রকাশ করে দেন, তখন নবীও তার কিছু প্রকাশ করলেন এবং কিছু গোপন রাখলেন। অতপর যখন তা স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করলেন, তখন তিনি বললেন, কে বলে দিয়েছে? বললেন, আমাকে আল্লাহ্ বলেছেন, যিনি জ্ঞানী ও পরিজ্ঞাত।

এই আয়াতটি এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে বুঝে আসতে পারে না, যতক্ষণ না সেসব বিষয় জেনে নেয়া যায়, যেগুলোর প্রতি তাতে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কাজেই এসব ক্ষেত্রে শানে নুযূলের অন্বেষণ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। কিন্তু এমন ক্ষেত্র কোরআন মজীদে অনেক বেশী নেই; মাত্র কয়েকটি এবং সঠিক ও প্রামাণ্য হাদীসে সাধারণত সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রথমে কোরআন মজীদের আয়াতটিতেই মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে হবে। তাতেই ঘটনার সমস্ত দিক পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যাবে। কিন্তু কোন একটি দিক যদি প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, পরিষ্কার করে বুঝে না আসে এবং আযাতের শব্দসমূহ তাকেই খুঁজে বেড়াতে থাকে, তা হলে অতিরিক্ত পরিতৃপ্তির উদ্দেশে সঠিক ও যথার্থ পন্থায় সম্পৃক্ত ঘটনা জেনে নেয়া উচিত। অবশ্য তখনও খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন কোরআনের ইঙ্গিতের সাথে পরিপূর্ণ ভাবে সুসমঞ্জস হয়; তার বিরোধী কিংবা বিপরীত যেন না হয়।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ ঃ

পেছনের পাতাগুলোতে যেসব অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, এক্ষণে সংক্ষেপে আমরা সেগুলোর একটা সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে চেষ্টা করব, যাতে করে প্রকৃত বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যেতে পারে।

১. কোরআন মজীদ সে শ্রেণীর কালামের অন্তর্ভুক্ত, যা কোন কোন দিক দিয়ে একান্ত সহজ ও সরল এবং কোন কোন দিক দিয়ে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল। সেজন্যই

www.pathagar.com

কোরআন একটি স্থূলগ্রন্থ, যা বুঝবার জন্যে কোন চেষ্টা-চরিত্রের কিংবা কোন গভীর চিন্তা-ভাবনার অথবা গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই বলে ধারণা করে নেয়া নিতান্ত ভুল। সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে কোরআন সম্পূর্ণ স্পষ্ট; প্রথম দৃষ্টিতেই হারাম হালাল বা বৈধ-অবৈধের সমস্ত সীমানা নির্ধারণ করে দেয় এবং ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ চিনে নেয়ার জন্য যাবতীয় নিদর্শন ও চিহ্নসমূহ প্রকাশ করে। কিন্তু একই সঙ্গে এতে এমন একটি সুগভীর দর্শন এবং অভিজ্ঞান বা হেকমতও বিদ্যমান, যা অর্জন করতে হলে হালকাভাবে অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট নয়, বরং যথেষ্ট মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-গবেষণা করা প্রয়োজন।

২. কোরআন মজীদ সম্পর্কে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, এটি শুধুমাত্র আইন-কানুন ও সংবিধান সম্বন্ধীয় একটি সংকলন এবং বিধি-নিষেধ কিংবা হারাম-হালাল জানার একটা শুষ্ক ও সহজ-সরল নিয়ম-পদ্ধতি। কোরআনের গঠন স্বয়ং তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী তিনটি অংশের দ্বারা হয়েছে। (১) আল্লাহ্র আয়াত অর্থাৎ, দলিল-প্রমাণাদি, (২) কিতাব অর্থাৎ, আইন-কানুন ও সংবিধান (৩) হেকমত অর্থাৎ শরীয়তের মূলতত্ত্ব এবং ধর্মের নির্যাস। প্রথম অংশটি ধর্মের যুক্তি, দ্বিতীয়টি ধর্মের ব্যবস্থা আর তৃতীয়টি হচ্ছে ধর্মের দর্শন। কাজেই কোরআন মজীদ একটি চিন্তা-গবেষণার বস্তু। এ জন্যেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তার একেকটি সূরার গবেষণায় আট-আটটি বছর কাটিয়ে দিতেন। তাঁরা তার জটিলতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশে মজলিস গঠন করতেন। মহানবী (সঃ)-এর কাছে তার জটিলতা নিরসনের জন্যে সাহায্য চাইতেন। বুদ্ধি-বৃত্তির প্রশান্তি, অন্তরাত্মার পবিত্রতা এবং পার্থিব জীবনে জীবিকা অর্জন ও রাজনীতির জন্যে একে সম্পূর্ণভাবে যথেষ্ট বিবেচনা করতেন। আর বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের উক্তি, "আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট"–এর অর্থও ছিল তাই যে, আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া বা ইহলোক ও পরলোক এবং জ্ঞান ও আত্মার যা কিছু চাহিদা, কোরআন সে সমস্তই নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে। এমন নয় যে, তাতে শরীরের জন্য সব কিছু আছে কিন্তু আত্মার প্রশান্তির কোন ব্যবস্থা নেই কিংবা হালাল-হারাম তথা বৈধ-অবৈধের নিয়ম-কানুন তো আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, যা আমাদের জীবিকার অন্বেষণে যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও চেতনার ব্যাকুলতা আর মন-মস্তিষ্কের জটিলতাসমূহকে এমনি ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলোর সমাধানের জন্য আমাদেরকে গ্রীক দার্শনিক

www.pathagar.com

তার্কিকদের যথেচ্ছ বক্তব্য আর সমকালীন গবেষণাবিদদের গবেষণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, তাও নয়।

৩. কোরআন মজীদে এমন একটি আয়াতও নেই, যাতে বুঝা যায় যে, এটি তো একটি স্থূল গ্রন্থ। বরং তার বিপরীতে এতে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যার প্রতিটি ভাষ্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা প্রয়োজন। চিন্তা-গবেষণা ছাড়া তার শিক্ষার তাৎপর্য বুঝে আসতে পারে না। যারা কোরআন মজীদকে কোন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ বলে মনে করেন না এবং

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

আয়াতটি দ্বারা নিজের সে ধারণার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন, তাদের সে যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও ভ্রান্ত। উল্লিখিত আয়াতের মর্ম তা নয়, যা সাধারণভাবে মনে করা হয়। এর মর্ম হচ্ছে, কোরআন মজীদকে আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে পর্যাপ্ত এবং অত্যন্ত উপযোগী করে তৈরী করেছেন। এই উদ্দেশে তা সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এতে কোন রকম কমতি নেই; কোন কিছুরই অভাব নেই। يسرنا শব্দটি শুধু তার সহজতাকেই প্রকাশ করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে তার পরাকাষ্ঠা, তার সামগ্রিকতা এবং তার উপযোগিতাও প্রমাণ করে। আর তাতেই তার সহজবোধ্যতা প্রকাশ পায়। কারণ, যাকে কোন একটি উদ্দেশের জন্য পরিপূর্ণভাবে সাবলীলও করে নেয়া হয়েছে, তা সে উদ্দেশে নিঃসন্দেহে সহজ-সরলও অবশ্যই হবে।

৪. যাঁরা কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে শুধুমাত্র রেওয়ায়েতের ওপরেই নির্ভর করেন, তাঁরা নিশ্চিতই বাড়াবাড়ি করেন। অথচ তা বিশেষজ্ঞ মত ও অনুসৃত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কোরআন মজীদের তফসীরের ব্যাপারে মূল ভিত্তি হচ্ছে স্বয়ং তারই শব্দ, তারই যুক্তি-প্রমাণ, তারই উপমা-উদাহরণ, তার আনুপূর্বিক যোগসূত্র এবং তারই বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা। প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই এসব বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কোন অবস্থাতেই এগুলোকে উপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে, রেওয়ায়েত ও হাদীসের সাহায্য ছাড়া কোরআনের তফসীরের জটিলতার সমাধান হতে পারে না। কোরআন মজীদ যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যেসব লোককে প্রাথমিক পর্যায়ে তাতে সম্বোধন করা হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই সে যুগের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য এবং সে জাতির সীমাহীন সমস্যার প্রতি তা ইঙ্গিত

www.pathagar.com

করেছে, যাকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরার জন্য আমরা তাদের সাহায্য গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে পারি না, যাঁরা কোরআনের প্রাথমিক লক্ষ্য। সে লোকদের সাহায্যে উপকৃত হওয়া কোরআনের শব্দাবলীর প্রাধান্যকে খর্ব করা নয়। আর তাতে তার অকাট্যতায়ও সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ, রেওয়ায়েত ও হাদীসের সাহায্য তখনই গ্রহণ করা হয়, যখন কোরআনের শব্দাবলীও তার সাহায্য গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করে।

এ দাবী স্বস্থানে যথার্থ যে, কোরআন মজীদ নিজের বোধগম্যতার জন্যে অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রেওয়ায়েত ও হাদীসের সাহায্য নেয়া কোরআনের মুখাপেক্ষিতার প্রমাণ নয়। বরং এতে আমাদেরই মুখাপেক্ষিতা প্রমাণ করে। আর আমাদের মুখাপেক্ষিতা এবং কোরআনের মুখাপেক্ষিতায় বিরাট পার্থক্য। আমরা কোরআন বুঝার জন্য ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির সাহায্য নেই, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, কোরআন নিজের বোধগম্যতার জন্য সেসব বিষয়ের মুখাপেক্ষী। কাজেই এতে কোরআন মজীদের পরিপূর্ণতায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

৫.শানে নুযূল দ্বারাও কোরআনের অকাট্যতায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। শানে নুযূলের তেমন কোন গুরুত্ব নেই যা সাধারণত মনে করা হয়। প্রামাণিকদের নিকট শানে নুযূল হচ্ছে আবিষ্কারধর্মী বিষয়। অর্থাৎ, "আয়াতটি অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে কিংবা অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে" বলে সাহাবায়ের কেরামের যে উক্তি, তার অর্থ এই নয় যে, সে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ হুবহু সে ঘটনাটিই। বরং তার অর্থ সাধারণত এই হয় যে, সে আয়াতটি অমুক নির্দেশ সম্বলিত। অতএব, বিষয়টির তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এ পথের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যায় এবং অতপর সেগুলোর দ্বারাও কোরআনের তফসীরের সেক্ষেত্রেই সাহায্য নেয়া উচিত যেখানে কোরআনের শব্দাবলীও তাই চায় এবং যেখানে কোন জটিলতার সমাধান হয়। বস্তুত এমন জায়গা হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ)-এর ভাষায় গোটা কোরআনে খুব বেশী নেই।

www.pathagar.com

তফসীরের মূলনীতি

بسم الله الرحمن الرحيم

তফসীরের মূলনীতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে সংক্ষেপে সেসব নিয়ম-পদ্ধতিরই বিশ্লেষণ করব, যা মহানবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পবিত্র যুগের পরে আমাদের বিভিন্ন মতাদর্শী তফসীরকার মনীষীবৃন্দ তফসীরের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন। তারপর সংক্ষেপে সেসব নিয়ম-পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করব। অতপর উপস্থাপন করব তফসীরের সেসব মূলনীতি, যা আমার মতে সঠিক, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমার মন সত্যায়ন করে এবং আমার জ্ঞানানুসারে সাহাবায়ে কেরামের আমলে যাঁরা ব্যাখ্যা করতেন তাঁরাও সর্বদা সেগুলোপ্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আলোচনার এই ধারায় এই সূত্রটি একদিকে আপনাদের সামনে সে সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতিগুলো তুলে ধরবে যা সাহাবাদের পরবর্তী যুগে আমাদের মুফাসসেরীন ও ব্যাখ্যাতাগণ গ্রহণ করেছেন এবং অপর দিকে সে সমস্ত উপকরণও সামনে একত্রিত হয়ে যাবে, যা বিভিন্ন মতাদর্শী তফসীরকারদের নিয়ম-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে তুলনা করার পক্ষে এবং সেগুলোর সুষ্ঠুতা ও অসুষ্ঠুতার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের ইতিহাসে বিভিন্ন ভাষায় তফসীর সম্পর্কিত যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, সে সবগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে যদি সেগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সামনে রেখে প্রত্যেকটিকে পৃথক করে নেয়া যায়, তা হলে আমাদের সামনে চারটি বড় রকমের মতাদর্শ আপন আপন বিশেষ মূলনীতিসহ প্রকাশিত হয়ে ওঠবে। এখানে আমি সংক্ষেপে সেই চারটি মতাদর্শ এবং তাদের তফসীর পদ্ধতিগুলোর সাথে পাঠকদের পরিচয় করাব।

মুহাদ্দেসীন ও রেওয়ায়েতাশ্রয়ীদের তফসীর পদ্ধতি ঃ

আমাদের তফসীরকারদের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য দল হল মুহাদ্দেসীনও রেওয়ায়েতাশ্রয়ীদের। এ দলের তফসীর পদ্ধতি হচ্ছে, তফসীরের ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে মহানবী (সঃ)-এর বাণী, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর

www.pathagar.com

বিবৃতি এবং তৎপরবর্তী মুফাস্‌সেরীনের বাণীর ওপর নির্ভর করা। অতএব, তাঁদের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা ছিল প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাতাদের যত মত সংগৃহীত হয়েছে তার সবই জমা করে দেয়া। পক্ষান্তরে, সেসব মতামত অনেক সময় পারস্পরিক সম্পূর্ণ বিরোধীও হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাতে কোন রকম সামঞ্জস্য বিধানেরও চেষ্টা করা হয়নি। এই নীতিতে সবচেয়ে বড় যে তফসীর প্রণীত হয়েছে এবং আজও বর্তমান, তা হল ইবনে জারীর (রঃ)-এর বিখ্যাত তফসীর। এতে তফসীর সংক্রান্ত সমস্ত রেওয়ায়েত এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মনীষীবৃন্দের যাবতীয় মতামতের এক বিরাট ভাণ্ডার বর্তমান। পাঠক এতে প্রতিটি আয়াতের প্রেক্ষিতে একাধিক মতামত পেতে পারন। কিন্তু এই পার্থক্য করা সম্ভব হবে না যে, সেগুলোর কোন্‌টি সঠিক আর কোন্‌টি সঠিক নয়। রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে যেসব তফসীর এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের উৎসই হচ্ছে উল্লিখিত তফসীরখানি। প্রদীপ থেকে যেমন করে প্রদীপ জ্বালিয়ে নেয়া হয়, তেমনি করে এ গ্রন্থেরই আংশিক বর্জন ও সংক্ষেপায়নে বহু গ্রন্থ তৈরী হয়ে গেছে। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর বিখ্যাত তফসীরখানিও সে তফসীর থেকেই সংগৃহীত।

দার্শনিকদের পদ্ধতি ঃ

মুসলমানদের সম্পর্ক যখন অনারবদের সাথে গড়ে ওঠে এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে যখন তাদের পরিচয় ঘটে, তখনই ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার সে দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে, যাকে আমরা ইলমে কালাম বা দর্শনশাস্ত্র বলে অভিহিত করি। এই দর্শনশাস্ত্রও আমাদের মধ্যে বহু মতাদর্শের জন্ম দিয়েছে এবং সেসব মতাদর্শের অনুসারীরা নিজেদের বিশেষ মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশে কোরআন মজীদের তফসীর প্রণয়ন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব তফসীরের উদ্দেশ্য কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেয়ে বেশী ছিল সে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে দলিল-প্রমাণ সংগ্রহ করা, যা এসব তফসীরের প্রণেতাগণ নিজেদের দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে যেসব তফসীর প্রণীত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ তফসীর হচ্ছে দুটি। একটি আল্লামা যামাখ্‌শরী (রঃ) প্রণীত 'তফসীরে কাশশাফ' এবং অপরটি ইমাম রাযী (রঃ) প্রণীত

www.pathagar.com

'তফসীরে কবীর'। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটি মু'তাযেলা মতাদর্শের মুখপত্র আর দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আশায়েরা মতাদর্শের ওকালতি করা হয়েছে। রেওয়ায়েতভিত্তিক তফসীরের ক্ষেত্রে ইবনে জারীর (রঃ)-এর তফসীরের যে মর্যাদা, দার্শনিক পদ্ধতিতে প্রণীত তফসীরসমূহের মধ্যেও ইমাম রাযী ও আল্লামা যামাখশারীর তফসীরের মর্যাদা তেমনি। আর পরবর্তীকালে যাঁরা এই পদ্ধতিতে তফসীর প্রণয়ন করেছেন, তাঁরা প্রধানত এ দুটির চর্বিতই চর্বণ করেছেন মাত্র।

মুকাল্লেদ বা অনুসরণবাদীদের পদ্ধতি ঃ

মুকাল্লেদ বা অনুসরণবাদী বলতে আমাদের উদ্দশ্য ফেকাহ্শাস্ত্রের ইমাম মহোদয় কিংবা ফেকাহ্র কিতাবের অনুসরণ নয়, বরং মুফাস্সেরীনের গ্রন্থের অনুসরণ। ইবনে জারীর (রঃ), ইমাম রাযী (রঃ) এবং আল্লামা যামাখশারী (রঃ)-এর পরে তফসীরের যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই উপরোল্লিখিত তফসীরত্রয় থেকেই গৃহীত এবং সেগুলোরই সার-সংক্ষেপ। সেগুলোর পর এমন তফসীর খুব কমই লেখা হয়েছে, যার স্বতন্ত্র কোন ভিত্তি রয়েছে। এমনকি ধীরে ধীরে তফসীর প্রণয়নের সাধারণ নিয়মই দাঁড়িয়ে যায় যে, যাই কিছু লেখা হোক না কেন, উল্লিখিত তফসীরের যেকোন একটির সনদ অনুসারে লেখতে হবে। কোরআনের কোন অনুবাদ কিংবা তার কোন তফসীরকে প্রামাণ্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করা হতে থাকে যে, প্রতিটি বিষয়ের সনদ তফসীরের পূর্ববর্তী কোন না কোন গ্রন্থে পাওয়া যাবে। কাজেই আমাদের এ যুগে কোরআন মজীদের যেসব তরজমা বা তফসীর প্রকাশিত হয়েছে, সেসবের সবচাইতে বড় কোন বৈশিষ্ট্যের কথা যদি উল্লেখ করা যায়, তা হলে সম্ভবত তা হচ্ছে এসব তরজমা বা তফসীরের প্রতি পূর্ববর্তী তফসীরের সমর্থন রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউই সেই সীমানা অতিক্রম করতে সাহস করেননি, যা ইবনে জারীর, ইমাম রাযী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম শাওকানী ও ইমাম বয়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। সাধারণত তরজমা কিংবা তফসীরের বেলায় সেসব মতের উর্ধ্বে কোন কথা বলার বা মত প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করা হয় না, যা পূর্ববর্তী তফসীরসমূহের কোন একটি থেকে উদ্ধৃত হয়ে থাকে। এমন উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যাবে যে, এই সহজ ও নিরাপদ পন্থা ছেড়ে কোরআনের জটিলতাসমূহের সমাধানের পথে কোন দুঃসাহসী পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

আধুনিকতাবাদীদের পদ্ধতি ঃ

আধুনিকতাবাদী বলতে সেসমস্ত লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মতবাদে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কিছু কিছু বিশেষ মতার্দশ তৈরী করে নিয়েছেন এবং তারই ভিত্তিতে কোরআন মজীদকে ঢেলে সাজাতে প্রয়াস পেয়েছেন। আর এতে তারা ক্ষেত্রবিশেষে এমনি বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছেন যে, অন্যান্য যাবতীয় বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণভাবে চোখ বন্ধ করে নিয়েছেন। এমনিভাবে আধুনিকতাবাদীরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মতাদর্শকে নিজেদের পথনির্দেশক নির্ধারণ করে একান্ত নির্দয়তার সাথে কোরআনকেও সেই মতাদর্শের পেছনে পেছনে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের সমাজে এই তফসীর পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুম। তারপর থেকে এই ফেতনা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। আল্লাহই বলতে পারেন, তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আর কতকাল এ ধরনের মূর্খ ও প্রবৃত্তির দাসদের যথেচ্ছ বিচরণের ক্ষেত্র হয়ে থাকবে।

উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের ওপর পর্যালোচনা ঃ

এবার আমরা উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, এগুলোর প্রকাশ্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো কি কি?

সর্বাগ্রে রেওয়ায়েতাশ্রয়ীদের পদ্ধতিকেই ধরা যাক। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উল্লিখিত সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে এটাই সর্বাধিক পবিত্র ও নিরাপদ তফসীর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তফসীর করতে গিয়ে রসূলে করীম (সঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের বাণী ও মতামতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর এ কথা সকলেই জানেন যে, কোরআন মজীদের তফসীর করার অধিকার হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর চাইতে বেশী আর কারোই থাকতে পারে না। তাই নবী করীম (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর তফসীর অপেক্ষা যথার্থ ও বিশুদ্ধ তফসীরও অন্য কারও হতে পারে না। কিন্তু এ পদ্ধতিতে কয়েকটি ত্রুটিও রয়েছে, যা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না।

১. তফসীরের ক্ষেত্রে হুযুরে আকরাম (সঃ) থেকে ধারাবাহিক বর্ণনা খুব কমই রয়েছে। তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর তফসীর সংক্রান্ত বর্ণনাও খুব

www.pathagar.com

বেশী নেই। তাই আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহ পরবর্তী ব্যাখ্যাতাদের মতামত ও বর্ণনায় ভরপুর হয়ে আছে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরবর্তী ব্যাখ্যাতাদের সে মর্যাদা কোথায়, যাতে তফসীরের বেলায় সেগুলোর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যাবে।

২. তদুপরি আমাদের মুহাদ্দেসীন (রঃ)-এর বর্ণনামতেও তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলোতে সাবধানতার প্রতি ততটা লক্ষ্য রাখা হয়নি, যতটা রাখা হয়েছে সাংবিধানিক ও আইন-কানুন সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের প্রতি। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূহের অমৌলিকতার ব্যাখ্যা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই জানেন। কাজেই আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহ যেসব ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতে ভরে রয়েছে, সেগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধের পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন।

৩. এসব রেওয়ায়েতের পরীক্ষা-পর্যলোচনা করে তাতে যে সারবস্তু রয়েছে, যদি সেগুলো পৃথক করা সম্ভব হয়ও, তবুও এককভাবে সেগুলোকে তফসীরের জন্য সিদ্ধান্তমূলক বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কারণ, এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে পরিপূর্ণভাবে টিকে যাবার পরেও ধারণার সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। কাজেই যদি কোরআন মজীদের তফসীরের ক্ষেত্রে এককভাবে এগুলোকেই সিদ্ধান্তসূচক বিষয় হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তা হলে কোরআন মজীদের অকাট্যতাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা কোনক্রমেই সহ্য করা যায় না। সুতরাং অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের সমন্বয়ে নিঃসন্দেহে এসব রেওয়ায়েত কোরআন মজীদের সঠিক মর্ম সাব্যস্তকরণে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এককভাবে এগুলোর সাহায্যে কোন অকাট্য সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

৪. আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহে একটি আয়াত, বরং কোন কোন সময় একেকটি শব্দের ব্যাপারে ব্যাখ্যাতা-বিশ্লেষকদের একাধিক বক্তব্য কোন রকম দলিল-প্রমাণের আলোচনা ব্যতিরেকেই উদ্ধৃত করে দেয়া হয়। এসব বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধীও হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তফসীরের এই পদ্ধতি একান্তই ভুল। কোরআন মজীদ যেহেতু প্রমাণের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অকাট্য, সেহেতু উল্লিখিত একাধিক বক্তব্যের মধ্য থেকে সেগুলোই

www.pathagar.com

গ্রহণ করা কর্তব্য যা কোরআন মজীদের পূর্বাপর ধারাবাহিকতা এবং অন্যান্য নিদর্শনাবলী অনুযায়ী প্রমাণিত হবে। অন্যথায় কোরআনের অকাট্যতা আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

এবার ধরা যাক দার্শনিকদের তফসীর পদ্ধতি। দার্শনিকদের পদ্ধতিতে মৌলিক ত্রুটি হচ্ছে এতে নিজেদের দার্শনিক মতাদর্শকে ভিত্তি সাব্যস্ত করে কোরআনকে সে অনুযায়ী তৈরী করে নিতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং যেখানেই কোরআন তাদের মতাদর্শের সাথে অসমঞ্জস হয়েছে, সেক্ষেত্রে নিজেদের মতাদর্শের সংশোধন করার পরিবর্তে এবং কোরআনকে কোরআনের মত থাকতে দেয়ার পরিবর্তে কোনক্রমে কোরআনকে ভেঙ্গেচুরে নিজেদের মতাদর্শের অনুযায়ী করে তোলাই ছিল তাঁদের একান্ত প্রচেষ্টা। পূর্বসূরি মনীষীবৃন্দের বক্তব্য থেকেও তাঁরা সেটুকুই গ্রহণ করেছেন, যাতে তাঁদের নিজেদের মতাদর্শের সমর্থন পাওয়া গেছে। আর যেসব বক্তব্য তাঁদের মতের বিরোধী, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ধরনের বহু উদাহরণ আমরা ইমাম রাযী (র়াঃ)-এর তফসীরে পেতে পারি। তিনি অনেক সময় 'আশায়েরা' মতাদর্শের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে তফসীরের সীমাকে এমনভাবেই লংঘন করেছেন যে, কোন আয়াত যদি পরিষ্কারভাবে আশায়েরা মতবাদের বিরোধী পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হলে তার খণ্ডন করতে গিয়ে এমন কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করতেন না যে, আমাদের যে মূলনীতি দার্শনিক দলিল-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তা শুধুমাত্র এ কারণে আহত হতে পারে না যে, একটি আয়াতের শব্দাবলী তার বিরোধী–যার প্রমাণ সম্পূর্ণত শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভরশীল। অথচ তফসীরের এহেন প্রবণতার ফলে কোরআন যে একটি হেদায়াতদানকারী কিতাব তার যথার্থতা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদকে পথপ্রদর্শক এবং নেতৃত্বের মর্যাদা হারিয়ে কতিপয় দার্শনিক মতবাদের অনুসারী হয়ে চলতে হয়। আর অন্য শব্দে বলতে গেলে, এটা কোরআন যে আল্লাহ্র কালাম প্রকারান্তরে তারই অস্বীকৃতি।

অতঃপর তফসীরের গ্রন্থাবলীর অনুসারীদের পদ্ধতিটিতেও যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান, তা ফেকাহশাস্ত্রের ইমাম বা ফেকাহশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের অনুসারীদের মাঝেও রয়েছে। ফেকাহশাস্ত্রের ইমামগণ কিংবা ফেকাহ গ্রন্থসমূহ যেমন নিজস্বভাবে কোন সনদ নয়, বরং প্রকৃত সনদ হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম ও মহানবীর হাদীস বা সুন্নাহ এবং ফেকাহ শাস্ত্রের ইমাম কিংবা গ্রন্থের যেমন

www.pathagar.com

শুধুমাত্র সেটুকুই অনুসরণযোগ্য যেটুকু কোরআন ও সুন্নাহর কষ্টি পাথরে যাচাইয়ের দ্বারা প্রমাণিত, তেমনিভাবে আমাদের তফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যেও নিজস্ব পরিমন্ডলে কোন একটিরও সনদ হওয়ার উপযোগিতা নেই; সেগুলোরও সেসব কথাই যথার্থ ও সঠিক হতে পারে যা যথার্থ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও রেওয়ায়েতের কষ্টি পাথরের যাচাইয়ে টিকে থাকবে। সেজন্যই শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথার্থতার প্রমাণ হতে পারে না যে, ইমাম রাযী (রঃ) কিংবা ইবনে জারীর (রঃ)-এর তফসীরে তা রয়েছে। বরং তা সঠিক কিনা তার ফয়সালা করার জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যান্য সূত্রের সাহায্য নিতে হবে।

আধুনিকতাবাদীদের পদ্ধতিতেও হুবহু সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতিই রয়েছে যা মুতাকাল্লেমীন বা দার্শনিকদের পদ্ধতিতে বিদ্যমান। দার্শনিকরা যেমন গ্রীক দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কিছু বিশেষ বিশেষ মতাদর্শ তৈরী করে নিয়ে সেগুলোকে শরীয়তের সার্টিফিকেট দেয়ার উদ্দেশ্যে ভেঙ্গেচুরে দিয়েছেন, তেমনিভাবে যারা পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন, তাঁরাও নিজেদের সেসব মতামত কিংবা চিন্তাধারাকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াসে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে কোরআন মজীদের ওপর হাত সাফাই করেছেন। মিসরের আল্লামা তানতাভী এবং ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুম এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা যা কিছু লিখেছেন, তা পড়লে অনুমান করা যাবে যে, আমাদের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা তবুও কিছুটা মান রেখেছিলেন; তাঁরা নিজেদের মতবাদের সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের ভাষা, ব্যাকরণ, বর্ণনাধারা কিংবা অন্তত আনুক্রমিক হাদীস বা সুন্নাহর প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের আধুনিকতানুরাগীরা যাবতীয় সীমার বাঁধন ছিন্ন করেছেন এবং এমনি নির্লজ্জভাবে ছিন্ন করেছেন যেন মনে হয়, তাদের ধারণা মতে বর্তমান জগতে পড়ালেখা জানা লোকই রয়নি। বলাবাহুল্য, এ ধরনের তফসীরকে তফসীর বলাই ঠিক নয়, বরং এগুলোকে কোরআনের বিকৃতি বলাই বাঞ্ছনীয়।

তফসীরের বিশুদ্ধ মূলনীতি ঃ

এখন আমরা পাঠকবর্গের সামনে তফসীরের সে মূলনীতি উপস্থাপন করব, যা আমাদের মতে সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং যার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেয় আমাদের বুদ্ধি ও আমাদের জ্ঞান এবং যা রেওয়ায়েত অনুসারেও বিশুদ্ধ বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

আমাদের মতে এ মূলনীতিগুলোর প্রতিই আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীরাও লক্ষ্য রেখেছিলেন।

এসব মূলনীতি দু'প্রকার ঃ প্রথমত সেগুলো— যাতে কারও কল্পনা বা সন্দেহ-সংশয়ের কোনই হাত নেই; সেগুলো কোন প্রকার মতপার্থক্য ব্যতিরেকেই কোরআনের তফসীরের উৎস। এসব মূলনীতির সাহায্যে যে তফসীর প্রণীত হবে, আমাদের ব্যবহারিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আমাদের জ্ঞানের অভাবের দরুন অবশ্য তাতেও ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ থাকবে, কিন্তু মূলনীতির নিরিখে তাই হবে বিশুদ্ধ ও সঠিক তফসীর। তাছাড়া নিজের ফলাফলের দিক দিয়েও তা বিশুদ্ধতার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হবে।

দ্বিতীয়ত সেসব মূলনীতি, যা কল্পনাপ্রসূত। অর্থাৎ, কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সেগুলো যথেষ্ট সহায়ক তো বটেই এবং সেগুলোর নির্দেশনায় উদ্দেশের বিকাশ ও জটিলতার সমাধানে মূল্যবান সাহায্যও লাভ হয়। কিন্তু যেহেতু এতে কল্পনা বা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ রয়েছে, কাজেই সেগুলোর নির্দেশনা শুধুমাত্র ততটুকুই নেয়া উচিত, যতটা কোরআনের মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং তাতে কোরআনের কোন ইঙ্গিত কিংবা সংকেতের বিকাশ ঘটে।

তফসীরের চারটি চূড়ান্ত মূলনীতি ঃ

তফসীরের চূড়ান্ত চারটি মূলনীতি সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবেই আলোচনা করব। কিন্তু কোরআনের তফসীর করতে গিয়ে সেগুলোর ব্যবহার হবে একই সঙ্গে। আর একত্রে ব্যবহার হলেই সেগুলোর মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে, যাতে সেগুলো সন্দেহাতীত হয়ে ওঠবে। পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করা হলে সেগুলোর অধিকাংশই নিজের অকাট্যতা হারিয়ে ফেলবে।

প্রথম মূলনীতিটি হল— তফসীরের উৎস হিসেবে সে ভাষাকে সাব্যস্ত করা যাতে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এখানে আমাদের উদ্দেশ্য সে সাধারণ আরবী ভাষা নয়, যাতে ইদানীংকালে লেখা বা কথা বলা হয়। বর্তমান আরবী ভাষার সাথে কোরআন মজীদের আরবী ভাষার সম্পর্ক নিতান্ত অল্প। কোরআন মজীদ যে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা বর্তমান মিসর ও সিরিয়ার পত্র-পত্রিকা কিংবা সেখানকার লেখক-গ্রন্থকারদের রচনায় খুঁজে পাওয়া

www.pathagar.com

যাবে না, বরং সে জন্য ইমরাউল কাইস, লাবীদ, যুহাইর, আমর ইবনে কুলসুম, হারেস প্রমুখ এবং আরবের জাহেলিয়াত আমলের খতীব-বক্তাদের বক্তব্যের অন্বেষণ করতে হবে। আর সে বক্তব্যের সাথে এমন গভীর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে আসল-নকলের পার্থক্য করা যায়। তার বর্ণনাভঙ্গি এবং পারিভাষিক বিষয়গুলো বুঝতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। তার ভাল-মন্দ দিকগুলো যাতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। তার ভেতরে সন্নিহিত সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা, তার ইশারা-ইঙ্গিত প্রভৃতি বুঝতে যাতে কোন জটিলতা না থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজটি যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু যারা কোরআন মজীদ বুঝতে চান, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা এই কঠিন বিষয়টিকে নিজের জন্যে সহজ করে নিতে পারবেন, কোরআন মজীদ বুঝার ব্যাপারে তফসীর ও অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না।

কোরআন মজীদের শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির মর্ম নির্ধারণ করতে হলে শব্দ কিংবা বর্ণনাভঙ্গির সে অর্থটিই গ্রহণ করা কর্তব্য, যা বক্তব্যের সাধারণ ব্যবহারে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। পক্ষান্তরে সে অর্থ কিছুতেই গ্রহণ করা চলবে না, যা অপ্রচলিত। কোরআন মজীদ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার শব্দ বিরল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এই মূলনীতিটির প্রতি যাঁরা লক্ষ্য রাখেননি, তাঁরা অনেক সময় শব্দের এমন অর্থও গ্রহণ করেছেন, যা সাধারণত আরবী ভাষায় প্রচলিত নয়। এ ধরনের ভুলের পরিণতি অবশ্য তেমন আশঙ্কাজনক নয়। বেশীর চাইতে বেশী কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে অপ্রচলিত অর্থ ধরে নেয়া হয়। কিন্তু এভাবে শব্দের বিরল অর্থ ধরে নিয়ে গোমরাহ বা পথভ্রষ্টের দল যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তার হিসাব নিলে বুঝা যায়, প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে বিরল অর্থ ব্যবহার করার ফেতনা ধর্মের ওপর কত কঠিন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কোরআনের ব্যাকরণের ব্যাপারেও সবচেয়ে নিরাপদ ও সন্তোষজনক পন্থা হল, ব্যাকরণের সাধারণ গ্রন্থের পরিবর্তে এর উৎস হিসেবে আরবী বক্তব্যকে গ্রহণ করা। আমাদের ব্যাকরণবিদরা অনুসন্ধান ও গবেষণা স্বল্পতার দরুন কোরআনের অনেক ব্যবহারকে বিরল ব্যবহারের আওতায় উল্লেখ করেছেন। অথচ কোরআন মজীদ আরবের প্রচলিত রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই প্রচলিত রীতি হবে এক রকম আর কোরআন মজীদের রীতি হবে অপ্রচলিত, এমন হতেই পারে না।

www.pathagar.com

মওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) এমন বহু রীতিকে প্রচলিত বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন, যেগুলো ব্যাকরণবিদরা অপ্রচলিত বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। এর উপকারিতা শুধু এই নয় যে, কোরআন মজীদের গৃহীত রীতিসমূহ বিরল ও ব্যতিক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকায় পরিগণিত হওয়ার পরিবর্তে প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির প্রাথমিক তালিকায় পরিগণিত হতে পারে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথার্থ অর্থ নির্ণয় এবং সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচনেও তা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্যেই একে সাধারণ জ্ঞানগত প্রচেষ্টা মনে করে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

ভাষার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের সাথেও যোগাযোগ ঘটবে। বিশেষত এ কারণে যে, আমরা মুসলমানরা কোরআন মজীদকে একটি মু'জেযা বা অলৌকিক বিষয় হিসেবে মান্য করি এবং দাবীও করি যে, কোরআন মজীদের বাগ্মিতা, বাক-চারুতা ও সালঙ্কারত্বের কোন তুলনাই নেই। বলাবাহুল্য, কোরআন মজীদের এসব গুণাবলী যাচাই করার জন্য যে শাস্ত্র সর্বাধিক কার্যকর, তা হল অলঙ্কারশাস্ত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবেই সেসকল নীতিনির্ভর, যা গ্রীকদের থেকে নেয়া হয়েছে। সুতরাং এ শাস্ত্রটি গ্রীক সাহিত্যের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং অলংকার যাচাইয়ের মানদন্ড হতে পারে, কিন্তু একে কোরআনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্কার যাচাইয়ের কষ্টি সাব্যস্ত করা তা কয়লা মাপার পাল্লা দিয়ে স্বর্ণ বা আশরফী ওজনের অপচেষ্টারই নামান্তর হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের শাস্ত্রীরা এ শাস্ত্রকে আরবী ভাষার সাহিত্যিক চাহিদা এবং তার বিশেষ ঝোঁক ও অনুরাগসমূহের সাথে পরিচিত করে তোলার চেষ্টায় ত্রুটি করেননি, যাতে আরবী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যাচাইর ব্যাপারেও কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে আরবী কাব্যধারার সীমা থেকে অগ্রসর হননি। এতেও তাঁরা অতটুকুই সফল হয়েছেন, দুটি অসমঞ্জস বস্তুর সম্মিলন ঘটাতে গিয়ে কেউ যতটুকু সফল হতে পারেন। যাই হোক, এ শাস্ত্রের দ্বারা যদি কিছু সম্ভব হয়ও, তবে শুধু আরবী কাব্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের নির্ণয় সম্ভব হতে পারে, কিন্তু কোরআন মজীদের সাহিত্যিক সৌন্দর্য-সৌকর্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এর দ্বারা সম্ভব নয়। বরং তাতে সবচাইতে বড় আশঙ্কা এই যে, যদি এ শাস্ত্র সামনে রেখে কোরআন মজীদের গুণ-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়, তা হলে কোরআনকে মু'জেযা হিসেবে মেনে নেয়া তো দূরের কথা, তাকে অলঙ্কার ও ভাষাশিল্পের দিক দিয়ে একটা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ বলে অস্বীকার করে বসাও বিচিত্র

www.pathagar.com

নয়। কোরআন মজীদ এমন একটা কালাম বা বাণী, যা ওহীর উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে, যা আরব-আজমের সর্বাধিক সুবক্তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, যাতে সাগরের গতি এবং ঝড়ের শক্তি রয়েছে, যা বিদ্যুত চমকের মত সমগ্র আরব ভুমিকে প্রকম্পিত করে দিয়েছে এবং মুহূর্তের মধ্যে একেকজন মহাজ্ঞানীর মন-মস্তিষ্ক বদলে দিয়েছে। এমন গ্রন্থের সাহিত্যিক গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান অলঙ্কারশাস্ত্রের মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে চেষ্টা করা গজ নিয়ে আকাশসমূহের পরিধি পরিমাপের চেষ্টারই শামিল।

এখানে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এ বিষয়ে মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ)-এর কিতাব 'বালাগাত' প্রকাশিত হয়েছে। এতে মাওলানা সাহেব প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের বিস্তারিত সমালোচনার পর কোরআনের অলঙ্কার যাচাইয়ে তার অপরাগতা প্রমাণ করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সেসব মূলনীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা কোরআনে হাকীমের ভাষা অলংঙ্কার যাচাইয়ের মাপকাঠির ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন যে কাজটি বাকী রয়ে গেছে তা হল, মাওলানা সাহেব যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, কোরআনের গবেষণা এবং জাহেলিয়াত যুগের আরব কথাশিল্পী ও কবিদের কথা ও কাব্য অনুসারে সে মূলনীতিসমূহের অধিকতর উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ একত্রিত করে দেয়া, যাতে এ শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীরা সহজে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এটা আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহ যে, এদিকে কিছু দিনের মধ্যে জাহেলিয়াত আমলের সাহিত্যসম্ভার থেকে বেশ কিছু অংশ প্রকাশিত হয়ে গেছে, যা এ কাজে জ্ঞানী-মনীষীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

কোরআনের বিন্যাস ঃ

কোরআন মজীদ বুঝার ক্ষেত্রে অপর যে বিষয়টির প্রতি সতর্কতা অপরিহার্য এবং যা যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ধারণে একটি সিদ্ধান্তমূলক কারক হিসাবে গণ্য হতে পারে, তা হল বক্তব্যের বিন্যাস। বিন্যাস অর্থ হল, প্রতিটি সূরারই একটা বিশেষ স্তম্ভ বা বিষয়বস্তু থাকা এবং সূরার সমস্ত আয়াত অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতার সাথে সেই বিষয়বস্তুটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা। সূরাটির বারংবার পাঠের ফলে যখন সূরার স্তম্ভটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সূরার আয়াতগুলোর সম্পর্কও যখন তৎসঙ্গে সামনে এসে যায়, তখন সূরাটি বিভিন্ন

www.pathagar.com

আয়াতের একটি সংমিশ্রণের পরিবর্তে অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠিত একটি একক পরিণত হয়। কোরআন বুঝার জন্য এই বিন্যাস বুঝা প্রাথমিক বিষয়। যতক্ষণ না এই বিন্যাসটি বুঝে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সূরার প্রকৃত মূল্যায়ন এবং তার প্রকৃত দর্শনই পরিষ্কার হতে পারে না; সে সূরার বিভিন্ন আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণও সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়টি যথেষ্ট কঠিন। সেজন্যেই আমাদের মহামান্য তফসীরকারগণ সেদিকে খুব কমই মনোযোগ দিয়েছেন। আর কেউ কেউ কিছুটা মনোযোগ দিয়ে থাকলেও তা ছিল একান্তই ভাসা ভাসা। ফলে তাঁরাও এ বিষয়ে তেমন লাভজনক কোন অবদান রাখতে পারেননি। বরং তাঁরা একটি সূরার বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন তা একান্ত লৌকিকতা বলেই প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের সম্পর্ক যেকোন দুটি বিষয়ের মধ্যে স্থাপন করা যেতে পারে, তা সেগুলো পরস্পর যতই সম্পর্কহীন হোক না কেন। 'নযমে কোরআন' বা কোরআনের বিন্যাস বলতে আমাদের উদ্দেশ্য এই ধরনের লৌকিক বিন্যাস নয়; বরং সে বিন্যাসই আমাদের উদ্দেশ্য যা কোন উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞজনোচিত নিবন্ধে হতে পারে এবং মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) তাঁর তফসীর 'নিযামুল কোরআন'-এ তা তুলে ধরেছেন।

সাধারণভাবে যেহেতু তফসীরকার আলেমগণ বিষয়টির প্রতি খুবই অল্প মনোযোগ দিয়েছেন, এমনকি অনেকে কোরআনের অবিন্যস্ততাকেই তার নিপুণতা বলে সাব্যস্ত করেছেন, সেজন্যে অনেকে কোরআনে বিন্যাসানুসন্ধানকে নিষ্প্রয়োজন প্রয়াস বলে গণ্য করেন। তাঁদের মতে কোরআন মজীদে বিন্যাস অনুসন্ধান করতে যাওয়া পাহাড় খুঁড়ে মূষিক বের করারই মত। তাঁদের মতে কোরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা বিক্ষিপ্ত উপদেশ ও বিধি-নিষেধ সম্বলিত নির্দেশ সমষ্টি এবং এদিকটি সামনে রেখেই তার তেলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। বলাবাহুল্য, এ ধরনের যাঁদের ধারণা (এবং এদের সংখ্যাই বেশী), তারা এতটা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করতে পারেন না, যা কোরআনের বিন্যাস অনুসন্ধান করতে প্রয়োজন। সে কারণেই সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, মানুষের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয়া যে, কোরআনের মধ্যে বাস্তবিকই বিন্যাস রয়েছে। এখানে আমরা কোরআনের বিন্যস্ততার কিছু যুক্তি-প্রমাণ পেশ করব।

১. এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে বিভ্রান্তির অপনোদন প্রয়োজন তা হচ্ছে কোরআন মজীদে বিন্যাসের দাবীদার আলেমগণ শুধু এ যুগেই আবির্ভূত হননি; বরং পূর্বেও

www.pathagar.com

অনেকে এ দাবী করেছেন এবং কেউ কেউ কোরআনের বিন্যাস সম্পর্কে গ্রন্থও রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) তাঁর 'এতকান' -এ লেখেছেন ঃ

"আল্লামা আবু জাফর ইবনে জুবাইর আবু হাইয়্যান কোরআনের বিন্যাস সম্পর্কে একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার নাম রেখেছেন "আলবুরহান ফী মুনাসিবাতি তারতীবে সূরাতিল কোরআন'। আর আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে শায়েখ বোরহানুদ্দীন বাকায়ীর তফসীর 'নাজমিদ্দুরার ফী তানাসিবিল আয়াতে ওয়াস্সূয়ার' গ্রন্থটিও এ বিষয়েই লিখিত হয়েছে।"

আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) এ বিষয়ে নিজের একটি গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি কোরআনের বিন্যাস ছাড়া কোরআনের অলৌকিকত্বের বিষয়টিও বিশ্লেষণ করেছেন এবং সে প্রসঙ্গেই কোরআনের সুবিন্যস্ততার গুরুত্ব তিনি নিম্নলিখিতভাবে স্বীকার করেছেন ঃ

"শৃংখলা ও বিন্যাসের জ্ঞানটি অত্যন্ত উত্তম জ্ঞান। কিন্তু বিষয়টি কঠিন হওয়ার কারণে তফসীরকারগণ এর প্রতি খুব কমই মনোনিবেশ করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী নিয়মানুবর্তী ছিলেন। তিনি বলতেন, "হেকমতে কোরআন বা কোরআনী জ্ঞানের প্রকৃত ভান্ডার তার ধারাবাহিকতা ও বিন্যাসের ভেতরেই লুকিয়ে আছে।"

ইমাম রাযী (রঃ) তাঁর তফসীরে বিন্যাসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা তেমন একটা লাভজনক প্রমাণিত হয়নি। কারণ, কোরআনের বিন্যস্ততা প্রতীয়মান করার জন্য যে পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, সেজন্যে তাঁর মত পরিব্যস্ত লোকের পক্ষে সময় দেয়ার অবকাশ ছিল না। তথাপি এ বিষয়টির গুরুত্ব তিনি যতটা অনুভব করতেন তাঁর তফসীরের জায়গায় জায়গায় তা প্রকাশ করেছেন। অতএব ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তিনি লেখেছেন-

"অনেকে বলেন, এ আয়াতটি সেসব লোকের উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে যারা দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে বলত যে, কোরআন যদি অনারব ভাষায় অবতীর্ণ হত তবেই ভাল ছিল। কিন্তু এ ধরনের কথা বলা আমার মতে আল্লাহর কিতাবের প্রতি কঠিন অবিচার। এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, কোরআনের আয়াত-গুলোতে একটির সাথে অপরটির কোন যোগসূত্রই নেই। অথচ এতে কোরআনে হাকীমের ওপর একটা বিরাট আপত্তি উত্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় কোরআনকে মু'জেযা বলে মেনে নেয়া তো দূরের কথা, একে একটা বিন্যস্ত গ্রন্থ্ বলাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমার মতে সঠিক বক্তব্য হল, এই সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত কালাম। অতপর তিনি প্রায় আঠারটি ছত্রে সূরার সংক্ষিপ্ত তফসীর লেখে বলেন ঃ "যেসব লেখক বাস্তব সত্য অস্বীকারে অভ্যস্ত নন, তাঁরা স্বীকার করে নেবেন যে, সূরাটির তফসীর যদি সেভাবে করা হয় তা হলে সমগ্র সূরাটিকে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত দেখা যাবে এবং এর প্রতিটি আয়াত একই তাৎপর্যের ইঙ্গিত করবে।"

এ পর্যায়েরই একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ লেখক হচ্ছেন আল্লামা মখদুম মহায়েমী (রঃ)। তাঁর তফসীর 'তাফসীরুর রাহমান ওয়া-তাইসীরুল মান্নান।' সেটি 'তফসীরে মহায়েমী' নামে প্রসিদ্ধ। তাতে তিনি কোরআনের আয়াতসমূহের বিন্যস্ততার বর্ণনা দিতে যথাসাধ্য চেষ্ট করেছেন। তবে একথা স্বতন্ত্র যে, সে প্রশ্নে তিনি সফল হয়েছেন কিনা? আর যদি হয়েও থাকেন তবে কতটা?

এ মতেরই আরেক মনীষী আল্লামা ওলীউদ্দীন মালভী। কোরআনের বিন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই ঃ

"যারা মনে করেন, কোরআনের অবতরণ যেহেতু সময় ও অবস্থার দাবী অনুসারে অল্প অল্প করে হয়েছে, সেহেতু এতে বিন্যস্ততার সন্ধান করা উচিত নয়– তাদের বিরাট বিভ্রান্তি ঘটেছে। কোরআন মজীদের অবতারণ নিঃসন্দেহে অবস্থার প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে ঘটেছে, কিন্তু যেভাবে তা সংকলিত করা হয়েছে, তাতে গভীর অভিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।"

মুসলিম সমাজের প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরামের উপরোল্লিখিত বক্তব্য এ বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কোরআন মজীদে বিন্যাসের প্রবক্তা শুধুমাত্র মাওলানা হামীদুদ্দীন (রঃ) কিংবা তাঁর শিষ্যবর্গই নন, বরং অন্যান্য ওলামাও বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং তার সাক্ষ্যও দিয়েছেন।

তদুপরি বিষয়টির আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, যেসব আলেম 'বিন্যাস'কে অস্বীকার করেছেন, তাঁরাও এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তার প্রমাণ, যে ওলামা বিন্যাসের প্রবক্ত নন, তাঁরাও অধিকাংশ সময় ব্যাখ্যার সমর্থনে কালাম বা বক্তব্যের অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক তুলে ধরেন। আর একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ককে তখনই দলিল হিসাবে উপস্থাপন

www.pathagar.com

করা যেতে পারে, যখন তাকে একটা সুবিন্যস্ত কালাম বলে স্বীকার করা হবে। প্রসিদ্ধ তফসীরগুলোতে এ বিষয়টি ইবনে জারীর (রঃ)-এর তফসীরেও পরিলক্ষিত হয় এবং কাশ্‌শাফেও। তাঁদের দুজনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে সে ব্যাখ্যাটিতেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অগ্রাধিকার দেন, যেটিকে তাঁরা কালামের বিন্যাসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখতে পান। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও তাঁরা কোরআনের বিন্যস্ততাকে তার জটিলতার দরুন সব ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে দেয়ার নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে পারেননি, কিন্তু যেখানেই বিন্যাসের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে তাকে একটি বক্তব্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। ইমাম রাযী (রঃ)-এর আলোচনা আমরা এক্ষেত্রে করছি না। তার কারণ, কোরআনের বিন্যাস প্রশ্নে তিনি উপরোল্লিখিত মনীষীদ্বয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। তিনি কালামের বিন্যস্ততার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের (যেমন তাঁর বক্তব্যের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়, যা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি।) কঠিন প্রবক্তা ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি আয়াতের বেলায়ই তা বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন, যদিও তাতে যেমন আমরা নিবেদন করেছি, তিনি তেমন একটা সফলকাম হতে পারেননি।

যাঁরা নিজেদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কোরআনের বিন্যাসকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা সে অস্বীকৃতির পক্ষে যে দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, সেগুলো এতই দুর্বল যে, অন্যদেরকে বাদ দিয়ে তাঁরা নিজেরাও তাতে আশ্বস্ত হতে পারেননি। তাঁরা বলেন, কোরআন মজীদ প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাতে কোন বিন্যাস নেই। তাঁদের এ দলিলটি শুধুমাত্র এ বাস্তবতার দ্বারাই খন্ডিত হয়ে যায় যে, লম্বা সূরাসমূহের কোন কোনটি এবং ছোট সূরার অধিকাংশগুলো গোটা গোটাই একবারে অবতীর্ণ হয়েছে। বলাবাহুল্য, এসব সূরার অবিন্যস্ততার ব্যাখ্যা উল্লিখিত দলিলের দ্বারা হতে পারে না। কাজেই ইমাম রাযী (রঃ) এরই ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে সে আপত্তি তুলেছেন, যা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করে এসেছি।

আমাদের মতে, এঁদের অস্বীকৃতির কারণ কোন দলিল-প্রমাণ নয়; বরং শুধুমাত্র এ কারণে যে, তাঁদের ধারণায় কোরআনে বিন্যস্ততার দাবী করা এবং সব ক্ষেত্রে তা তুলে ধরতে না পারা একটা বিরাট দুর্বলতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাতে ইসলাম বিরোধীরা কোরআনের ওপর প্রশ্ন করার একটা পথ পেয়ে বসবে

www.pathagar.com

এবং তা গোটা উম্মত বা মুসলিম জাতির জন্য হবে একান্ত ক্ষতিকর। এ বিষয়টি থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশেই তাঁরা বিন্যাসকে গোড়াতেই অস্বীকার করে দেয়া সমীচীন বিবেচনা করেছেন। তাঁরা যদিও কাজটি নেক নিয়তে করেছেন, কিন্তু এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই অস্বীকৃতির অপকারিতা তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে, যার থেকে কোরআনকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা এ পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ ব্যাপারে সঠিক পথ এই ছিল যে, বিন্যাসকে যতটা সম্ভব প্রতীয়মান করতে চেষ্টা করতেন আর যেখানে সম্ভব না হত সেখানে কালামের একটা প্রকাশ্য দোষকে বিচক্ষণতা প্রমাণ করতে চেষ্টা না করে নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা বলে স্বীকার করে নিতেন।

৩. যাঁরা কোরআনের সংগ্রহ এবং সংকলন সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এই বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারেন না যে, কোরআন যদিও অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু আয়াতসমূহকে হুযুর আকরাম (সঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। যে আয়াতই অবতীর্ণ হত হুযুর (সঃ) স্বয়ং সূরার ভেতরে তার স্থান নির্ধারণ করে দিতেন এবং ওহী লেখক সাহাবিগণকে আদেশ দিতেন যে, এ আয়াতগুলোকে অমুক সূরার অমুক জায়গায় লেখে রাখ। ওহী লেখক সাহাবিগণও হুযুরের হেদায়াত অনুসারে সেসব আয়াত তাঁরই নির্ধারিত জায়গায় লেখে রাখতেন। সুতরাং এ বিষয়ে সমগ্র জাতি একমত যে, আয়াতসমূহের বিন্যাস হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর হুকুম মোতাবেকেই হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআন মজীদে যদি বিন্যস্ততাই না থাকবে, তা হলে মহানবী (সঃ) এ ধরনের নির্দেশ দিতেন কেন? তা হলে তো অবতরণকালীন বিন্যাসই ছিল উত্তম। যেভাবে আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকত, সেভাবেই সেগুলো লেখিয়ে রাখতেন। অবতরণকালীন বিন্যাস বাদ দিয়ে যখন একটা বিশেষ বিন্যাস ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তখন বিষয়টি চিন্তা করতে হবে যে, তা হলে এই নয়া বিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণ করার কি কারণ থাকতে পারে? পরিষ্কার কথা যে, এ প্রশ্নের যথার্থ ও সঠিক উত্তর একটাই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, এই বিন্যাস বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য অনুসারে স্থাপিত। ওপরে আমরা আল্লামা মালভী (রঃ)-এর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করে এসেছি, তাতে এদিকেই ইঙ্গিত বুঝা যায়।

আমাদের এ মতের সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, কোরআন মজীদের কোন হুকুম নাযিল হওয়ার পর যদি এমন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়, যা সে হুকুমের

www.pathagar.com

কোন প্রকার সংশোধন কিংবা লঘুকরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা যে আয়াত নাযিল করতেন তা সাবেক মূল আয়াতের যত দীর্ঘ দিন পরেই নাযিল হোক না কেন, সাধারণত তাকে সাবেক হুকুমের পাশেই স্থান দেয়া হেয়েছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত কোরআনেও বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়ে থাকে, তবুও বাক্যবিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃত গুরুত্ব উপেক্ষা করা হয়নি।

কোরআন মজীদে পৃথক পৃথক সূরার স্থাপনা এবং তার কোনটার দীর্ঘ এবং কোনটার হ্রস্ব হওয়াও এরই প্রমাণ যে, কোরআন মজীদে বিন্যস্ততা রয়েছে। কোরআন যদি একটা অবিন্যস্ত কিতাবই হয়, তা হলে পৃথক পৃথক সূরা গঠন করার কি প্রয়োজন ছিল? প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ কথা বুঝতে পারেন যে, সূরাসমূহের বিষয়বস্তুই যদি পৃথক পৃথক না হত এবং প্রতিটি সূরাই যদি সুনির্দিষ্টভাবে ঐক্যসূত্রে গাঁথা বিশেষ একটি ভিত্তি সম্বলিত না হত, তা হলে তেলাওয়াত ও মুখস্থ করার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সহজ বিন্যাস হত এই যে, কোরআন যারা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা আয়াতের এককেটা সমষ্টি নিয়ে সমান সমান সূরায় ভাগ করে বসিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁরা যখন এমন করেন নি, বরং পৃথক পৃথক সূরা গঠন করেছেন, যার কোনটা ছোট কোনটা বড়, তখন তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, এসব সূরার বিষয়বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেকটি সূরাই বিষয়বস্তুর ঐক্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

কোন রকম মতবিরোধ ব্যতীত সমস্ত কোরআনে সূরাসমূহের বর্তমান যে বিন্যাস, তাও এ বিষয়েরই একটা বিরাট প্রমাণ যে, কোরআন মজীদ একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থ। তার মানে, কোরআনের সূরাগুলোকে যেভাবে আগে-পরে সাজানো হয়েছে, তাও কোন একটা কারণ ছাড়া হয়নি; হতে পারে না। সেজন্য এই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে, এই অগ্রপশ্চাৎ কোন মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকবে। বাহ্যিক দিক দিয়ে এই অগ্রপশ্চাতের ব্যাপারে সূরাসমূহের হ্রস্বতা কিংবা দীর্ঘতারই সবচেয়ে বেশী দখল থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কোরআন মজীদের ওপর চোখ রাখামাত্র যে কেউ অনুমান করে নিতে পারেন যে, কোরআনে এ বিষয়টির এতটুকু লক্ষ্য রাখা হয়নি। কারণ, এই বিন্যাসে সূরা ফাতেহাকে সূরা বাকারার পূর্বে স্থান দেয়া হয়েছে। অথচ এ দুটো সূরার আয়তনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তেমনিভাবে সূরা কাওসার– যেটি কিনা কোরআন মজীদের সবচাইতে ছোট

www.pathagar.com

সূরা– এমন কতিপয় সূরার পূর্বে স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো আয়তনের দিক দিয়ে তার চাইতে বড় বা দীর্ঘ। এ কথাও স্বীকৃত যে, এই বিন্যাসও অবতরণকালীন বিন্যাস নয়। কারণ, অবতরণের দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরআনে সর্বপ্রথম সূরা 'ইকরা'কে স্থান দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবাই জানেন, তাকে রাখা হয়েছে কোরআনের সর্বশেষ পারাটিতে। এই পরিস্থিতি মানুষকে সূরার পরিমাণ এবং অবতরণের অগ্রপশ্চাৎ ছাড়াও বর্তমান পূর্বাপরতার ব্যাপারে অন্য কোন কারণ অনুসন্ধানে বাধ্য করে। আমাদের মতে বর্তমান এই পূর্বাপরতার কারণ হচ্ছে সূরার মর্মগত সামঞ্জস্য। হয়ত আমাদের দাবী সম্পর্কে কেউ এ আপত্তি উত্থাপন করে বসবেন যে, সূরাসমূহের বিন্যাস তো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর আমলেই হয়েছে। কাজেই এর রহস্য বা তাৎপর্য সম্পর্কে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মতে তাঁদের এ ধারণা যথার্থ নয়। প্রথমত সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর নির্দেশ অনুসারেই সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত কিছুক্ষণের জন্য যদি ধরেও নেয়া যায় যে, সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস সাহাবা (রাঃ)-দের মতেই হয়েছে, তাতে একথা কেন অপরিহার্য হয়ে পড়বে যে, সাহাবাগণ সূরাগুলোকে এমনি কোন প্রকার মর্মগত সামঞ্জস্য ছাড়াই একত্রিত করে দিয়ে থাকবেন? অথচ এ ব্যাপারে সবাই অবগত যে, সূরা 'বারাআত-এর স্থান নির্ধারণ নিয়ে যখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তখন শেষ পর্যন্ত কোরআন মজীদের বিন্যাসের সাহায্যেই বিষয়টির সমাধান হয়েছিল এবং মর্মগত সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেই সূরা 'আনফাল'-এর পরে স্থান দেয়া হয়েছিল।

আমরা একথা তাঁদের ধারণার প্রেক্ষিতে বলেছি, যাঁরা বলেন যে, সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস সাহাবাদের যুগে এবং তাঁদেরই মতে সাব্যস্ত হয়েছে। তা না হলে আমাদের মতে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশানুযায়ী হুযুরে আকরাম (সঃ) নিজেই সূরাসমূহকে বিন্যস্ত করেছেন। আমাদের এ দাবীর সমর্থন কোরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারাই হয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা 'কিয়ামাহ'-তে এরশাদ করেছেন–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

নিঃসন্দেহে আমার দায়িত্ব হল কোরআনকে সংকলিত করা এবং শুনানো। অতএব যখন আমি শুনাই, তখন যা শুনানো হয় তার অনুসরণ কর। অতঃপর আমার দায়িত্বে রয়েছে তার বিশ্লেষণ।

www.pathagar.com

মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

এ আয়াতটিতে তিনটি বিষয় বলা হয়েছে। একটি হল কোরআন মজীদ নবুয়তের আমলেই হুযুরে আকরাম (সঃ)-কে বিশেষ ক্রমবিন্যাস মোতাবেক শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ, এ ওয়াদা যদি হুযুর (সঃ)-এর পরে বাস্তবায়িত করা উদ্দেশ্য হত, তা হলে হুযুরকে এই সংগ্রহ ও ক্রমবিন্যাসের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হত না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী–যা জমা করার পরে হয়েছে। হুযুরের প্রতি নির্দেশ হল, আপনি উম্মতকে কোরআন শোনান। আর একথা বুদ্ধি ও বিবেচনার দিক দিয়ে অসম্ভব যে, হুযুরের প্রতি কোন একটি নির্দেশ প্রচারের উদ্দেশে এসেছে, অথচ তা তিনি উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দেননি।

কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

হে রসূল! তোমার প্রতি যে বস্তুটি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দাও। যদি তুমি তা না কর, তা হলে তার অর্থ এই হবে যে, তুমি নিজের রেসালাতের ফরয আদায় করলে না।

এই সাধারণ নির্দেশের দাবী হল সেই শেষ কেরাত অনুযায়ী, যা লওহে মাহফুযে রয়েছে, হুযুর আকরাম (সঃ) মানুষকে কোরআন মজীদ শুনিয়েছেন। এই শেষ কেরাতটি আমলের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ ও ক্রমবিন্যাসের পরে আল্লাহ্ তাআলা যদি কোন সাধারণ নির্দেশকে অসাধারণ কিংবা কোন অসাধারণ নির্দেশকে সাধারণ করতে চেয়ে থাকেন, অথবা কোন বিষয়কে পূর্ণতা দান করতে ইচ্ছা করে থাকেন, তবে এ সমস্তই করে দিয়েছেন। কোরআন মজীদ হুযুরে আকরাম (সঃ)-এর যুগেই এ সমস্ত ধাপ অতিক্রম করে নিয়েছে। এ সত্যটি সবাই জানেন যে, মহানবী (সঃ) মানুষকে গোটা গোটা সূরা শোনাতেন। আর এটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি না কোরআন মজীদ একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুযায়ী তাঁকে শোনানো হয়ে থাকে। এই ক্রমবিন্যাস অনুযায়ীই সাহাবিগণ হুযুরের নিকট কোরআনের শিক্ষা নিয়েছেন। রেওয়ায়েতে এ বিষয়টি বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি আয়াতসমূহকে যথার্থ

www.pathagar.com

জায়গায় স্থাপন করার নির্দেশ দান করতেন আর তাঁর এ নির্দেশ যথাযথ বাস্তবায়িতও হত। পরে যদি কোন বিশ্লেষণমূলক আয়াত অবতীর্ণ হত, তখন সেটিকেও যথাস্থানে লেখে রাখা হত। এভাবে কোরআন মজীদ যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) (বিশুদ্ধ হাদীস মতে) হুযুর আকরাম (সঃ)-এর কাছে শেষবার পূর্ণ কোরআন শোনালেন। এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবার পর কোরআন মজীদের বিন্যাস সংক্রান্ত বহু জটিলতার সমাধান আপনা থেকে হয়ে যায়। — (তফসীর ঃ সূরা কিয়ামাহ্)

ইমাম হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) কর্তৃক কোরআন থেকে গৃহীত উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা দ্বারা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কোরআন মজীদ যেভাবে এবং যে বিন্যাসের সাথে আমাদের এ যুগে বিদ্যমান, এ বিন্যাস আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ ও হেদায়াত অনুযায়ী নবুয়তের আমলে পূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু যেহেতু তখন আরবদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল অল্প এবং কাগজ-কলম প্রভৃতি লেখার উপকরণগুলোও ছিল একান্ত দুষ্প্রাপ্য, তাই দীর্ঘকাল ধরে কোরআন মজীদ সংরক্ষণ করা হয়েছিল খেজুরের পাতা, হাড়, শিলাখণ্ড এবং হাফেযদের বক্ষপটে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-ই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি নবী করীম (সঃ)-এর দেয়া ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত আয়াতসমূহকে গ্রন্থায়িত করেন। অতপর হযরত ওসমান (রাঃ) নিজের শাসনামলে সে সংগ্রহ থেকে আরো কতিপয় কপি করিয়ে সেগুলো বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে পাঠিয়েছেন।

কোরআন মজীদের সুবিন্যস্ত হওয়ার আরো একটি বড় প্রমাণ এই যে, কোরআন সর্বজনস্বীকৃতভাবে একটা উচ্চতর মানের কালাম। বস্তুত এমন কোন কালামই উচ্চ মানের কালাম হতে পারে না, যা সুবিন্যস্ত নয়। যেকোন কালামের প্রকৃত গঠন হচ্ছে তার বিন্যস্ততা। বিন্যাসকে পৃথক করে নিলে কালাম বা রচনা শুধু যে তার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাই নয়, বরং তখন গোটা রচনাটি সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যে কালাম বা রচনা বিন্যাস বিবর্জিত, মানুষ সেটিকে মূর্খতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং অন্তত কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা নিয়ে সময়ের অপচয় করতে রাজি হয় না। কোরআন মজীদ সম্পর্কে এ কথা সারা দুনিয়াই অবগত যে, সে আরবদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, যেন তারা তার মত কোন একটা সূরা উপস্থাপন করে। কিন্তু আরববাসীরা তাদের বাগ্মিতা, সালঙ্কার ভাষাজ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত গর্ব সত্ত্বেও কোরআনের সে

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জের উত্তরে কোন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূরাও উপস্থাপন করতে পারেনি। কোরআনের এই সাহিত্যিক ও মর্মগত মাহাত্মের বিবেচনায় প্রথম যে জিনিসটি তাতে থাকা উচিত, তাই হচ্ছে বিন্যাস। কারণ, বিচ্ছিন্ন ও বিন্যাস বিবর্জিত কোন গ্রন্থের পক্ষেই আরব বাগ্মী ও আলঙ্কারিকদেরকে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না।

এখানে লক্ষণীয়, কোরআন যে বিস্মিত ও হতভম্ব করে দেয়ার মত এক বিষয়, তার প্রমাণ, কোরআন যেখানেই আরবদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে সেখানেই তাদের কাছে নিজের মত একটি গ্রন্থ কিংবা দশটি আয়াত অথবা হাদীস حديث من مثله (হাদীস মিম মিস্লিহী) বা কমসে কম একটি সূরা উপস্থিত করার দাবী করেছে, এর চাইতে কম দাবী করেনি। কারণ, এর চাইতে কম হতে গেলে কালাম বা রচনার বিন্যাসশৈলীর প্রকাশ ঘটে না, যা প্রকৃতপক্ষে তার মূল প্রাণ। সে কারণেই আরব-আজমের সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিদ মনীষীবৃন্দ এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, কালাম বা রচনার আসল প্রাণ হচ্ছে তার বিন্যাস। এর মাধ্যমেই তার যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে। এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে কারও মনে যদি দ্বিধার সৃষ্টি হয়, তা হলে তিনি ভালর চাইতে ভাল যেকোন সালঙ্কার রচনা নিয়ে তার বিন্যাস নষ্ট করে দিয়ে দেখতে পারেন। দেখা যাবে, তখন সে রচনার যাবতীয় শক্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কোরআনের সুবিন্যস্ততা সম্পর্কে আমরা এই কয়েকটি প্রমাণ এ উদ্দেশেই উপস্থিত করেছি যে, পাঠক মহোদয়ের কারো মনে যদি এমন কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যে, কোরআন একটা বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত গ্রন্থ এবং এই অবিন্যাস্ততাই তার আদত বৈশিষ্ট্য, তা হলে যেন সে ভুলটি দূর হয়ে যেতে পারে এবং যাতে কোরআন বুঝতে গিয়ে পূর্ণ ভরসা সহকারে তার সুবিন্যস্ততাকে পথপ্রদর্শক করে নিতে পারেন।

বিন্যাস অনুসন্ধানের মূলনীতি ঃ

কিন্তু কোরআনের সুবিন্যস্ত কালাম হওয়ার দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করার চাইতে সে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা বেশী জরুরী, যা সে বিন্যাসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দিশারীর ভূমিকা পালন করতে পারবে। কেউই কোরআনের সুবিন্যস্ততা এ কারণে অস্বীকার করে না যে, তাঁর কাছে তার কোন গুরুত্বই নেই কিংবা তার

www.pathagar.com

অস্তিত্বের প্রমাণ তার জন্যে স্পষ্ট নয়, বরং তাঁদের অস্বীকৃতির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, বিন্যাসের অনুসন্ধান এবং তাঁর নির্ণয় করাটা আসলেই যথেষ্ট জটিল কাজ। এই জটিল বিষয়টিকে যদি কোনক্রমে সহজ করে নেয়া যায়, তা হলে তার মূল্য-মর্যাদা এবং কোরআনের মর্মোদ্ধারে তার গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন অবকাশ কারও নেই।

আমাদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে বিন্যাস অনুসন্ধানের মূলনীতি বর্ণনা করাটা যথেষ্ট কঠিন, বরং প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কয়েকটি সাক্ষাতও এতদুদ্দেশে যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই সঠিক পন্থা হচ্ছেপূর্ণ বিস্তৃতি সহকারে শুধু সে মূলনীতিগুলো বলে দেয়া, যা কোরআনের বিন্যাস অন্বেষণে পথনির্দেশ করবে। তারপর সে মূলনীতিগুলো কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ের অনুশীলন। মূলনীতি সম্পর্কে যতটা জানার প্রয়োজন সেজন্যে এ যুগের সবচেয়ে মহান খাদেমে কোরআন মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ)-এর রচনাসমূহের অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বিশেষ করে তাঁর রচিত 'দালায়েলুন্নিযাম' গ্রন্থটির অধ্যয়নে মূলনীতি আয়ত্ত করার ব্যাপারে জ্ঞানীদের জন্য তেমন কোন জটিলতা থাকবে না। কিন্তু এই মূলনীতিগুলোর যথার্থ প্রয়োগ এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়াটা জ্ঞানার্জনের আগ্রহ এবং অন্বেষার ওপরই নির্ভরশীল।

এ ক্ষেত্রে আমরা যে সেবাটুকু করতে পারি তা হল শুধু এই যে, এমন কিছু কিছু ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে দেয়া, যা বিন্যাসানুসন্ধানে সহায়ক হতে পারে। আমাদের ধারণা মতে বিন্যাসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনটি কারণে সর্বাধিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলো সম্পর্কেই কিছু উপকারী ইঙ্গিত দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। সেগুলো যদি বাস্তবায়িত করা যায়, তা হলে অনেক জটিলতারই সমাধান হয়ে যাবে।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দরুন মানুষ কোরআনের বিন্যাসের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠতে পারে না, তা হল, প্রাচীন আরবী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে পরিচয়হীনতা। আরবী ভাষায় বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপায়ন এবং দীর্ঘায়ন ও হ্রস্বায়নের যে রীতি রয়েছে এবং যেগুলোকে আরব বাগ্মী ও বাকশিল্পীরা অত্যন্ত স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতেন, আমরা নিজেদের ভাষায় সাধারণত সে বিষয়গুলোর সাথে যথার্থভাবে পরিচিত নই। সেজন্যে কোরআনে যখন সেগুলোর সম্মুখীন হতে হয়, তখন তা আমাদের আয়ত্তে আসে না। উন্নত মানের আরবী সাহিত্যের সাথে

www.pathagar.com

যাদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তাঁরা জানেন, আরবী ভাষায় কিভাবে একটা বিশেষ বিন্দু থেকে কথা আরম্ভ হয় এবং কথার পিঠে কথা তৈরী হতে থাকে। এমনকি একটা বিশেষ সীমারেখায় পৌছে গিয়ে তা আবার সেই কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসে। একদিকে এই বিস্তৃতি অপর দিকে তারই মধ্যে সংক্ষেপায়ন ও হ্রস্বায়নের বিচিত্র কলাকৌশল থাকে বিদ্যমান, যার সাথে একমাত্র আরবী সাহিত্য বিশারদরাই পরিচিত হতে পারেন। অন্যদের পক্ষে এসব বিষয় বুঝা কঠিন। একটা দাবী উত্থাপিত হয় আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হয় তার দলিল-যুক্তি। কিন্তু পরিষ্কার করে দেয়া হয় না যে, এটাই তার প্রমাণ। বরং এ বিষয়টি শুধু বর্ণনা প্রেক্ষিতের ভরসার ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়। তেমনিভাবে একটা উত্তর দেয়া হবে, কিন্তু এ কথা পরিষ্কার করে বলা হবে না যে, এটা অমুক প্রশ্নের উত্তর কিংবা অমুক সন্দেহের জওয়াব। এ বিষয়টিকেও বর্ণনার আনুপূর্বিক সম্পর্ক কিংবা শ্রোতার মেধার ভরসার ভিত্তিতেই বর্জন করা হবে। কখনও কোন বিশেষ প্রাসঙ্গিক বর্ণনার ভেতরে দৃষ্টি আকর্ষণ হিসেবে কিংবা অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি বাক্য চলে আসবে এবং তা কোন কোন সময় এতই সুদীর্ঘ হবে যে, শ্রোতা যদি অন্যমনস্ক হন, তা হলে হয়ত মূল প্রসঙ্গই হারিয়ে ফেলবেন। একটি কাহিনী কিংবা উপাখ্যান বলা হবে এবং তার ভেতরকার সমস্ত অংশই বাদ দিয়ে দেয়া হবে, সেগুলো একজন বিচক্ষণ শ্রোতার পক্ষে নিজেই জুড়ে নেয়া উচিত। অনেক সময় কিছু বিশেষ পরিণতি সামনে রেখে একটি কথা বলে দেয়া হবে, কিন্তু এ কথা বলা হবে না যে, কথাটি কোন্ বিষয়ের প্রেক্ষিতে এখানে বলা হল।

এ ধরনের অসংখ্য দিক রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠতে পারে না যতক্ষণ না প্রাচীন আরবী সাহিত্য এবং জাহেলিয়াত আমলের বাগ্মী-বক্তাদের রচনা বা বক্তব্যের সাথে ভালভাবে পরিচিত হবেন। আর কোরআন যেহেতু উন্নততর আরবী সাহিত্যের যাবতীয় পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহে মন্ডিত, সেহেতু এসকল বিষয়ের অজ্ঞতা কোরআনের বিন্যাস উপলব্ধির পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত যে কারণে কোরআনের বিন্যাস বুঝতে গিয়ে অত্যন্ত কষ্ট পোহাতে হয়, তা হল সাধারণত মানুষ এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করতে পারেনি যে, কোরআন মজীদ কোন্ শ্রেণীর কালাম বা রচনা? এটা কি সে ধরনেরই কোন রচনা যে ধরনের হয়ে থাকে শাস্ত্রীয় রচনাসমূহ? কিংবা এটা কি কবিদের রচনার মত?

www.pathagar.com

অথবা গণকদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিষয়? এর ধরনটা কি বক্তাদের বক্তৃতার মত? আরবের কাফেররা একে কবি এবং গণকদের বাকরীতির সাথে তুলনা করত। আর ইদানীংকার লোকেরা সাধারণত এতে একটি শাস্ত্রীয় রচনাশৈলীর সন্ধান করে। অথচ এতদুভয়ের একটিও যথার্থ নয়। কোরআন মজীদ যদি উল্লিখিত কোন এক শ্রেণীর রচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তা হলে সেটি হচ্ছে তৎকালীন আরব বাগ্মীদের কালাম। কিন্তু এ শ্রেণীর সাথেও তার সম্পর্ক একান্ত আপেক্ষিক। এ কথা বলা কিন্তু ঠিক হবে না যে, সম্পূর্ণতই এটা বাগ্মীদের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

একে বাগ্মীদের বক্তৃতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলতে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনের প্রতিটি সূরা তার পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই এ বিষয় বুঝার জন্য সবচাইতে প্রয়োজনীয় কথা হল, প্রথমে সে পরিবেশকে বুঝতে চেষ্টা করা যে পরিবেশের তাগিদে বা যে পারিপার্শ্বিকতার প্রেরণায় তার অবতরণ ঘটেছিল। সে পরিবেশ বুঝার লক্ষ্যে কখনও কোরআন বহির্ভূত কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না। এ পরিবেশ স্বয়ং কোরআনের আলোকেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে এটা সাব্যস্ত করার প্রয়োজন আছে যে, সে তাগিদ বা প্রেরণাগুলো কি; যা এই কালামের দাবী রাখতে পেরেছে? এই তাগিদগুলো যখন নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন সে সূরার বিন্যাসও সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে হাযির হয় এবং কালাম তার পরিবেশের সাথে এমন সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায় যে, তখন যেকোন লোক স্বতস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে ওঠে– এই জামাটি সেই শরীরের জন্যই তৈরী হয়েছিল

অনেকে এই তাগিদ বা প্রেরণাগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে শানে নুযূল সংক্রান্ত সেসব রেওয়ায়েতের শরণাপন্ন হন যা তফসীরের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত রয়েছে। কিন্তু এ রীতিটি একান্তই ভুল। শানে নুযূল সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো কোরআনের বিন্যস্ততা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কারিকার অধিকারী এবং এগুলোর বেশীর ভাগই ভিত্তিহীন। কাজেই এ ব্যাপারে কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিতের আলোকেই আসল পটভূমিকা বুঝে নিতে চেষ্টা করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক পন্থা। কালাম কাদেরকে সম্বোধন করছে? এবং যাদেরকে সম্বোধন করছে তাদের মধ্যে কাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে করছে আর কাদেরকে পরোক্ষভাবে? সে কোন্ জটিলতা সম্বোধিত ব্যক্তি যার সম্মুখীন এবং সে জটিলতার দরুন কি কি

www.pathagar.com

প্রশ্ন তুলেছে, যার উত্তরের জন্য শত্রু-মিত্র সবাই অপেক্ষা করে আছে? তা ছাড়া শত্রুদের বিরোধিতা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে আর মিত্রতা রয়েছে কোন্ পর্যায়ে? বিরোধীদের দলে কোন্ কোন্ দল কি কি অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে যোগ দিয়েছে? এবং স্বপক্ষীয় দলগুলো কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করছে? এ বিষয়গুলো যখন জানা হয়ে যাবে, তখন কালামের সমস্ত বিন্যাস আপনা থেকেই সামনে এসে উপস্থিত হবে। এসব বিষয়ই কালামের ব্যাকরণের ভেতর থেকে কথা বলে। কাজেই পরিশ্রম করে যদি সেগুলো নির্দিষ্ট করে নেয়া যায় তখন কোরআনের একটি সূরা পাঠ করে মনের মধ্যে এমন অবস্থারই সৃষ্টি হয় যা একজন অতি উত্তম বক্তার অতি উত্তম বক্তৃতা শুনেও সৃষ্টি হয় না।

এ প্রসঙ্গের তৃতীয় জটিলতাটি হচ্ছে সম্বোধনের জটিলতা। কোরআন মজীদের ওপর যারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, তারা যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জটিলতার সম্মুখীন হন, তা হল কোরআনে খানিক পরে পরে বরং কোন সময় একই আয়াতের মাঝে সম্বোধনের পরিবর্তন হতে থাকে, এ মাত্র মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছিল, এখনই মুশরিকদের করা হচ্ছে। এখনই আলোচনা চলছিল আহ্‌লে কিতাবদের (যারা কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী তাদেরকেই আহলে কিতাব বলা হয়।) হঠাৎ মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। এখনই একবচনের পদ ব্যবহৃত হচ্ছিল– অমনি বহুবচনে চলে এল। এমনিভাবে সম্বোধনের পটও পরিবর্তিত হতে থাকে। এখনই সম্বোধন করা হচ্ছিল সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে, হঠাৎ তা পরিবর্তিত হয়ে রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে গেল। এখনই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ দিয়ে কোন বিষয় আলোচিত হচ্ছিল, সহসা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল। যাদের সম্বোধন করা হচ্ছে এবং যে সম্বোধন করেছেন তাদের এই পরিবর্তিত হতে থাকা একজন নবাগতকে অত্যন্ত হতবুদ্ধি করে দেয়। তা ছাড়া এহেন দ্রুত বিবর্তনের মুখে বিন্যাসধারা বজায় রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

কোরআন মজীদ অনেকাংশে আরব বাগ্মীদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেভাবে একজন বক্তা শুধু নিজের দিক পরিবর্তন এবং চোখের ঘূর্ণন ও ভ্রুর সংকোচনের দ্বারা, বরং কোন কোন সময় কথার ধারা পরিবর্তন এবং সাধারণ চাহনিতে নিজের সম্বোধনের ধারা বক্তৃতার ভেতরেই পরিবর্তন করতে থাকেন, তেমনিভাবে কোরআন মজীদেও সম্বোধানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর যদি

www.pathagar.com

পাঠক কালামের পটভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে তা হলে সম্বোধনের বিবর্তনের কারণে কোন ঝামেলা-জটিলতারই সম্মুখীন হতে হয় না বরং তখন তিনি কালামের গতিধারার-সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্বোধনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে থাকেন। কিন্তু এর কোন কোন দিক রয়েছে, যা সহজে সবার আয়ত্তে আসে না। তা ছাড়া সেগুলো আয়ত্ত করার জন্যে প্রচুর অনুশীলন ছাড়া আয়ত্তে আসতেও পারে না।

এখানে আমরা মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ)-এর তফসীর নিযামুল কোরআনের ভূমিকা থেকে এবং সম্বোধনের লক্ষ্য নির্ধারণ বিষয়ক পরিচ্ছেদ থেকে প্রয়োজনীয় সার-সংক্ষেপ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, যাতে এই জটিলতার সমাধানে অনেকটা সাহায্য লাভ হতে পারে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে মাওলানা বলেনঃ

মুসলমানমাত্রই এ বিষয়ে একমত যে, সমগ্র কোরআন আল্লাহ্ তাআলার কালাম। অর্থাৎ, একে আল্লাহ্ রসূলে করীম (সঃ)-এর ওপর নাযিল করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমগ্র কোরআনের সমস্ত সম্বোধনই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। যেমন,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

আয়াতে পরিষ্কারভাবেই সম্বোধনটি রয়েছে বান্দাদের পক্ষ থেকে। আলেমগণ এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এ সূরাটি বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন যে, এভাবে বল। কিন্তু এখানে 'বল' কথাটি উহ্য। কাজেই (তাদের) সে বিশ্লেষণকে কেমন করে স্বীকার করা যায়? এমনি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় সম্বোধনের লক্ষ্যের ব্যাপারেও। অর্থাৎ, সম্বোধন কাকে করা হচ্ছে? প্রত্যেক সম্বোধনেরই দুটি দিক হতে পারে। প্রথমত এই যে, সম্বোধনটি কোন্ দিক থেকে হয়েছে। দ্বিতীয়ত সম্বোধনটি কার প্রতি? আর এতদুভয়টি কখনও হয় সাধারণ কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে নির্দিষ্ট। আবার কখনও হয় নির্দিষ্ট কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ। আর যেহেতু এই পরিবর্তন এবং নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার দরুন অর্থের দিক দিয়ে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়, সেজন্যে এগুলোর নির্ধারণকল্পে এমন মূলনীতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক যা যেকোন জটিলতায় পথ প্রদর্শন করতে পারে।

সম্বোধনে একটি থাকে উৎস আর একটি থাকে অন্ত। উৎস আল্লাহ্ তাআলা হবেন অথবা জিবরাঈল (আঃ) কিংবা রসূল (সঃ) বা মানুষ। তেমনিভাবে অন্তও

www.pathagar.com

হয় হবেন আল্লাহ্ তাআলা, না হয় রসূলে করীম (সঃ) অথবা মানুষ। মানুষের মধ্যে মুসলমান হবেন অথবা মুনাফেক। আহলে কিতাব হবে অথবা হযরত ইসরাঈলের বংশধর কিংবা এদের মধ্য থেকে দুটি, তিনটি অথবা সব ক'টি। আহলে কিতাবের মধ্যে হয় হবে ইহুদী, না হয় হবে নাসারা (খ্রীস্টান) অথবা উভয়টি। এটা তো গেল প্রকাশ্য দিক। এখন এ সমুদয়ের সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উৎসতে আল্লাহ্, রসূল এবং জিবরাঈলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। এক্ষেত্রে যদি কেউ পরিপূর্ণ নিবিষ্টতা ছাড়া কোরআন পাঠ করতে থাকে, তা হলে তার পক্ষে এই পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়বে যে, আসলে বক্তা কে? নবী করীম (সঃ) এবং হযরত জিবরাঈল হলেন আল্লাহ্র রসূল বা দূত। তাঁরা কখনও প্রেরকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন আবার কখনও সে বক্তব্যটি নিজেই সম্পাদন করে দেন, যা আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখে প্রকাশ করিয়েছেন। হযরত জিবরাঈলও আল্লাহ্রই দূত। তিনি কখনও নবী করীম (সঃ)-এর সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর বাণীর প্রচারক হিসেবে কথা বলেন, আবার কখনও তাঁর শিক্ষক হিসেবে।

কোরআন মজীদে এ সমস্ত দিক বা অবস্থাগুলোই একটা অপরটার সাথে মিলেমিশে কোন রকম সতর্কতা ব্যতিরেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে এগুলো নির্দিষ্ট করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বক্তব্যের যোগসূত্র ছাড়া এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করার মত অন্য কোন সূত্রই নেই। তা ছাড়া এ বিষয়টি বিশেষভাবে কোরআন মজীদের বেলায়ই নয়, বরং এটা আসমানী গ্রন্থসমূহের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়।

এ ব্যাপারে সাধারণ নিয়ম হল যে, কালাম বা বক্তব্য যখন প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হবে, তখন তাতে মহত্ত্ব, আতঙ্ক, শক্তি ও আড়ম্বরের প্রকাশ থাকবে। সেজন্যে এ ধরনের বক্তব্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। সূরা 'ইকরা'-র শুরু হয় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মুখ থেকে। কিন্তু যখন কাফেরদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষেত্র উপস্থিত হয়, তখন সরাসরিভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে যায়। বলা হয় ঃ

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ـ

কিছুই নয়, যদি ফিরে না আসে, তা হলে আমি তাকে জুটি ধরে হেঁচড়ে নেই।

www.pathagar.com

অন্তের বেলায় সংমিশ্রণ ঘটে নবী করীম (সঃ) এবং মুমিনদের মধ্যে। কোন কোন সময় বাহ্যত মনে হয় সম্বোধন হুযূরের প্রতি হচ্ছে, অথচ বক্তব্যের লক্ষ্য থাকে উম্মতের দিকে। পয়গম্বর আলাইহিস সালাম যেহেতু উম্মতের প্রতিনিধি বা অভিভাবক হিসেবে তাদের মুখ এবং তাদের কান হওয়ারও মর্যাদা রাখেন, তাই সম্বোধন তাঁকেই করা হয়। তওরাতেও এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, বাহ্যত একবচনের মাধ্যমে হযরত মূসার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য হচ্ছে উম্মত। কোরআন মজীদে এ ধরনের যেসব ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে বিন্যাস ও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার পথনির্দেশন অনুযায়ী-ই বুঝা যায় প্রকৃতপক্ষে সম্বোধনের লক্ষ্য কে। সূরা তওবাতে একটি আয়াত রয়েছে—

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ـ

যদি কোন সফলতা লাভ হয়, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন বলে, বেশ হয়েছে; আমরা আগেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

এখানে সম্বোধনটি একবচনের কিন্তু এর উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলমান। সুতরাং তার উত্তরেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। বলছেন ঃ

لَنْ يُّصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ـ

বলে দাও, আমাদের প্রতি কোন বিপদই আসবে না কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্যে লেখে দিয়েছেন তাই আসবে। তিনি আমাদের মালিক, আর যারা ঈমানদার আল্লাহ্র ওপর ভরসা করাই তাদের কর্তব্য।

তেমনিভাবে সূরা বনী ইসরাইলে দৃশ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী করীম (সঃ)-কে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্বোধনের লক্ষ্য গোটা উম্মত। বলা হয়েছে ঃ

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ـ

যদি তোমাদের সামনে তাদের মধ্য থেকে (পিতা-মাতার মধ্য থেকে) একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় গিয়ে পৌঁছে, তা হলে তাদেরকে না উহ্ বলবে আর না ধমক দেবে; তাদের সাথে আদরের সহিত কথা বলবে।

www.pathagar.com

এমনি ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে যা প্রকাশ্যে অসাধারণ বা বিশেষ হলেও উদ্দেশ্য তার সাধারণ।

তৃতীয় চূড়ান্ত মূলনীতিটি হচ্ছে কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা কোরআনের দ্বারাই করা। কোরআন মজীদ كتابا متشابها শব্দে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে। যার অর্থ হল, এর এক অংশ অপর অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআন মজীদে একই বিষয় কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে, কোথাও বিস্তারিতভাবে, কোথাও শুধু দাবীর আকারে আসে আবার কোথাও দলিল-প্রমাণসহ। কোথাও কোন বিশেষ বিষয়ের সাথে আবার কোথাও অন্য কিছুর সাথে। একই বিষয়ের এত বৈচিত্র্যের সাথে উপস্থাপিত হওয়ার সবচাইতে বড় ফায়দা এই যে, একটি বিষয় এক জায়গায় বুঝা না গেলে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় জায়গাটিতে বুঝে এসে যায়। এক জায়গায় যদি তার কোন একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট না হয়, তা হলে অন্য জায়গায়, অন্য ধারায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণেই কোরআনের তফসীরের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য উৎস হচ্ছে স্বয়ং কোরআন। কেউ যদি কোরআন জটিলতাসমূহের মীমাংসা স্বয়ং কোরআনেরই মাধ্যমে করতে চেষ্টা করেন, তা হলে কোন একটি জায়গায় যদি কোন বিষয়ের বিন্যাস স্পষ্ট না হয়, তবে অন্যত্র তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এক জায়গায় যদি কোন বিষয়ের দলিল পাওয়া না যায়, তবে অন্যত্র তা পাওয়া যায়। এমনকি অনেক সময় তার বর্ণনাভঙ্গি এবং পরিভাষাগত জটিলতাগুলোও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বারবার সামনে আসার ফলে স্পষ্ট হয়ে যায়। আর যেহেতু কোরআন মজীদের প্রত্যেকটি অংশই সমানভাবে অকাট্য ও চূড়ান্ত, কাজেই এর এক অংশের ব্যাখ্যা অপর অংশের দ্বারা করা হলে তা হয় চূড়ান্তের তফসীর চূড়ান্তের মাধ্যমে। অতএব তখন যে যত বড় বিরোধী বা অস্বীকারকারীই হোক না কেন, কোন রকম কথা বলার অবকাশ কারোই থাকে না।

তফসীরের চতুর্থ অকাট্য ও চূড়ান্ত উৎসটি হচ্ছে প্রসিদ্ধ ও আনুক্রমিক সুন্নাহ। কোরআনের পরিভাষা যেমন, সালাত, যাকাত, ওমরা, হজ্জ, কোরবানী, মসজিদে হারাম, সাফা-মারওয়া, সাঈ, তওয়াফ প্রভৃতির তফসীর আনুক্রমিক সুন্নাহর মাধ্যমেই করা কর্তব্য। কারণ, কোরআন মজীদ এবং শরীয়তের পরিভাষার অর্থ বর্ণনা করার অধিকার হুযূরে আকরাম (সঃ) ব্যতীত অন্য কারো নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একথা চূড়ান্তভাবে জানা থাকতে হবে যে, হুযূরে আকরাম (সঃ) এসব পরিভাষার ব্যাখ্যা কিভাবে করেছেন। বস্তুত এ বিষয়ের জামানত হচ্ছে এ সমুদয়

www.pathagar.com

পরিভাষার প্রকৃত মর্ম সম্পূর্ণ কার্যকররূপে সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ বা আনুক্রমিক হাদীসের মধ্যে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। আর সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ ঠিক সে সমস্ত মাধ্যমগুলোতে প্রমাণিত, যেসব মাধ্যমে স্বয়ং কোরআন মজীদও প্রমাণিত হয়েছে। উম্মতের যে অনুচ্ছেদ বা আনুক্রমিক বর্ণনা ধারা কোরআনকে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে সে বর্ণনাধারাই ধর্মের যাবতীয় পরিভাষার কার্যকর মর্মসমূহকেও আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে। সুতরাং কোরআন মজীদকে স্বীকার করা যদি আমাদের ওপর ওয়াজিব হয়, তা হলে পরিভাষাসমূহের সেই রূপকে স্বীকার করাও ওয়াজিব, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়ে পরবর্তীদের কাছ পর্যন্ত এসেছে। এগুলোর রূপে যদি আংশিক কোন মতবিরোধ থেকেও থাকে, তার কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। পাঁচ ওয়াক্তের নামায সবাই জানেন এবং মানেন। রইল এটুকু যে, 'আমীন' জোরে বলতে হবে কি আস্তে । তাতে মতবিরোধ হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের মতবিরোধের কোন গুরুত্ব আমাদের ধর্মে নেই। অবশ্য যে বিষয়গুলো একক বর্ণনাধারায় বর্ণিত হয়ে এসেছে, সেগুলোতে যার মন যে দিকটি গ্রহণ করে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে, তাই গ্রহণ করে নিতে পারেন। পারস্পরিক বিরোধিতা কিংবা একে অন্যকে খন্ডনের পেছনে পড়তে নেই। কিন্তু যে বিষয়গুলো সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ্র দ্বারা সপ্রমাণিত ও জ্ঞাত, সেগুলোর বিরোধিতা করা স্বয়ং কোরআনেরই বিরোধিতার শামিল। আর কোরআনের বিরোধিতা যারা করবে আমাদের ধর্মে তাদের জন্যে কোন স্থান নেই।

হাদীসের প্রতি যারা আস্থাহীন—রোযা-নামায, হজ্জ-যাকাত এবং ওমরা ও কোরবানীর মর্ম নিজের মনমত তৈরী করে বর্ণনা করেন; আর গোটা উম্মতের ধারাবাহিক বর্ণনা এসব বিষয়ের যে স্বরূপ সংরক্ষিত করেছে তাতে নিজেদের ব্যপক কামনা-বাসনা অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধনে প্রয়াসী হন, তাদের এহেন দুঃসাহস পরিষ্কারভাবে কোরআনকেই অস্বীকার করার নামান্তর। তার কারণ, যে ধারাবাহিকতা বা আনুক্রমিক বর্ণনাধারা কোরআনকে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে, পরিভাষাসমূহের কার্যকর প্রয়োগে বা রূপকেও সে ধারাবাহিকতাই আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়েছে। কাজেই তারা যদি এগুলো স্বীকার না করেন, তা হলে কোরআনকে স্বীকার করার কোন কারণই অবশিষ্ট থাকে না। এ শ্রেণীর মূর্খজনেরা কোরআনী পরিভাষাসমূহের চূড়ান্ত ও অকাট্য

www.pathagar.com

মর্মসমূহকে বদলে দেয়ার যে দুঃসাহস করেছে তার কিছুটা অনুমান সেসব আলোচনার দ্বারা হয়ত হয়ে থাকবে, যা মাঝে-মধ্যেই কোরবানী সম্পর্কে এক শ্রেণীর (জ্ঞানান্ধ) লোকের পক্ষ থেকে পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকে। বস্তুত এখন তো তারা দুনিয়া এবং আখেরাত প্রভৃতির মত সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ বিষয়ের মর্মও নিজেদের উদ্দেশ্য ও বাসনা অনুযায়ী গড়ে নিয়েছেন। তাদের মতে, দুনিয়া অর্থ উপস্থিত বা বর্তমান, আর আখেরাত অর্থ ভবিষ্যত। আর কোরআনে নিজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করার যে নির্দেশ রয়েছে তার অর্থ এই করা হয় যে, সব কিছুই নিজের বর্তমান প্রয়োজনেই ব্যয় করে ফেলো না, বরং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য কিছু ব্যাঙ্কেও জমা করে রাখ।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রঃ) তাঁর তফসীর নিযামুল কোরআনে উল্লেখ করেন ঃ

"এমনিভাবে যাবতীয় শরীয়তী পরিভাষাসমূহ যেমন, নামায, যাকাত, জিহাদ, রোযা, হজ্জ, মসজিদে হারাম, সাফা-মারওয়া এবং হজ্জের মানাসিক প্রভৃতি এবং সেগুলোর সাথে যেসব ক্রিয়াকলাপ সম্পৃক্ত রয়েছে তা সবই ধারাবাহিকতা ও আনুক্রমিকভাবে পূর্ববর্তীদের থেকে পরবর্তীদের পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে। এতে সাধারণ আংশিক যে মতানৈক্য রয়েছে তা লক্ষণীয়ই নয়। বিভিন্ন দেশের বাঘের আকার-অবয়বে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাঘের অর্থ সবাই জানেন। এমনিভাবে যে নামায উদ্দিষ্ট তা সে নামাযই যা মুসলমানরা পড়েন। যতই না কেন তার রূপে কোন কোন আংশিক বিরোধ থাক। যারা এধরনের সাধারণ বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করে, তারা এই দ্বীনে কাইয়্যম বা সুদৃঢ় ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কেই সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ, যার শিক্ষা কোরআন মজীদ দিয়েছে।

সুতরাং যখনই এ ধরনের পারিভাষিক শব্দের বিষয় উপস্থিত হবে, যার পূর্ণ সীমারেখা এবং চিত্ররূপ কোরআন মজীদে বর্ণিত হয়নি, তখন সঠিক পন্থা হবে, তার যতটা অংশের ব্যাপারে সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে ততটাই গ্রহণ করে নিতে হবে। একক বর্ণনার হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে কোন রকম গোঁড়ামি অবলম্বন করা ঠিক নয়। কারণ, তার ফলে নিজেকেও সংশয়ের সম্মুখীন হতে হবে, আর অন্যের কার্যকলাপও ভুল বুঝতে বাধ্য করবে; অথচ এর মীমাংসার জন্যে এমন কোন বিষয় থাকবে না যার মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

তফসীরের অনুমানভিত্তিক উৎস ঃ

এখানে তফসীরের অনুমানভিত্তিক কতিপয় উৎস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। অনুমানভিত্তিক বলতে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেসব উৎস, যার ওপর সর্বাবস্থায় পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না; বরং সেগুলোর ভেতরে যেহেতু অনুমান ও সন্দেহ-সংশয়ের সংস্পর্শ রয়েছে, সেজন্যে কোরআনের তফসীরের বেলায় সেগুলোকে ততটুকুই গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয় যতটুকু কোরআনের সাথে আনুকূল্য বিধান করবে। তার কোন বিষয় যদি কোরআনের বিরুদ্ধে যায়, তা হলে সেক্ষেত্রে সেগুলো বর্জিত হবে এবং কোরআনের কথাই হবে চূড়ান্ত।

১. কোরআন তফসীরের অনুমানভিত্তিক উৎসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ও পবিত্র উৎসটি হল বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীসে রসূল এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী। এগুলোর বিশুদ্ধতা ও যথার্থতার ব্যাপারে যদি পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যেত, তা হলে তফসীরের ক্ষেত্রে এগুলোর মর্যাদাও ঠিক ততটাই হতে পারত যতটা সুন্নতে মুতাওয়াতেরাহ্‌র রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এগুলোর সঠিকতার ব্যাপারে পূর্ণ ভরসা করা যায় না, সেহেতু তফসীর করতে গিয়ে এগুলোর মধ্য থেকে ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে যতটুকু সে সমস্ত চূড়ান্ত ও অকাট্য মূলনীতিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। সাধারণভাবে বর্ণিত হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের 'আসার'কে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যারা কোরআনের ওপরে নিয়ে দাঁড় করায়, তারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অথচ তাতে হাদীসের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে যারা আদপেই হাদীসকে অস্বীকার করে বসেন তারা সে আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়েন, যা কোরআন মজীদের বহু সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশ্লেষণে সর্বাধিক সহায়ক হতে পারত। এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা হচ্ছে, কোরআন মজীদের সংক্ষিপ্ততার বিশ্লেষণে যেসমস্ত বিশুদ্ধ ও যথার্থ হাদীস সহায়ক হতে পারে, সেগুলোর সাহায্য গ্রহণ করা এবং সেগুলোর মোকাবিলায় অন্য কোন বিষয়কে স্থান না দেয়া। আর হাদীস যদি সুস্পষ্টভাবেই কোরআনের শব্দাবলীর এবং তার বিষয়বস্তুর বিন্যাসধারার বিরোধী হয়, তবে সেসব ক্ষেত্রে বিরত থাকতে হবে। সেসব অবস্থাতে হাদীসকে বর্জন করাই কর্তব্য, যাতে দেখা যাবে, কোরআনের শব্দের সাথে কোনক্রমেই তার সমন্বয় হতে পারছে না। অথবা ঐ হাদীসটি মানতে গেলে দ্বীনের এমন কোন মূলনীতির প্রতি আঘাত আসে, যা মান্য করা অপরিহার্য। সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হাদীস

www.pathagar.com

বলতে যা বুঝায় এমন খুব কমই দেখা যায়, কোরআনের সাথে যার সামঞ্জস্য হতে পারে না। যাই হোক, এমন সব ক্ষেত্রে কোরআনকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই তার এ অগ্রাধিকারকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এমন ক্ষেত্র খুব বেশী নেই।

শানে নুযূল সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে, সেগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ব্যাপারে এই মূলনীতিগত বাস্তবতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, আমাদের প্রাচীন ওলামা-মনীষীবৃন্দ কোন আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে যে নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করেন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য এমন থাকে না যে, হুবহু এ ঘটনাটিই এ আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। বরং তাতে সাধারণত তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে যে, এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে যে কি নির্দেশ তা এ আয়াতে রয়েছে। এই বিষয়টির বিশ্লেষণ আমাদের তফসীরের বিশিষ্ট আলেমগণ করেছেন। তাতে শানে নুযূল সম্পর্কিত বেশীর ভাগ জটিলতারই সমাধান হয়ে যায়। শানে নুযূলের প্রতি শুধু সে সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দেয়া উচিত যেখানে কোরআন কোন নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকবে। যেমন সূরা তাহ্রীম কিংবা আহযাবে কোরআন কোন কোন ঘটনার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছে। এ ধরনের ঘটনার সবিস্তার বিবরণ হাদীস থেকে জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা কোরআনের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সে বিষয়গুলো উপেক্ষা করা উচিত, যা স্বীকার করতে কোরআন বাধা দেয় অথবা তা মেনে নিলে এমন সব ব্যক্তির জীবনে কোন কথা আসে যাদের জীবনের সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে।

২. এমনিভাবে বিভিন্ন জাতির প্রমাণিত ইতিহাস দ্বারাও কোরআনের তফসীরে সাহায্য নেয়া বাঞ্ছনীয়। কোরআন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। কোথাও আরবের প্রাচীন জাতি আদ, সামুদ, মাদইয়ান ও কওমে লূত প্রভৃতির ধ্বংসের আলোচনা করেছে, কোথাও হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মক্কায় আগমন, সেখানে বসতি স্থাপন ও খানায়ে কাবার নির্মাণের ঘটনাবলীর প্রতি আরববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আবার কোথাও ইহুদী-নাসারাদের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর প্রতি ইশারা করেছে। কোথাও কোথাও কোরআনের অবতরণকালীন কোন কোন জাতি এবং তাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এমনিভাবে অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা বা বিষয় রয়েছে, যা কোন না কোনভাবে কোরআনে আলোচিত হয়েছে। এই সমুদয় ইঙ্গিত-ইশারা স্পষ্ট করে বুঝতে হলে সেসব জাতির ইতিহাস এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া আবশ্যক। তা না হলে সেসব উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না, যে জন্যে কোরআন মজীদ এসব ঘটনা বর্ণনা করেছে।

কোরআন মজীদের কোন কোন বিষয়ের বিশ্লেষণকল্পে আমাদের সেসব ঐতিহাসিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তার প্রমাণিত অংশ খুবই অল্প। কাজেই সেগুলোর যাচাইয়ের জন্যও আমরা কোরআনকেই কষ্টি পাথর হিসাবে নির্দিষ্ট করতে পারি। অর্থাৎ তার যেসব কথা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হবে সেগুলোকেই আমরা গ্রহণ করব আর যা কোরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেগুলো বর্জন করব।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে আমরা অনুমান করতে পারব যে, কোরআন মানবতা ও গোটা মানব জাতির প্রতি যে মহান করুণা করেছে, তা ছাড়াও সে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের প্রতি যে অবদান রেখেছে, সারা বিশ্ব মিলে যদি সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে চায় তবুও তার যথার্থ প্রাপ্য শোধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের ইতিহাসশাস্ত্র ছিল সম্পূর্ণভাবে একটা নিষ্প্রাণ বিষয়। তা থেকে মানুষ যদিও কিছু পেত তবে তা ছিল শুধুমাত্র ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার রূপকথার আকারে পুনরাবৃত্তি এবং তা থেকে সাময়িকভাবে বাপ-দাদাদের গৌরবের অনুভূতি কে একটা সান্ত্বনা দেয়া। কোরআন ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে। সে তাকে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের এক শিক্ষামূলক উপাখ্যান হিসেবে পেশ করেছে এবং খন্ডনের অযোগ্য যুক্তি-দলিল দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জাতির উত্থান-ওপতনের প্রকৃত কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্র। ইতিহাসকে নতুন এই আঙ্গিক দান করে কোরআন সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসকে ইতিপূর্বে প্রচলিত সাধারণ গল্প-কাহিনীর ন্যায় গুরুত্বহীন পর্যায় থেকে উত্তরিত করে গোটা দুনিয়ার পথ প্রদর্শন ও হেদায়াতের জন্যে সর্বাধিক মূল্যবান উপকরণে পরিণত করে দিয়েছে। বিশেষভাবে বনী ইসরাঈল এবং বনী ইসমাঈলদের ইতিহাসের প্রতি কোরআন যে অনুগ্রহ করেছে তার জন্যে গোটা দুনিয়াকেই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, এই জাতিদ্বয়ের ইতিহাস শুধু জাতির ইতিহাসই ছিল না, বরং প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

তা ছিল বিশ্বের কল্যাণকল্পে আবির্ভূত সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী-রসূলগণের অবদানের ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের বিকৃতি (যেমনটি হয়েছিল আরব ও ইহুদীদের হাতে) পৃথিবীর জন্যে ছিল একটা বিরাট দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এতে হেদায়াত ও পথপ্রাপ্তির সেসমস্ত মাইলফলক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল যা আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দারা মানবতাকে পথের দিশা দেয়ার জন্য স্থাপন করেছিলেন। এটা কোরআন মজীদেরই একক অবদান যে, সে ইতিহাসের মুছে যাওয়া সেসব চিহ্নগুলো উদ্ধার করে এমনভাবে পুনঃস্থাপন করেছে যে, কেয়ামত পর্যন্তের জন্য প্রতিটি ফলক চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তফসীরের অনুমানভিত্তিক উৎসগুলোর মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে প্রাচীন আসমানী গ্রন্থরাজি। এ সত্য কেউই অস্বীকার করতে পারেন না যে, আমাদের নবী করীম (সঃ) নবী-রসূলগণেরই একজন এবং এই কোরআন মজীদ আসমানী গ্রন্থরাজিরই একটি গ্রন্থ। সুতরাং কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। হেদায়াতপ্রাপ্তির ব্যাপারে এখন আর আমরা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মুখাপেক্ষী রইনি। হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত আল্লাহ্‌র সর্বশেষ গ্রন্থটিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। সূর্যোদয়ের পরে যেমন নক্ষত্ররাজি থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না– তেমনিভাবে কোরআন অবতীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর হেদায়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপর কোন গ্রন্থেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কিন্তু এমন কিছু দিক রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে প্রাচীন আসমানী গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য।

প্রথমত কোরআন মজীদের বহু বাণীর বিশ্লেষণকল্পে আমাদের ওলামা সম্প্রদায়কে আহলে কিতাবদের রেওয়ায়েত নিতে হয়েছে। আর সেই রেওয়ায়েতগুলো যেহেতু সম্পূর্ণতই শোনা কথার ওপর নির্ভরশীল, সেজন্যে সেগুলোর তেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য-মর্যাদা নেই। সেগুলো না আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে কোন দলিল হতে পারে, আর নাই বা আমরা নিজেদের কোন দাবী কিংবা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি সেগুলোর ওপর স্থাপন করতে পারি। কাজেই সরাসরি সেসব আসমানী গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকার জ্ঞান লাভ করা আমাদের জন্যে প্রয়োজন-যাতে সেসব বিষয়ে কোন কিছু বলতে গেলে তা জেনে শুনে বলতে পারি।

দ্বিতীয়ত কোরআন মজীদ অতীত গ্রন্থসমূহের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করে তোলে এবং সেগুলোতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে তার সংশোধন দান

www.pathagar.com

করে। কাজেই কেউ যখন কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থগুলোও অধ্যয়ন করে, তখন কোরআনের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব অনেক বেশী পরিমাণে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কোরআনের মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ যে কত-বড় অনুগ্রহ করেছেন, তা এক বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়ায় উদ্ভাসিত হয়।

তৃতীয়ত কোরআনে হাকীম বিধি-বিধানের বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোচনাক্রমেও বিভিন্ন স্থানে এমন সব ইশারা-ইঙ্গিত করেছে, যেগুলো প্রাচীন আসমানী কিতাবাদির অভিজ্ঞতা ছাড়া পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হতে পারে না। আমাদের মহামান্য মুফাস্সেরীনের অধিকাংশই যেহেতু তওরাত ও ইঞ্জীল-এর সাথে সরাসরিভাবে পরিচিত ছিলেন না, সেহেতু তাঁরা ঐ ধরনের ইঙ্গিত-ইশারার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ দিতে পারেননি।

চতুর্থত কোরআন মজীদও নাসারাদেরকে এ বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে যে, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থের বিকৃতি সাধন করেছে। সেগুলোর ভেতরে এমন বহু বিষয় সংযুক্ত করে দিয়েছে যা ইতিপূর্বে তাতে ছিল না। আর কিছু বিষয় সেগুলোর ভেতর থেকে বের করে দিয়েছে যা ইতিপূর্বে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে তাতে বর্ণিত ছিল। এমনকি অসংখ্য ব্যাপার রয়েছে যাতে তারা নিজেদের আচার-আচরণকে আল্লাহ্ ও তাঁর নবী-রসূলগণের নির্ধারিত রীতি-নীতির প্রকাশ্য বিরোধী বানিয়ে নিয়েছে। অনেক নিষিদ্ধকে সিদ্ধ করে নিয়েছে আবার বহু সিদ্ধকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়কে প্রামাণ্য করে তোলার জন্য সরাসরি তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতিও নজর থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় আহ্লে কিতাবদের ওপর যথাযথভাবে যুক্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

পঞ্চমত এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আল্লাহ্ ও আম্বিয়ায়ে কেরামের বাণী সম্বলিত একটা অংশ রয়েছে যা কোরআন মজীদের সাথে পরিচিত ব্যক্তিরা চিনে নিতে পারেন। আল্লাহ্ ও তাঁর আম্বিয়া (আঃ)-এর বাণী সম্বলিত সে অংশটি প্রকৃতপক্ষে মুমিনদেরই একটা হৃত ভান্ডার। আর মুমিনদেরই সে অধিকার যে, যেখানেই তারা সেই ভান্ডারের সন্ধান পাবে, সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

---

www.pathagar.com

রশীদ বুক হাউজ

www.pathagar.com